বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা হালখাতা

বাংলাদেশে ভূমিকম্প সংখ্যা

২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮

প্রকাশকাল
১৫ ডিসেম্বর ২০০৮

সম্পাদক
শওকত হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
শরমিন নিশাত

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ পথশিল্প সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র
বাড়ি ৩/সি, রাস্তা ১৩/২, জিগাতলা,
পশ্চিম ধানমণ্ডি, ৩য় তলা, ঢাকা ১২০৯
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৫৫৯১১৩৯৬১
ই-মেইল: halkhata1971@gmail.com

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম

পত্রিকার নামলিপি
রবিন আহসান

প্রচ্ছদ
Drm http: //flickr.com/photos/87511641@NOO/514793384
[সংগ্রহ জাইদ-বিন-কালাম]

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
১৫০.০০ টাকা
১৫০.০০ রুপি
৬ ৮ ডলার

স ম্পা দ কী য় : এ ক

কোনো কোনো প্রাকৃতিক মহাবিপর্যয়ের কাছে মানুষের সৃষ্ট সভ্যতা এমনই জিম্মি হয়ে থাকে যে, এই সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যেতে সময় লাগে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। এমনই এক মহাধ্বংসের তিলক কপালে পড়ে আছে বাংলাদেশ, যার নাম 'টেকটনিক ভূমিকম্প'।

পুরো পৃথিবী ৭টি প্রধান গতিশীল প্লেটসহ অসংখ্য ছোট ছোট প্লেট বা পাটাতনে বিভক্ত, এই প্লেটগুলোকে বলা হয় 'টেকটনিক প্লেট'। নিচে লাভা থাকার কারণে প্লেটগুলো সর্বদাই গতিশীল অবস্থায় থাকে। 'প্লেটগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে কিংবা একটি অন্যটিকে ধাক্কা দেয়ার কারণে অথবা একটি অপরটির সীমান্ত বরাবর পরস্পরের অবস্থান সাপেক্ষে পাশাপাশি হড়কে যাওয়ার কারণে ভূমিকম্প হয়।' আর প্লেটের কারণে সংঘটিত এরূপ ভূমিকম্পকে বলে 'টেকটনিক ভূমিকম্প'। একরম প্লেট বা পাটাতনেরই একটি অংশ, 'বাংলাদেশের উত্তর দিকের জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ এবং সুনামগঞ্জের ওপর দিয়ে গেছে যা দেশের পূর্ব পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সমান্তরাল এলাকা।' প্লেটের এই সমান্তরাল এলাকাতেই ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। এছাড়া ভৌগলিক অবস্থানের কারণে ইন্ডিয়ান ও ইউরেশিয়ান প্লেটের সীমারেখার অত্যন্ত সন্নিকটে বাংলাদেশের অবস্থান। এছাড়া শিলং ফল্ট নামে আরেকটি ফাটল আছে, যার কারণেও বাংলাদেশ ভূমিকম্পের প্রচণ্ড ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানে প্রথম যে পারমাণবিক বোমাটি নিক্ষেপ করা হয়েছিল তার মধ্যে যে শক্তি ছিল তার চেয়েও প্রায় দশ হাজার গুণ বেশি শক্তি থাকে একটি মাঝারি ধরনের ভূমিকম্পের মধ্যে। ফলে এই ধরনের একটি ভূমিকম্পের শক্তি একটি দেশ বা সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে অনায়াসে।

বাংলাদেশে সর্বশেষ বড় ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল ১৮৯৭ সালের ১২ জুন। এই ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র (ইপি সেন্টার) ছিল গ্রেট ইন্ডিয়া। যার তরঙ্গ বা ওয়েভ এসে আঘাত হানে বাংলাদেশে। তখন বাংলাদেশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি ঘটেছিল। যাকে সাধারণ মানুষ কেয়ামত মনে করে আতঙ্কিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভূমিকম্প বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি একত্রিত করে বাংলায় তেমন কোনো প্রকাশনা বা পুস্তক করা হয়নি বললেই চলে; সেদিক থেকে আমাদের জানা মতে বাংলায় উল্লেখযোগ্য প্রকাশনার মধ্যে এটিই প্রথম প্রয়াস। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং এনজিও-তে নিয়োজিত গবেষক, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী যারাই এ বিষয়ে গবেষণা করেন, সভা-সেমিনার করেন বা পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করেন তাদের বেশির ভাগ লেখাই ইংরেজি ভাষায় লেখা হয়। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, তাদের এই লেখাগুলো সাধারণ জনগণের জন্য সহজলভ্য নয় এমনকি এক্ষেত্রে যাঁরা গবেষক আছেন, তাঁদের সম্পর্কেও সাধারণ মানুষ জ্ঞাত নন।

দেশের সর্বস্তরের মানুষ যাতে এই অবশ্যম্ভাবী মহাবিপর্যয় বা রাহুর গ্রাস সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন এবং এই সচেতনতার মধ্য দিয়ে সব শ্রেণীর মানুষের

আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি কিছুটা হলেও কমিয়ে আনা যায় সেই লক্ষ্যে হালখাতা'র 'বাংলাদেশে ভূমিকম্প' সংখ্যাটি প্রকাশ করা হলো।

সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই কৃতজ্ঞতা।

নির্বাহী সম্পাদক
১৫.১২.২০০৮

সম্পাদকীয় : দুই

পৃথিবী আর মানুষের মধ্যে তুলনা করলে কেমন হয়; পৃথিবীর মতো কম্পন তো মানুষের ভেতরেও হয়! মানুষের শরীর অতিশয় ক্ষুদ্র যা গোটা পৃথিবীর আকারের তুলনায় হাস্যকর রকমের তুচ্ছ। কিন্তু মানুষের মন? মন তার শরীরের তুলনায় এতই ব্যাপক ও বিস্তৃত যা কয়েকটা কেন, অসংখ্য পৃথিবীকেও ধারণ করতে পারে। মানুষের মনের মধ্যে যে কত-শত-কোটি রকম খেলা চলে সেটা বাইরে থেকে সাধারণভাবে বোঝা যায় না। এই দিক থেকে পৃথিবী ও মানুষের মধ্যে বেশ মিল রয়েছে।

পৃথিবীর অভ্যন্তরেও ঘটে হাজার রকম ঘটনা; এতে করে সেখানে মাঝে-মধ্যে যে কম্পনের সৃষ্টি হয় সেটাই পৃথিবীর উপরিভাগে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে। যা পৃথিবী-পৃষ্ঠের রূপকেও কখনও বদলে দিতে পারে। ভূমিকম্প যে সবসময় ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়ে থাকে তা নয় বরং ভূমিকম্পে সৃষ্টি হয়েছে বহু নদ-নদী, খনির রসদ-স্তর আরও কত-কী; যা মানুষ আশীর্বাদ হিসেবেও পেয়েছে। একইভাবে মানুষের মনের মধ্যেও ঘটে-যাওয়া নানা ঘটনা তার বাইরের অবয়বকে যে কাঁপিয়ে তোলে, সেটা অনেক সময় তাকে চরম ধ্বংসের মুখে ফেলে দেয়। কোনো কোনো কম্পন আবার মানুষকে তার সাফল্যের শিখরেও পৌঁছে দেয়।

দুই

পৃথিবী আর ভূমিকম্প এরা প্রায় সমান বয়সী, সে কারণে এদের মধ্যকার সম্পর্ক যত পুরনো, এ দু'য়ের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অত পুরনো নয়। এই ভূমিকম্পে মানুষের সৃষ্ট বহু সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে; কিন্তু মানুষ তখন বুঝতো না যে এটা ভূমিকম্পের ফলে হচ্ছে। মানুষের রেকর্ডে আছে এমন ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার কথা জেনে স্তম্ভিত হতে হয়; ২০০৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রার কাছাকাছি রিখটার স্কেলে প্রায় ৯ মাত্রার ভূমিকম্পে সৃষ্ট সুনামিতে মানুষের জান-মালের বর্ণনার অযোগ্য বিভৎস রকমের ক্ষতি সাধিত হয়। সেদিন বাংলাদেশের উপকূলে মরাকটালের কারণে সর্বনিম্নস্তরে পানির অবস্থান ছিল, কিন্তু সেদিন এখানে ভরাকটাল থাকলে বাংলাদেশের ওপর দিয়েও দশ-বার ফুট উঁচু হয়ে সেই সুনামি নিশ্চিতভাবে আঘাত হানত।

ভূ-গর্ভে কম্পন হয় অনেক ক্ষেত্রে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে; কিন্তু আমাদের কাছাকাছি আগ্নেয়গিরি নেই। বাংলাদেশে এই কম্পন সৃষ্টি হয় টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষের ফলে। সে জন্য আমাদের জানা দরকার এই টেকটোনিক প্লেট

বিষয়টি আসলে কী। ড. আইনুন নিশাতের মতে, 'মানুষের মাথার খুলি যেমন অনেকগুলো হাড় দিয়ে গঠিত পৃথিবী আসলে সেরকম অনেকগুলো পাথরের সমষ্টি। পৃথিবী এরকম প্রধান সাতটি পাথর বা প্লেট ও অসংখ্য ছোট ছোট প্লেটের সমন্বয়ে তৈরি। এই প্লেটগুলো মুভ করে লাভা মুভ করে বলে। মাথার খুলির মতো এই প্লেটগুলোর একটার সাথে আরেকটার সংযোগস্থলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।'

বিগত দেড়শ বছরে সাতটি বড় মাপের ভূমিকম্প বাংলাদেশে আঘাত হেনেছে। এগুলোর মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে প্রায় ৭। এর মধ্যে দুটির ইপিসেন্টার বা উপকেন্দ্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরে।

উল্লেখ্য, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনকার ফজলুল হক হলের পেছনে একসময় একটা বিশাল চিমনি ছিল, সেই চিমনিটা ভূমিকম্পে ভেঙে যায়, আহসান মঞ্জিল ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ হয়– এরকম আরও অনেক স্থাপনা আমাদের এই ঢাকা শহরেই ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির প্রমাণ হিসেবে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। আর একশ বছরের যে রেঞ্জের কথা বলা হয়ে থাকে, সেই সম্ভাব্য একশ বছর কিন্তু পার হয়ে গিয়েছে। ফলে বাংলাদেশে বড় ধরনের ভূমিকম্পের সম্ভাবনা বিশেষজ্ঞদের মতে একশ ভাগেরও বেশি। অর্থাৎ আগামী পাঁচ-দশ বা এর কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই সে ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে।

তিন

ভূমিকম্প প্রতিহত করবার উপায় এখনও জানা সম্ভব হয়নি; এক্ষেত্রে মানুষ খুব অসহায়। ডাইনোসরের চেয়েও ভয়ঙ্কর 'ভূমিকম্প' নামক এই দানবের সামনে দাঁড়িয়ে এখন মানুষকে সান্ত্বনা দেবে কে? কিন্তু মানুষ তো সান্ত্বনা চায়; বরাবরের মতোই সে বাঁচতে চায়।

আগুনের পাশে সমান দূরত্বে লোহা, কাঠ, কাপড় ও প্লাস্টিক-শিট রাখা হলে, সবার আগে দুমড়ে-মুচড়ে কুঁচকে যায় প্লাস্টিক-শিট; কারণ হল লোহা, কাঠ, কাপড়ের তুলনায় প্লাস্টিক-শিটের পক্ষে আগুনের বিরুদ্ধে টিকে থাকার ক্ষমতা কম। একইভাবে পৃথিবীর কোনো কোনো মানুষও নিজের জন্মভার সহ্য করতে অপারগ; কেউ কেউ হয়তো জীবনের সেই দায় সইতে না-পেরে নিতান্ত অস্তিত্ব পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে না। হয়ত সেই একই ঘটনার সম্মুখীন হয়ে অনেকেই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। একইভাবে যে সকল স্থাপনা তুলনামূলক অধিক শক্ত, ভূমিকম্পের ঝাঁকুনির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকতে সমর্থ, বড় ভূমিকম্পেও সেগুলোর বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়তো হয় না। সুতরাং বলা যায় ভূমিকম্প নয় বরং অসমর্থ ও দুর্বল স্থাপনাই ক্ষয়ক্ষতির প্রধান কারণ।

চার

ভূমিকম্পকে প্রতিহত করবার উপায় না থাকলেও, এর আঘাতে যে ক্ষতি হয় সেটা কমিয়ে আনা সম্ভব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নব্বইয়ে যে বিল্ডিংকোড করা হয়েছিল, সেটাও গৃহীত হল দুই হাজার তিন-এ এসে। কিন্তু সেই বিল্ডিংকোড অনুসারে আদৌ বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে কি-না, তার খোঁজ কে নেবেন? আরও উল্লেখ্য যে, ভূমিকম্প নিয়ে যারা গবেষণা করেন, তাদের ভাষা প্রধানত ইংরেজি; অধ্যাপক আবুল বারকাতের মতে, এই ভাষা তো 'তাদের ব্যক্তিগত উন্নয়নের,' জনগণের কল্যাণের জন্য নয়। এখান থেকেই-বা বের হয়ে আসার উপায় কী? আমরা মনে করি, এজন্য দরকার যে সংস্কৃতি সেটা প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যদিয়ে অর্জন করা মোটেও সম্ভব নয়। কারণ আমাদের দুর্বল স্থাপনা মূলত দুর্বল রাজনীতিরই ফল। এই অব্যবস্থাপনার পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োজন রাজনীতির আমূল পরিবর্তন। সেই লক্ষ্যকেই সামনে রেখে হালখাতা'র অন্য সংখ্যার মত বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশ করা হল।

প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই ভালোবাসা ও ধন্যবাদ।

সম্পাদক

১৫.১২.২০০৮

সূচি

শিল্পের দর্শন সংখ্যার প্রতিক্রিয়া

শিল্পদর্শন সংখ্যা: অপূর্ণাঙ্গ প্রয়াস
হাসান অরিন্দম ০৯

স্বল্প সময়ে মনোযোগ কেড়েছে হালখাতা
হারুন অর রশিদ ১২

প্রবন্ধ

বাংলাদেশে ভূমিকম্প ও সুনামির ঝুঁকি এবং হ্রাসের পদক্ষেপ
মূল জামিলুর রেজা চৌধুরী /
অনুবাদ সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দার ১৫

সাক্ষাৎকার

ভূমিকম্পের আগাম বার্তা পাওয়া সম্ভব
আইনুন নিশাত ২৭

প্রবন্ধ

ভূমিকম্প ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
মো. আবু সাদেক ৪১

বাংলাদেশে ভূমিকম্প: গুরুত্বপূর্ণ তিন প্রসঙ্গ
মো. আলী আকবর মল্লিক ৪৮

সম্ভাব্য ভূমিকম্প: নিশ্চিত ক্ষতি থেকে সাধ্যমতো রক্ষা
মো. জাহাঙ্গীর আলম ৫৪

ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে বাংলাদেশ
রেশাদ মহম্মদ ইকরাম আলী ৬৩

গল্প

এই দেশে প্রতিদিনই ভূমিকম্প ঘটে
তুহিন সমদ্দার ৬৮

প্রবন্ধ
ভূমিকম্প ও সুনামি ঝুঁকিতে বাংলাদেশ
মূল আফতাব আলম খান / অনুবাদ ফরীদুল আলম ৭৩
বাংলাদেশে ভূমিকম্প ও সুনামি
মূল সৈয়দ হুমায়ুন আখতার / অনুবাদ অপর্ণা হাওলাদার ৭৮
বাংলাদেশে ভূমিকম্প-ঝুঁকি: বাস্তবতার মুখোমুখি
**মূল তাহমীদ এম. আল-হুসাইনী /
অনুবাদ সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দার ৮৪**
প্রধান প্রধান শহরের ভূমিকম্পের ঝুঁকি
মূল মেহেদী আহমেদ আনসারি / অনুবাদ শওকত হোসেন ৯৩

সাক্ষাৎকার
ভূমিকম্প গবেষকদের ভাষা তাদের ব্যক্তিগত উন্নয়নের
আবুল বারকাত ১০০

প্রবন্ধ
প্রসঙ্গ ভূমিকম্প: ভবনের উচ্চতা ও সঠিক প্রযুক্তি
মো. আব্দুল আউয়াল ১১১
ভূমিকম্প ও ভবন নির্মাণ: যা হবার কথা নয়
শিকান্দার হায়াত সিদ্দিকী ১১৭
ভূমিকম্পের আশু বিপদ ও পরিবেশসম্মত বসবাস
মুশফিকুর রহমান ১২১
মহাবিপর্যয়ের মুখোমুখি বাংলাদেশ
আসিফ ১২৫
ভূমিকম্প পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয়
ধরিত্রী সরকার সবুজ ১৩১

সাক্ষাৎকার
ভূমিকম্প: কোনোভাবেই আমরা ঝুঁকিমুক্ত হতে পারছি না
তানভিরুল হক প্রবাল ১৩৯

প্রবন্ধ
বাংলা ভাষায় ভূমিকম্পবিষয়ক দুটি বই
সুব্রত বড়ুয়া ১৪৯
ভূমিকম্প নিয়ে কিছু কথা
রবিউল হুসাইন ১৫৬
বাংলাদেশে ভূমিকম্প: আশংকা ও প্রস্তুতি
জয়নাল আবেদীন ১৫৯
ভূমিকম্প এবং আমরা
ফেরদৌসী সুলতানা ১৬৪
ভূমিকম্প : ধ্বংসে ও বিনির্মানে
রুশো তাহের ১৬৭
ভূমিকম্প: ঝুঁকি ও মাটির বাড়ি
মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম ১৭০

মানচিত্র
ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা ১৭৪

শিল্পদর্শন সংখ্যা: অপূর্ণাঙ্গ প্রয়াস

হাসান অরিন্দম

হালখাতা'র শিল্পের দর্শন সংখ্যার প্রচ্ছদে শিল্পী শাহাবুদ্দিনের 'পেগাসাস' প্রকাশ করছে ধাবমানতা আর গতিকে। হালখাতাও বোধ করি প্রাথমিক সংশয় অতিক্রম করে অস্তিত্ব আর গতির দুর্বার ঘোষণা দিয়ে চলেছে। লেখক-সূচিতে এবারও আছে প্রণম্য একাধিক নাম। প্রথমেই বলি যতীন সরকারের প্রবন্ধের কথা। এ লেখক বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত চর্চিত ও স্বীকৃত ইতিহাসের পৃষ্ঠদেশে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন। তিনি মনে করেন ইউরোপ-মনস্ক পাশ্চাত্য ইতিহাসকারেরা বাঙালি সংস্কৃতি ও সাহিত্যের যে ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করেন তা বহুলাংশে ইউরোপীয় আদলে নির্মিত। ফলে এতে সত্য সামগ্রিক চেহারায় নয়, খণ্ডিতরূপে এসেছে। লেখক দেখিয়েছেন যাদের লোককবির বিবর্ণ বসন পড়িয়ে বাংলা সাহিত্যের মূলধারায় অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখা হয়েছে; নির্মোহ ও যৌক্তিক বিচারে তারা আধুনিক ও মূলধারার ধ্বজাবাহী। এ-জাতীয় বোধ ও যুক্তি দ্বারা সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা যদি খানিকটা প্রণোদিত হন তবে সে ইতিহাস হয়তো আরও গ্রহণযোগ্যরূপেই বিবেচিত হবে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সাক্ষাৎকার এ সংখ্যার শ্রীবৃদ্ধিতে আছে এক মুখ্য ভূমিকায়। এ আলোচনায় তিনি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকেই প্রকারান্তরে প্রগতিশীলতা বলে গ্রহণ করেন। একজন শিল্পীর পক্ষে বিমূর্ততাকে অবলম্বনের যে কারণ তিনি উল্লেখ করেন তা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তিনি মনে করেন বিমূর্ততা হল সুবিধাবাদীদের প্রকৃত চেহারা আড়াল করার পর্দা বা ছদ্মবেশ। নারীকে বিশেষরূপে শিল্পসাহিত্যে উপস্থাপনের যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন তা-ও তর্কাতীত নয়। একে সর্বাংশে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফল বলা যায় না। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ভিন্ন মানসগঠনের বিষয়টিও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। জনাব চৌধুরী অবশ্য বলেছেন নারীকে পুরুষ প্রধানত ভোগবাদী চিন্তা থেকে দেখে। তাত্ত্বিক যুক্তিতে না গিয়ে এটুকু বলি যে, পুরুষকে হটিয়ে নারী যদি কখনও নিয়ন্ত্রক, কর্তা বা শাসকের জায়গায় আসে তবুও সে পুরুষকে অশ্লীল উপায়ে পণ্য করবে না, বানাবে না ভোগের উপকরণ। আর এই যুক্তিটি যদি গ্রহণ করি তাহলে বোঝা যায় পুরুষের এই ভোগবাদী মানসিকতার মূল পুঁজিবাদ কিংবা কর্তৃত্বপরায়ণতার মধ্যে নিহিত নয়। এর মূল রয়েছে তার মন-মগজ-

চেতনায়, যা সৃষ্টির মতোই প্রাচীন। তবে স্বীকার করতে বাধা নেই পুরুষের সেই অসংস্কৃত চেতনাধারাকে উস্‌কে দেয় তার পক্ষের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিবেশ।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মনে করেন শিল্পকে মহৎ হতে হলে তার মধ্যে শ্রেণীচেতনার উদ্ভাসন আবশ্যক, অন্যথায় মানুষের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এখানে আমার প্রশ্ন এই 'মানুষ' কোন মানুষ– যেখানে অন্তত বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে শিল্প ব্যাপারটিই অধিকাংশ মানুষের নিকট প্রাসঙ্গিক নয়, অথচ শ্রেণীচেতনা কিন্তু তাদের কথাই বলে। আমার সঙ্গে অনেকেই নিঃসন্দেহে একমত যে শ্রেণীসচেতনতা, সমাজপরিবর্তন ইত্যাদি শ্লোগানের বাইরে শিল্পকে দুদণ্ড নিরপেক্ষ বাতাসে নিশ্বাস নিতে না দিলে সে বেচারার স্বাভাবিক গৌরব ও চরিত্রই ক্ষুণ্ন হয়, এর দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

আবুল কাসেম ফজলুল হকের লেখা প্রবন্ধটি নির্মোহ চিন্তাজাত এবং অবশ্যই সুলিখিত। শিল্পীরা কিভাবে দর্শনগত দিক থেকে বহুধাবিভক্ত এবং প্রায়ই যথার্থ সুদূরপ্রসারী মাঙ্গলিক চেতনাকে ধারণ করতে ব্যর্থ হন তার উল্লেখযোগ্য কিছু দিক এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে। আধুনিকতাবাদ, উত্তর আধুনিকতাবাদ এবং রেনেসাঁস ধারণাগুলোকে তিনি স্পষ্ট করেন এই আলোচনায়। ধর্ম, নারী, রাজনীতি বিষয়ে উস্কানিমূলক লেখার অন্তরালে যে কলকাঠির কথা তিনি উল্লেখ করেন তার ফলে বেশকিছু বিষয় পাঠকের চেতনায় নতুন করে পুনর্বিন্যস্ত হওয়ার সুযোগ পায়।

সলিমুল্লাহ খানের প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র হলেও তা পূর্ণাঙ্গ ও প্রাঞ্জল। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের প্রেক্ষাপটে শিল্প এবং শিল্পীর যে যথার্থ মুক্তি ঘটে না তা এখানে স্পষ্ট করা হয়েছে। 'মানুষের জীবনে যদি শুধু পরিশ্রম থাকে অথচ আনন্দ না থাকে তখন শিল্পও বিদায় নেয়'। এই কারণেই দেশের পনের আনা মানুষের জীবনেই শিল্প ব্যাপারটি প্রায় অপ্রাসঙ্গিক শব্দ। খালিকুজ্জামান ইলিয়াসের 'শিল্পের প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' শীর্ষক রচনায় মৌলিক কোনো দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্লেষণ খুঁজে পাওয়া যায় নি। ফরীদুল আলমের প্রবন্ধে গ্রিক অনুকৃতিবাদ থেকে শুরু করে শিল্পদর্শনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করা হয়েছে। শিল্পে আনন্দ, ভাব ও রূপের সম্পর্ক, শিল্প ও নীতি প্রভৃতি এ আলোচনার উপজীব্য। ভিন্ন ভিন্ন তাগিদ থেকে হলেও মহৎ শিল্পীর হাতে শিল্পসৃষ্টির যে দৃষ্টান্ত তিনি দেন তা বিশেষ যুক্তিগ্রাহ্য। শিল্প সম্পর্কে উপসংহারে যে বিশ্বজনীনতার কথা বলেন তাতেও প্রাবন্ধিকের শৃঙ্খলমুক্ত ভাবনার পরিচয় ফুটে ওঠে।

শাহ্ আলম সারওয়ার লিখেছেন 'প্রসঙ্গ শিল্পদর্শন'। তিনি দেখিয়েছেন শিল্পের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে দর্শনকে স্থান দিলে তাতে শিল্পের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যঞ্জনা ব্যাহত হয়। এ কারণেই পরিকল্পিত মতাদর্শতাড়িত সফল শিল্প খুব বেশি নেই। শিল্পের বিমূর্ততা সম্পর্কে তার বক্তব্যটিও বিশেষ বাস্তবসম্মত ও যুক্তিগ্রাহ্য। তিনি মনে করেন বিমূর্ততা কোনো সত্যকে আড়াল করবার জন্য নয়, শিল্পের তাগিদেই তা আসে।

সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দার লিখেছেন 'শিল্পের লক্ষ্য একটি দার্শনিক বিতর্ক'। উল্লেখযোগ্য কয়েকজন তাত্ত্বিক ও শিল্পীর বক্তব্যের আলোকে বিষয়টি তিনি বিশ্লেষণ করেন। এ কারণেই শেষ কথায় শিল্প সম্পর্কে যথার্থ মন্তব্যটি বেরিয়ে এসেছে– শিল্প

নিছক আনন্দবর্ধক নয়, শিল্প পণ্যও নয়, শিল্প নীতির প্রতিচ্ছবি নয় বলেই খেয়ালি কল্পনা থেকেও উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। আমিনুল ইসলাম রচিত 'ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির দর্শন' প্রবন্ধটি নিরপেক্ষ, সুদৃঢ় যুক্তিতে অগ্রসর হয়েছে সেকথা বলা যাবে না। এ আলোচনা যতখানি-না একজন দার্শনিকের তার চেয়ে অধিক একজন বিশ্বাসপ্রবণ চিন্তাবিদের। এখানে 'ধর্ম' বলতে প্রসঙ্গক্রমে ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের বিষয়গুলোও আলোচনায় আসতে পারত। ইসরাইল খানের প্রবন্ধের মাত্র বড়জোর এক-তৃতীয়াংশে আছে ডা. লুৎফর রহমান প্রসঙ্গ। এর শিরোনাম তাই অন্যকিছু হলেই মানানসই হত।

কবির মানবীয় সীমাবদ্ধতা, বিশ্বাস, বিশ্বাস পরিবর্তন, শিল্পচর্চায় তার প্রভাব আলোচিত হয়েছে শান্তনু কায়সারের প্রবন্ধে। 'উপন্যাসের দর্শন' শীর্ষক আলোচনায় আছে উপন্যাস-সাহিত্যে রেনেসাঁ চেতনার প্রভাব, যুগের সাথে সাথে উপন্যাস জগতের বিস্তার ও গভীরতা বৃদ্ধির বিষয়টি। আধুনিক শিল্পচেতনার অভিঘাত প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরেন সৈয়দ আজিজুল হক। এখানে বাখতিন-পরবর্তী এবং একুশ শতকের উপন্যাস সম্পর্কেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। রবিউল হুসাইনের প্রবন্ধে আমাদের স্থাপত্য, ঐতিহ্য, পরিবর্তনশীলতা, আমাদের নির্জীবতার কারণ প্রভৃতি বিষয় বিশ্লেষণ করেন। ঐতিহ্য, আধুনিকতা এবং ভবিষ্যৎ– এই তিনের টানাপোড়েনের মধ্যে থেকে শিল্পের পথ অন্বেষণ করা আবশ্যক বলে তার অভিমত। সাইমন জাকারিয়া আমাদের নাট্যঐতিহ্যের একটি সারসংক্ষেপ তুলে ধরে অভিমত ব্যক্ত করেন। তার মতে, ঐতিহ্যধারার সঙ্গে আধুনিক ধারার সংযোগ ঘটাতে না পারলে আমাদের নাট্যসাধনা জয়যুক্ত হবে না। কবি ও সম্পাদক শওকত হোসেন এ সংখ্যায় লিখেছেন 'প্রয়োজন, সম্পর্ক ও কবিতা' নামক প্রবন্ধ। লেখাটি আত্মনিষ্ঠ ও মৌলিক চিন্তাজাত। বক্তব্যের বিষয় ও ধারাবাহিকতা পাঠকের কাছে কোথাও কিঞ্চিৎ খাপছাড়া ঠেকতে পারে। বিশ্লেষণে ধার করা দর্শন বা বক্তব্য নেই বলেই রচনাটি গুরুত্ববহ। আহমাদ মোস্তফা কামাল মনে করেন শিল্প নিজেই একটি দর্শন। এরূপ বোধ শিল্প সম্পর্কে অনেক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি দিতে পারে। শিল্প কি বক্তব্যধর্মী নাকি কেবল শিল্প-সৃষ্টির লক্ষ্যেই হওয়া উচিত সে বিতর্কও বহুলাংশে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। জীবনানন্দ দাশ প্রসঙ্গে লেখক যে মন্তব্যটি করেন তাতে শিল্প সম্পর্কে আহমাদ মোস্তফা কামালের ধারণাটি আমাদের কাছে অনেকটাই স্পষ্ট হয়– 'মানুষের মৌলিক সমস্যার বাইরেও তো গূঢ়তর দার্শনিক সমস্যা আছে। সেগুলো কি কবিতার বিষয় হতে পারে না?'

আচরণেরও যে শিল্প হতে পারে সাধারণ মানুষ সে বিষয়ে সচেতনতা বোধ করে না। ফেরদৌসী সুলতানার লেখায় আচরণের শৈল্পিক দিকের তাৎপর্য তুলে ধরেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। বিভানূর মুন্সীর লেখার মূল কথা হল 'জীবনের দর্শন যেখানে শূন্য সেখানে আলাদা করে শিল্পের দর্শন খোঁজা বোকামি।'

হালখাতার শিল্পের দর্শন সংখ্যায় শিল্পের সবগুলো দিককে যে স্পর্শ করা হয়েছে তা বলা যাবে না, প্রসঙ্গ আসেনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-তাত্ত্বিক বা সমালোচকের। সেদিক থেকে হালখাতা'র শিল্পদর্শন সংখ্যাকে অপূর্ণাঙ্গই বলা যায়। তথাপি

সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন জনের আলোচনায় শিল্পের উদ্দেশ্য, প্রয়োজন, আদর্শ, দর্শন ইত্যাদি দিক সম্পর্কে পাঠক এ সংখ্যার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয় অবহিত হন। এতে যে-সব বিষয় উঠে এসেছে শিল্পের যে-কোনো শাখায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কিংবা ভোক্তার পক্ষে সে-সব ভাবনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, ক্ষেত্র-বিশেষে অপরিহার্য। এ সব লেখা তাদের ভেতর প্রশ্ন জাগায়, উদ্দীপ্ত করে জীবন, শিল্প এবং এদের পারস্পরিকতা সম্পর্কে আরও জানতে।

হাসান অরিন্দম
গল্পকার। প্রভাষক, সরকারী কে.সি কলেজ
ঝিনাইদহ।

স্বল্প সময়ে মনোযোগ কেড়েছে হালখাতা

হারুন অর রশিদ

বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতা'র এবারের বিষয় 'শিল্পের দর্শন'। এই সংখ্যার মাধ্যমে শিল্পের সকল শাখার দর্শনকে তুলে আনা সম্ভব হয়নি, যদিও শিল্পের দর্শন সংক্রান্ত যেটুকু প্রকাশিত হল তাতে আমরা শিল্পের দার্শনিক ভিত্তির খোঁজ অনেকটা পেয়ে যাই। অবশ্য বিশেষ করে সম্পাদকীয় অংশে প্রকাশ পেয়েছে যে, শিল্পের সকল শাখার দর্শনকেই হয়তো এক্ষেত্রে এক করে দেখা হয়েছে। শিল্পস্রষ্টা যে নপুংশক নয়; শিল্পও শুধু নারী-পুরুষের যৌনিক লীলার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নয়– সেটা আমরা হালখাতা'র এ-সংখ্যা থেকে জানতে পারি। আমরা যতই বলি যে, আমরা অনেক বদলে গেছি কিন্তু মৌলিক চাহিদা কি আমাদের এক চুলও বদলেছে? হয়তো এক সময় আমাদের কলেরা নামে যে ব্যারামটি হত, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুবাদে সেই ব্যারামটি আমাদের তেমন করে আর ঘায়েল করতে পারছে না কিন্তু এইডস নামক নতুন ব্যারাম এসে আমাদের জীবনকে আবার ঠিকই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছে। কাজেই সমস্যা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। ফলে দেখা যাবে যে, আমাদের মৌলিক চাহিদা– অসুস্থ হলে চিকিৎসা প্রয়োজন– এই বিষয়ের কোনোই পরিবর্তন হয়নি, হওয়া সম্ভবও নয়।

পরিবর্তন যা হয়েছে সেটা হল এক অসুখের জায়গায় আরেকটি অসুখ এসে হাজির হয়েছে। কথাগুলো বললাম এজন্য যে, আজকাল বলতে শোনা যায়, শিল্পের কোনো দর্শনের দরকার নেই, আহমাদ মোস্তফা কামালের মতে শিল্প নিজেই দর্শন; অনেকের মতে শিল্প এমন এক উন্নত বাহন যার পিঠে চড়তে পারলে দর্শন তার পেছন পেছন আসবেই। কিন্তু হালখাতার বিরোধিতাটা হয়তো এই মানসিকতার বিরুদ্ধেই; হালখাতা হয়তো প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, শিল্প আর দর্শন সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়; শিল্পের পেছন পেছন দর্শন ছোটে না বরং শিল্প কোন্ পথে চলবে কোন্ নদ-নদী কোন খেয়াঘাট দিয়ে কোন্ ফেরি বা স্টিমারে পার হবে সেটা ঠিক করে দেয় দর্শন। হালখাতার এই সংখ্যাটি সেদিক থেকে খুবই দরকারী ও সময়-উপযোগী কাজ হয়েছে বলে আমার ধারণা।

যতীন সরকারের লেখাটি একটি মাইলফলক প্রবন্ধ; আমাদের প্রচলিত চিন্তাকে নতুন করে সাজাতে সহযোগিতা করার মতো উপাদান রয়েছে এ লেখাটিতে। যা আমাদের দীর্ঘদিনের বিশ্বাসকে প্রচণ্ড মাত্রায় আঘাত করে, যে আঘাত অপমান বা দূরে ঠেলে দেয়ার নয়- যে আঘাত শত্রুর তরবারির নয়– বরং এই আঘাত যেন ভালোবাসায় কাতর পিতা বা রাগী শিক্ষকের ক্ষোভলব্ধ বেতের ভয়– এই আঘাত কাছে টানবার, চুম্বনের, সর্বোপরি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের। তিনি দেখিয়েছেন, রাজা রামমোহন রায় আর লালন ফকির একই বছর জন্মগ্রহণ করেছেন এবং দুই জগতের দুই মহারথী দুইভাবে বেড়ে উঠেছেন এবং দুই জনের মানবমুক্তির উপায়ও কীভাবে আলাদাভাবে কাজ করেছে। রাজা রামমোহন রায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর লালন ফকিরকে তিনি মুখোমুখি দাঁড় করাননি তবে পাঠক সেরকম একটি ইঙ্গিত পেয়েই যান; কেননা রাজা রামমোহন রায় শিক্ষিত, ধনবান ও প্রভাবশালী ইংরেজঘেঁষা বাস্তবতার ধারক ও পথিক; পক্ষান্তরে লালন ফকির একাডেমিকালি অশিক্ষিত, দরিদ্র, প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন ইংরেজ-প্রভাবমুক্ত অবহেলিত প্রাকৃতজন; এখান থেকে কেউ চাইলে দুটি বিপরীত ঐতিহাসিক বিরোধ বা ধারাকে বুঝে নেয়ার উৎসাহ বা সাহস পেতে পারেন। যদিও যতীন সরকার ঐতিহাসিক সেই বিরোধকে তার প্রবন্ধে পরিষ্কার করতে চাননি।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সাক্ষাৎকারটি সুচিন্তিত এবং প্রচলিত বহু বিভ্রান্তি দূর করবার অনেকগুলো গভীর সাদা কুয়াশা কেটে কেটে সত্যকে বের করে নিয়ে আসার মতো। সংক্ষেপে অথচ ধারালো ও পরিষ্কার জবাবের মাধ্যমে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথাগুলো বলেছেন। একজন শিল্পী যে সৈনিক, সংগঠক এবং যোদ্ধাও, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সে কথা বলতে পেরেছেন দ্ব্যর্থহীনভাবে। এছাড়া লিটল ম্যাগাজিন, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি সকল বিভ্রান্তির উর্ধ্বে উঠে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে নিজের মতামত তুলে ধরেছেন।

আবুল কাশেম ফজলুল হক তার বিস্তৃত প্রবন্ধটিতে যুক্তির মাধ্যমে 'আধুনিকতাবাদ, উত্তরাধুনিকতাবাদ ও রেনেসাঁস' বিষয়ে প্রগতিশীল চিন্তার ধারাকে তুলে ধরেছেন। এ বিষয়েও আমাদের মধ্যে বহুবিধ বিভ্রান্তি বিদ্যমান; জনাব কাশেমের প্রবন্ধ সেইসব বিভ্রান্তি দূর করতে সহযোগিতা করবে। প্রবন্ধটি এই সময়ের জন্য দরকার ছিল। শওকত হোসেন তার পূর্বের সব কটা অনুবাদের তুলনায় গর্ডন গ্রাহামের

এই রচনাটি অনেক বেশি ঝরঝরে ভাষায় অনুবাদ করেছেন। জাইদ-বিন-কালাম গুরুত্বপূর্ণ এই প্রবন্ধটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন; দু'জনকেই আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। তবে অনুবাদের শেষ দিকে জনাব শওকত হোসেন কিছুটা খেই হারিয়ে ফেলেছেন হয়তো।

সলিমুল্লাহ খান তার ছোট্ট প্রবন্ধের মাধ্যমে অনেক বড় কিছু আমাদের উপহার দিয়েছেন। সাধু ভাষায় হলেও গড়গড় করে পড়া যায় এবং সুচিন্তাসমৃদ্ধ এই ছোট রচনাখানিতে দিকনির্দেশনার ইঙ্গিত রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর জনাব আমিনুল ইসলাম ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত সৎ রসিক মানুষ। দর্শনের মানুষ হয়েও অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি তার 'ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির দর্শন' প্রবন্ধটি আমাদের সামনে হাজির করেছেন।

ডা. লুৎফর রহমান বাংলাভাষায় দার্শনিক চিন্তাকে জনপ্রিয় ঢংয়ে উপস্থাপন করেছেন এবং স্থান-কাল-পাত্র মাথায় রেখে এমন এক প্রকাশভঙ্গি অবলম্বন করেছেন, যে, ধর্মের বিরুদ্ধে গিয়ে নয় আবার ধর্মের অন্ধত্বকে বরণ করেও নয় বরং প্রবন্ধসাহিত্যকে এক বিশেষ গতি দেন গভীর মানবতাবাদী অনুভব ব্যক্ত করে। বাংলা ভাষায় প্রবন্ধসাহিত্যের নীরসতাকে তিনিই প্রথম প্রাণ দেন এবং জনগণের গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে নিয়ে আসেন। হালখাতায় প্রকাশিত ইসরাইল খানের 'ডা. লুৎফর রহমানের প্রবন্ধ-সাহিত্যে মানবতাবাদী দর্শন' প্রবন্ধে এ বিষয়গুলোই নানাভাবে উঠে এসেছে। তবে এই প্রবন্ধে অন্য আরও বিষয়ও ঠাঁই পেয়েছে।

কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন যে ভালো গদ্য লিখতে পারেন, সেটা তার 'স্থাপত্যশিল্পের দর্শন' প্রবন্ধটি পড়েই আমাদের বিশ্বাস করতে হল। তিনি স্থাপত্যের ইতিহাস, চিন্তা, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বিষয়গুলো খুবই সাবলীল ভাষায় তুলে ধ'রে আমাদের একটি ব্যতিক্রমী প্রবন্ধ উপহার দিয়েছেন। আহমাদ মোস্তফা কামাল-এর সাক্ষাৎকারে এক ধরনের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। যা 'হালখাতা'র প্রশ্নের জবাব আকারে আসেনি, এসেছে প্রশ্নের উত্তর না-জানা থাকা এক অসহায় মানুষের প্রতিক্রিয়া হিসাবে। ফরীদুল আলম ও সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দার 'হালখাতা'র প্রায় নিয়মিত লেখক হিসেবে আমাদের অত্যন্ত ঋদ্ধ চিন্তার প্রবন্ধ উপহার দিয়ে যাচ্ছেন। শাহ্ আলম সারওয়ার অতি সহজ-সরল ভাষায় শিল্পের অতি আলোচিত কিছু বিষয়ের আলোকপাত করেছেন তার প্রবন্ধটিতে, যা বিশেষ করে তরুণ পাঠকদের উপকারে আসবে। শান্তনু কায়সার ছোট্ট প্রবন্ধে বেশ সতেজ অনুভূতির মাধ্যমে কবিতার বস্তুভিত্তিকে প্রকাশ করেছেন। 'হালখাতা'র সম্পাদক শওকত হোসেনের 'প্রয়োজন, সম্পর্ক ও কবিতা ' প্রবন্ধটি মৌলিক চিন্তা থেকে জাত। যদিও তার লেখা নিয়ে এখানে বলতে যাওয়া অনুচিত বলে আমি মনে করি।

সৈয়দ আজিজুল হক 'উপন্যাসের দর্শন' লিখতে গিয়ে কোথাও দাঁড়াননি অর্থাৎ কোনো পক্ষ নেননি। কিন্তু আমরা তো জানি সেরা উপন্যাস রাজনীতির মাটি ছাড়া গজাতেই চায় না; সেক্ষেত্রে জনাব সৈয়দ অতটা বলিষ্ঠ হতে পারেননি নিজে কোনো

রাজনৈতিক দর্শনকে বেইস্‌ড করেননি বলে। ফেরদৌসী সুলতানা একটি অসাধারণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন আচরণ-সংক্রান্ত লেখাটি দিয়ে। কিন্তু লেখাটি যেন যৌবনদীপ্ত না হয়েই বার্ধক্যে উপনীত হল। আমার মনে হয়েছে আরও গভীর চিন্তা ও আকারের বিস্তৃতি দাবি করে এই লেখাটি।

আমরা 'হালখাতা'র সম্পাদকীয় পড়ে অতি অল্প পরিসরে পুরো সংখ্যার মোটিভ সম্পর্কে জানতে পেরেছি। শুধু তাই নয়, হালখাতা'র নিয়মিত পাঠক হিসাবে বলতে পারি, সম্পাদকীয়ও যে সুখপাঠ্য হতে পারে, সেটা সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদক উভয়ই গত চারটি সংখ্যায় প্রমাণ করেছেন।

হালখাতা'র 'শিল্পের দর্শন' সংখ্যায় আরও লিখেছেন খালিকুজ্জামান ইলিয়াস, মজিদ মাহমুদ, শাহদত হোসেন, সাইমন জাকারিয়া, বিভানূর মুন্সী, মোহাম্মদ আলী, অমিতা চক্রবর্তী ও অপর্ণা হাওলাদার।

হারুন অর রশিদ
কবি, প্রাবন্ধিক। অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বরিশাল।

প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশে ভূমিকম্প ও সুনামির ঝুঁকি এবং হ্রাসের পদক্ষেপ

জা মি লু র রে জা চৌ ধু রী / অ নু বা দ সি দ্ধা র্থ শ ং ক র জো য়া র্দা র

বাংলাদেশ সর্বাধিক দূর্যোগ-প্রবণ দেশগুলোর একটি। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্ণেডো, খরা, নদীভাঙ্গন, ভূমিধ্বস ও ভূমিকম্পের মত নানারকম প্রাকৃতিক দূর্যোগে এ-দেশ জর্জরিত। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসই বেশি পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। বিগত একশ বছরে বড় মাপের ভূমিকম্পের মুখোমুখি না হওয়ার দরুন অধিকাংশ মানুষ বাংলাদেশের ভূমিকম্পের বিষয়টাকে বেশি একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। তথাপি গত দুই দশকে ক্রমবর্ধমান হারে সেতু, ইমারত আর শিল্প কারখানা

অবকাঠামো গড়ে ওঠার ফলে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকির কথা চিন্তা করে প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, সরকারী সংস্থা আর এনজিওরা দেশের নানা অঞ্চলের ভূমিকম্প ঝুঁকি হ্রাসের ব্যাপারে ব্যাপক তৎপরতা চালাচ্ছেন। এর ওপর বেশকিছু গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে; তৈরি করা হয়েছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঝুঁকির মাত্রা সম্বলিত মানচিত্র (Seismic Zoning map)। ১৯৭৯ সালে সরকারী উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ভূমিকম্প প্রতিরোধি নকশা সংক্রান্ত একটা কোড এর রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালে প্রণীত বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড-এ একটি নতুন জোনিং ম্যাপ ও ভূমিকম্প-প্রতিরোধী নকশার নির্মাণের বি-
স্তৃত নিয়ম-কানুনগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ কিছু মাঝারি মাপের ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। ২০০৩ সালের ২৭ জুলাই রাঙ্গামাটির বরকলে ৫.৬ মাত্রার ভুমিকম্প আঘাত হানে যা চট্রগ্রাম শহরেও অনুভূত হয়। গণমাধ্যমগুলো তখন এসব প্রচার করে ব্যাপকভাবে। সম্প্রতি ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রার কাছাকাছি ৯ মাত্রার যে ভূমিকম্প সংঘটিত হয় তার ফলে সৃষ্টি হয়েছে সুনামি যা দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার অনেক দেশে অঘাত হানে । ফলে ১২ টি দেশে ২ লাখ ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যায়। আর লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলশ্রুতিতে এটাকে সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে মনে করা হচ্ছে। এসমস্ত ভূমিকম্প ও সুনামির ক্ষয়ক্ষতির ভয়াবহ চিত্র টেলিভিশনে প্রত্যক্ষ করে মানুষের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পেয়েছে মারাত্মকভাবে । সংবাদপত্র আর সাময়িকীগুলোও এসব নিয়ে বেশ আলোচনা করছে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৩ সালে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করেছে, তৈরি করেছে সামগ্রিক দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা পরিকল্পনা। প্রথম দিকে এটা সীমিত ছিল ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা নিয়ে । পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে কিছু ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার ফলে এ বিষয় নিয়ে তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে । সম্প্রতি সুনামির প্রেক্ষিতে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয় এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছে।

এই প্রবন্ধে ভূমিকম্প ও সুনামি ঝুঁকি এবং এ থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হবে ।

বাংলাদেশে সংঘটিত বড় বড় ভূমিকম্প

বিগত দেড়শ বছরে সাতটি বড় মাপের (রিক্টার স্কেলে ৭ বা তার বেশী মাত্রার ভূমিকম্প) বাংলাদেশে আঘাত হেনেছে। ঢাকা থেকে ঐসব ভূ-কম্পনের উৎপত্তিস্থল (এপিসেন্টার)-এর দূরত্ব নিচের টেবিলে দেখান হলো। এই সাতটি ভূমিকম্পের মধ্যে মাত্র দুটি (১৮৮৫ ও ১৯১৮ সালের ভূমিকম্প)-র উৎপত্তিস্থল ছিল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে।

বাংলাদেশে সংঘটিত বড় ধরনের ভূমিকম্পের তালিকা :

তারিখ ঢাকা থেকে উৎপত্তি	ভূমিকম্পের স্থান	মাত্রা (রিখটার স্কেল)	স্থলের দূরত্ব
১০ জানুয়ারি, ১৮৬৯	কাছাড় ভূমিকম্প	৭.৫	২৫০ কি.মি.
১৪ জুলাই, ১৮৮৫	বেংগল ভূমিকম্প	৭.০	১৭০ কি.মি.
১২ জুন, ১৮৯৭	গ্রেট ইন্ডিয়ান ভূমিকম্প	৮.৭	২৩০ কি.মি.
৮ জুলাই, ১৯১৮	শ্রীমংগল ভূমিকম্প	৭.৬	১৫০ কি.মি.
২ জুলাই, ১৯৩০	ধূবড়ী ভূমিকম্প	৭.১	২৫০ কি.মি.
১৫ জানুয়ারী, ১৯৩৪	বিহার-নেপাল ভূমিকম্প	৮.৩	৫১০ কি.মি.
১৫ আগস্ট, ১৯৫০	আসাম ভূমিকম্প	৮.৫	৭৮০ কি.মি.

নিচে এসব ভূমিকম্প ও তার ক্ষয়ক্ষতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল–

কাছাড় ভূমিকম্প, ১০ জানুয়ারী ১৮৬৯

এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে জৈয়ন্তিয়া পাহাড়ে। এর ফলে মনিপুর এবং আসামের কাছাড় জেলা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এতে বাংলাদেশে মূল ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চল হলো সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, যদিও সারাদেশেই ভূ-কম্পন অনুভূত হয়। এর মাত্রা ছিল ৭.৫ রিখটার স্কেল ।

'বেংগল ভূমিকম্প' ১৪ জুলাই, ১৮৮৫

এই ভূমিকম্পে সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া অঞ্চলে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হলেও মূল আঘাতটা আসে জামালপুর, শেরপুর-ময়মনসিংহ অঞ্চলে। এর তীব্রতা রিখটার স্কেলে ৭.০ ছিল বলে অনুমিত হয়। সিরাজগঞ্জ থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু সেতুর ডিজাইন করার সময় ১৯৮৭ সালে খ্যাতনামা মার্কিন ভূতত্ত্ববিদ বোল্ট এ নিয়ে আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করেন এবং তিনি উপসংহারে পৌঁছেন যে ঐ ভূমিকম্পটির উৎপত্তি স্থল মানিকগঞ্জ (২৩°৫৯´ উ:ও ৯০°৬´ c~:) ছিল না (যেটা ছিল Middlemeiss-এর গবেষণার ফলাফল), ছিল বগুড়া ফল্ট সিস্টেম (২৮.৮০গ্দ উ:, ৮৯.৫০গ্দ পূ:) এর কাছে।

'বিশাল ভারতীয় ভূমিকম্প', ১২ জুন ১৮৯৭

এর মাত্রা ছিল ৮.৭ এবং এই ভূকম্পনের উৎপত্তিস্থল ছিল (মেঘালয়, ভারতের) শিলং মালভূমির মাঝখানে। এটাকে পৃথিবীর অন্যতম ভয়াবহতম ভূমিকম্প হিসেবে ধরা হয় এবং বাংলাদেশ গত কয়েকশ বছরে সম্ভবত সবচেয়ে বেশী ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হয় এই ভূমিকম্পের ফলে। এই ভূমিকম্পের দরুণ সিলেট, ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চল এবং

রংপুরের পূর্বাঞ্চলই সবচেয়ে তীব্র ক্ষয়ক্ষতির কবলে পড়ে; তা ছাড়া ঢাকাসহ সারাদেশেই কমবেশি ক্ষয়ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় । এতে বাংলাদেশে মানুষ মারা যায় ৫৪৫ জন ।

শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্প ৮ জুলাই, ১৯১৮

এর মাত্রা ছিল ৭.৬ এবং এর উৎপত্তিস্থল ছিল শ্রীমঙ্গলের কাছে বলিশেরা উপত্যকায় । চা বাগান অধ্যুষিত এই এলাকায় অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় । কিন্তু এর ফোকাল ডেপথ (ভড়পধষ ফবঢ়ঃয) কম হওয়ায় দ্রুত এর তীব্রতা হ্রাস পায়, যার ফলে ঢাকাতে এর প্রভাব পড়ে অল্প ।

ধুবড়ী ভূমিকম্প, ৩ জুলাই, ১৯৩০

আসামের ধূবড়ীতে ছিল এর উৎপত্তিস্থল । মাত্রা ছিল ৭.১ । এতে বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয় শুধুমাত্র রংপুরের পূর্বাঞ্চলে ।

বিহার ভূমিকম্প, ১৫ জানুয়ারী, ১৯৩৪

এর মাত্রা ছিল ৮.৩ এবং এর উৎপত্তিস্থল ছিল বিহারের দারভাঙ্গার উত্তরাঞ্চলে । বিহার, নেপাল ও উত্তরপ্রদেশে এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও এতে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি ।

আসাম ভূমিকম্প, ১৫ আগস্ট, ১৯৫০

এটাও ছিল বিশ্বের বড় মাপের ভূমিকম্পগুলোর একটি । এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৮.৫ । এর উৎপত্তিস্থল ছিল আসামের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কাছে অরুনাচল প্রদেশে । এতে সারাদেশে ভূ-কম্পন অনুভূত হলেও বাংলাদেশের কোন জায়গা থেকে ক্ষয়ক্ষতির কোন খবর পাওয়া যায়নি ।

সাম্প্রতিক কিছু ভূমিকম্প

যদিও গত ছয় বছরে দেশের নানা জায়গায় বেশকিছু ভূ-কম্পনের ঘটনা ঘটেছে তবে তার মধ্যে চারটির কথা উল্লেখ করা যায় যার দরুণ জানমালের বেশ ক্ষতি সাধিত হয়েছে । সে গুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো–

সিলেট ভূমিকম্প, ৮ মে, ১৯৯৭

এর মাত্রা ছিল ৫.৬ । উৎপত্তিস্থল ছিল উত্তর-পূর্ব সিলেটে জৈয়ন্তাপুর (২৪.৮৯গদ উ:, ৯২.২৫গদ পূ:) এর নিকটে । এর ফলে সিলেটের আশপাশের বেশকিছু ঘড়বাড়িতে ফাটল দেখা দেয়, যেমন সিলেট বিমানবন্দর ভবনে, জৈয়ন্তাপুরে একটা কলেজে ও বড়লেখার গ্রামীণ ব্যাংক ভবনে ।

বান্দরবান ভূমিকম্প, ২১ নভেম্বর ১৯৯৭

এর মাত্রা ছিল ৬.০ এবং উৎপত্তিস্থল ছিল বাংলাদেশ-মায়ানমার (২৪.৮৯গ্দ উ:, ৯২.২৫গ্দ পূ:) সীমান্তে। এর প্রভাবে চট্টগ্রামের বেশকিছু ভবনের ক্ষতি হয়। চট্টগ্রামের একটা ভবন ধ্বসে প্রায় ২০ জন মানুষ মারা যায়।

মহেশখালী ভূমিকম্প, ২২ জুলাই ১৯৯৯

এর মাত্রা ছিল ৫.১। মহেশখালী দ্বীপে ছিল এর উৎপত্তি স্থল। ভূ-কম্পনের ফলে বেশকিছু কাঁচা-পাকা ঘড়বাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হয়। ৬ জন মানুষ মারা যায়।

বরকল (রাঙ্গামাটি) ভূমিকম্প, ২৭ জুলাই, ২০০৩

রিক্টার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৫। এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল কলাবুনিয়া (২১.৪৭০ উ:, ৯২.৩০০ পূ:)-র কাছাকাছি। এর প্রভাবে ফাটল দেখা দেয় বেশকিছু ঘড়বাড়িতে, ৫০০'র মত কাঁচা বাড়ির দেওয়াল ধ্বসে পড়ে, মানুষ মারা যায় দুজন এবং ১০০ জনের মত মানুষ আহত হয়। এর সর্বোচ্চ তীব্রতা হিসাব করা হয় ঠওও। চট্টগ্রাম শহরেও অনুভূত হয় এর কম্পন এবং বেশকিছু ইটের তৈরি ভবনে ফাটল সৃষ্টি হয়। ২০০৩ সালের ১৩ আগস্ট পর্যন্ত ভূমিকম্পোত্তর মোট ১৪ বার ছোট ছোট কম্পন অনুভূত হতে থাকে।

প্রধান প্রধান ভূকম্পন উৎস

মার্কিন বিশেষজ্ঞ বোল্ট বাংলাদেশের ভিতরে-বাইরে নানা ভূকম্পন উৎস বিশ্লেষণ করে এসব জায়গায় সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ভূকম্পন মাত্রা নির্ধারণ করেন। তিনি সম্ভাব্য ভূমিকম্পের নিম্নলিখিত চারটি উৎসের অবস্থান নির্দিষ্ট করেন–

(ক) আসাম (বর্তমান মেঘালয়) চ্যুতি এলাকা
(খ) ত্রিপুরা চ্যুতি এলাকা
(গ) সাব-ডাউকি চ্যুতি এলাকা
(ঘ) বগুড়া চ্যুতি এলাকা

তাঁর মতে, ভূমিকম্পের পুরাতন ক্যাটালগে যেভাবে রেকর্ড করা হয়েছে তাতে দেখা গেছে এইসব টেকটনিক ব্লক থেকে সর্বোচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়েছে। এই সব ঐহিতাসিক ক্যাটালগে প্রায় ২৫০ বছরের ভূমিকম্প পরিস্থিতি উঠে এসেছে তবে তাতে অপর্যাপ্ত উপাত্তের দরুণ এই সব টেকটনিক অঞ্চলের প্রকৃত চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন আসাম (বর্তমান মেঘালয়) ও ত্রিপুরা চ্যুতি থেকে ভবিষ্যতে যথাক্রমে ৮.৬ ও ৮.০ মাত্রার ভূমিকম্প উৎপন্ন হতে পারে।

বোল্টের মতে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্প-উৎস সমূহ:

অঞ্চল	সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ভূকম্পন মাত্রা
আসাম (বর্তমান মেঘালয়) চ্যুতি এলাকা	৮.০
ত্রিপুরা চ্যুতি এলাকা	৭.০
সাব-ডাউকী চ্যুতি এলাকা	৭.৩
বগুড়া চ্যুতি এলাকা	৭.০

এসব তথ্যউপাত্তগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে ১৯৯২ সালে আলী ও চৌধুরী 'অপারেশনাল বেসিস ভূমিকম্প' এবং 'ম্যাক্সিমাম ক্রেডিবল আর্থক্যুয়েক বা সর্বোচ্চ সম্ভাব্য ভূমিকম্প' মাত্রা নির্ধারণ করেন। এসব ভূমিকম্পের ডেপথ অব ফোকাস দূরুত্বও তারা নির্ণয় করেন। তাঁদের মত অনুসারে টেকটনিক অঞ্চল ও এগুলো থেকে ভূমিকম্প সৃষ্টির ক্ষমতা নিম্নরূপ হতে পারে:

অঞ্চল	অপারেটিং বেসিস মাত্রা	ম্যাক্সিমাম ক্রিডিবল মাত্রা	ডেপথ অব ফোকাস
আসাম (মেঘালয় চ্যুতি এলাকা)	৮.০	৮.৭	০-৭০
ত্রিপুরা চ্যুতি এলাকা	৭.০	৮.০	০-৭০
সাব-ডাউকী চ্যুতি এলাকা	৭.৩	৭.৫	০-৭০
বগুড়া চ্যুতি এলাকা	৭.০	৭.৫	০-৭০

সাম্প্রতিক কালের সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক চ্যুতি থেকে সৃষ্ট মাঝারি মাপের ভূমিকম্প দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আঘাত করতে পারে। এবং প্লেট সীমানা থেকে উৎপন্ন হয়ে এর প্রভাব মায়ানমার ও ভারতের মিজোরাম অতিক্রম করতে পারে।

বাংলাদেশে আঘাতকারী সুনামির উৎস

বঙ্গোপসাগরে সুনামির দৃষ্টান্ত খুব বেশি নয়। বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় বিগত ২৫০ বছরে বাংলাদেশের উপকূলে যেসব সুনামি আঘাত হেনেছে তা সৃষ্টি হয়েছে ৬টি ভূমিকম্প আর একটি অগ্নুৎপাত (ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকাতোয়া) থেকে। এই সব ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এবং ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রাতে। ১৭৬২, ১৮৮১ ও ১৯৪১ সালে যেসব সুনামি হয়েছে সেগুলো থেকে বাংলাদেশে কিছু ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়।

বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের উপকূলে খুব কাছে যদি বড় ধরনের ভূমিকম্প সৃষ্টি হয় তাহলে তা সুনামি সৃষ্টি করতে সক্ষম। এবং তা হতে পারে ইন্ডিয়ান প্লেট ও বার্মা প্লেট (আন্দামান দ্বীপের উত্তরাঞ্চল)-এর সীমানা থেকে মায়ানমারের

উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যে। প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে অনুমান করা হয় এ দুটি প্লেটের সীমানা উত্তর-দক্ষিণ বরাবর। আর সুনামি সৃষ্টির বেলায় প্রধানত শক্তি বিকীর্ণ হয় সীমানার আড়াআড়িভাবে অর্থাৎ বর্তমান অবস্থায় তা হলো পূর্ব-পশ্চিম (২৬ ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে সুমাত্রাতে যেভাবে ঘটেছিল)। তাছাড়া উপকূল বরাবর মহীসোপানে পানির গভীরতা হ্রাস পাওয়ায় সুনামির গতিটা কমে যায়। ১০মিটার গভীরতায় এর গতি থাকে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৩৬ কি.মি.। তাই এটা যদি মেঘনা নদীর মোহনা থেকে ১০০ কি. মি. দূরে থাকে তাহলে ২ঘন্টারও বেশি সময় পাওয়া যাবে যার মধ্যে মানুষকে সতর্ক করে আশ্রয় কেন্দ্রে সরানো যায়। যাই হোক সর্বশেষ গবেষণা থেকে সুনামির গানিতিক মডেল ও প্লেট বাউন্ডারীর অবস্থান ও গতি প্রকৃতি বিশদ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। সাম্প্রতিক একটা গবেষণাপত্রে অস্ট্রেলিয়ান গবেষক কামিন্স বলেছেন যে মায়ানমার, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার জনাকীর্ন উপকূলে বসবাসকারী প্রায় এক কোটি মানুষ সুনামির ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বাস করছে যা কিনা ২০০৪ সালের সুমাত্রিয় উপকূলের সুনামির মতই বিধ্বংসী হতে পারে। তবে অনেক বিজ্ঞানীই তার এই ভবিষ্যতবাণীর সাথে একমত নন।

বাংলাদেশে আঘাতকারী সুনামি সমূহ:

তারিখ	ভূমিকম্পের	অবস্থান	বিবরণ	তীব্রতা
১২ এপ্রিল,১৭৬২	৭.৫	আরাকান উপকূল, মায়ানমার	কক্সবাজার ও উপকূলীয় অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্থ হয় । সুনামির উচ্চতা ছিল ১.৮ মি: বুড়িগঙ্গার পানির উচ্চতা হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় ১০০ মানুষ নৌকা ডুবে মারা যাওয়ার খবর পাওয়া যায় ।	
৩১ অক্টোবর, ১৮৪৭	--	নিকোবর দ্বীপ	--	
৩১ ডিসেম্বর, ১৮৮১	৭.৯	নিকোবর দ্বীপ	--	
২৭ আগস্ট, ১৮৮৩		ক্রাকাতোয়া অগ্নুৎপাত	--	
১৮৮৪	--	বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমাঞ্চল (হুগলি নদীর মুখে)	পোর্ট ব্লেয়ার, ডাবলেট	
২৬ জুন ১৯৪১	৮.১	আন্দামান সাগর ১২.৯°উ:, ৯২.৫°পূ:	--	
২৬ ডিসেম্বর ২০০৪	৯.০	সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া	সারাদেশে ভূকম্পন অনুভূত হয়, পটুয়াখালির আঁধার মানিক নদীতে নৌকা ডুবিতে ২ জনের মৃত্যু হয়। তাছাড়া সারাদেশের খাল নদী, ইত্যাদির পানি উত্তাল হয় ।	

ভূমিকম্পের ঝুঁকির মানচিত্র

এই উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ভারতের জিওলজিক্যাল সার্ভে ১৯৩৫ সালে একটা ভূমিকম্পের ঝুঁকির মানচিত্র তৈরি করে। ভূমিকম্প ঝুঁকির বিষয়টা বিবেচনা করে অবিভক্ত ভারত অঞ্চলকে তিনটা অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছিল– তীব্র, মাঝারি ও স্বল্প মাত্রার ঝুঁকির অঞ্চল। এই মানচিত্র মূলত প্রস্তুত করা হয়েছিল অতীতে সংঘটিত ভূমিকম্প বিবেচনা মাথায় রেখে। বাংলাদেশের একটা বৃহৎ অঞ্চলকে (উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব) সবচেয়ে ভয়াবহ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। পাকিস্তান সরকারের অবহাওয়া বিভাগ ১৯৬০ এর দশকে একটা মানচিত্র তৈরি করে এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ সেটা গ্রহণ করে । এতে বাংলাদেশকে চারটি এলাকায় ভাগ করা হয়েছে; অতি ঝুঁকিপূর্ণ; মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ; স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ ও অতি কম ঝুঁকিপূর্ণ।

১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সময় যখন বেশ কিছু বড় বড় শিল্প কারখানা (যেমন-আশুগঞ্জের সার কারখানা) তৈরির পরিকল্পনা করা হয় তখন ভূমিকম্প-ঝুঁকির বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এবং জনগনের উদ্বিগ্নতা বেড়ে যায় ১২ মে ১৯৭৭ সালে যখন চট্রগ্রাম শহরে ভূকম্পন অনুভূত হয়। ১৯৭৭ সালের জুন মাসে সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। এদের টার্ম্স অব রেফারেন্সের মধ্যে ছিল একটা ভূমিকম্প ঝুঁকির মানচিত্র তৈরি করা, ভূমিকম্প-প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ইমারত ডিজাইনের জন্য বিল্ডিং কোড তৈরি করা, ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পূর্বসতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রাসংগিক তথ্য-উপাত্তের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি। এই কমিটি এ-সব বিবেচনা করে ১৯৭৯ সালে একটা ভূমিকম্প ঝুঁকির মানচিত্র তৈরি করে।

১৯৯২ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড তৈরির জন্য সরকার একটি উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেন। এটা তৈরির সময় গবেষণার অংশ হিসেবে তারা প্রাপ্ত উপাত্তের ব্যাপক পর্যালোচনা করেন এবং একটি সংশোধিত ঝুঁকিসম্বলিত মানচিত্র তৈরি করা হয়। এটাকে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আগের মানচিত্রের মাধ্যমে দেশকে যে তিনটি জোনে বিভক্ত করা হয়েছিল সেটা নতুন মানচিত্রেও রাখা হয়। এতে সবচেয়ে মারাত্মক অঞ্চল হিসেবে অঞ্চল ৩-কে চিহ্নিত করা হয় যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল অংশ।

সম্প্রতি সর্বশেষ উপাত্ত বিশ্লেষণ করে একটা গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এতে বাংলাদেশের বৃহৎ অঞ্চলকে অঞ্চল-৩ (সবচেয়ে মারাত্মক)-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যার মধ্যে পড়েছে চট্রগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল (যে অঞ্চল ইঘইঈ ১৯৯৩-তে জোন ২ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডে ভূমিকম্প-প্রতিরোধী নকশার অন্তর্ভুক্তি:

বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (একে সাধারণত ইঘইঈ ১৯৯৩ বলা হয়) এর মধ্যে ভূমিকম্প প্রতিরোধের জন্য কংক্রিট, ইটের দেওয়াল ও ইস্পাতের কাঠামো ব্যবহার করে ইমারত ডিজাইন ও নির্মাণের পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃত নির্দেশনা আছে। সম্প্রতি (নভেম্বর, ২০০৬) সরকারিভাবে এই কোড মানার ব্যাপারে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন অ্যক্ট, ১৯৫২ এর বিধিমতে ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা জারি করা হয়েছে (এবং ২০০৭ ও ২০০৮ সালে তা সংশোধন করা হয়)। প্রত্যেক স্থপতি ও প্রকৌশলীর ক্ষেত্রে ঐ কোড অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেক প্রকৌশলীকে স্থপতিকে রাজউকে নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইমারতের নকশা প্রনয়ণ ও ইমারত তৈরির সাথে যেসব নিবন্ধিত পেশাজীবি সংশ্লিষ্ট থাকবেন, তারা এর যে-কোন ত্রুটির জন্য দায়ী থাকবেন। এ-সব কিছু করার উদ্দেশ্য হলো ঢাকা মহানগরের ইমারতের গুণগত মান উন্নত করা। এইভাবে অন্যান্য মহানগর ও শহরাঞ্চলে এসব নিয়ম-কানুনগুলো চালু করতে হবে। সাথে সাথে সারাদেশে এর বিস্তৃতি ঘটাতে হবে। শুধুমাত্র ইটের কাঠামো দ্বারা তৈরি চার-পাঁচ তলা ভবনগুলো সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে আছে। তবে যে সব ঘরবাড়ী সনাতনী পদ্ধতিতে নির্মিত- যেমন (সিলেট অঞ্চলে কাঠের তৈরি হলকা ঘর) এগুলো ভূমিকম্পের বিবেচনায় বেশ ভালো অবস্থানে আছে।

এছাড়া রেট্রোফিটিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিদ্যমান ভবনগুলোকে ভূমিকম্প প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে (যেমন, আব্দুল গনি রোডের খাদ্যভবন)। ঢাকার গুলশানের একটি ৬তলা ভবনকেও সম্প্রতি ভূমিকম্প প্রতিরোধী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রেট্রোফিটিং করা হয়েছে। বাংলাদেশে সামনের বছরগুলোতে আরো অনেক ভবন নির্মিত হবে, যেগুলির ডিজাইনে বা নির্মাণে প্রকৌশলীর জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এ ধরনের ভবনের মালিক বা নির্মাতার সহায়তার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আর্থকোয়েক সোসাইটি কানাডিয়ান ইন্টারনেশনাল ডিভাল্পমেন্ট এজেন্সীর সহায়তায় আর্থকোয়েক রেজিসটেন্ট ডিজাইন ম্যানুয়েল নামে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় একটা ম্যানুয়েল বের করেছে। এই ম্যানুয়েলের ভিতর বিদ্যমান ভবনগুলোর সংস্কার, রেট্রোফিটিং ইত্যাদি বিষয়ে দিক নির্দেশনা আছে।

ঢাকা শহরের ভিতর তুলনামুলক ভূমিকম্প ঝুঁকি

বিশ্বের বড় বড় শহরে ভূমিকম্প ঝুঁকি নিয়ে পর্যালোচনার অংশ হিসেবে জাতিসংঘ ১৯৯৮ সালে ইন্টারন্যাশনাল ডিকেড ফর ন্যাচারাল ডিজাস্টার রিডাকশন (ওউঘউজ) নামে একটা কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর অংশ হিসেবে ১৯৯৯ সালে 'আন্ডারস্টান্ডিং আরবান সিসমিক রিস্ক অ্যারাউন্ড দ্যা ওয়াল্ড' নামে একটা গবেষণাকর্ম পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে পরিচালনা করা হয়। তুলনামূলক বিচারে প্রায় ২০টি শহরের মধ্যে ঢাকাকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শহর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

ভূমিকম্প ঝুঁকির ওপর যে কোন ধরনের গবেষণাকর্মের অসুবিধা হলো তথ্যের অপ্রতুলতা। যদিও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বড় মাত্রার ভূমিকম্প সম্পর্কে আমরা প্রচুর তথ্য পেতে পারি, যেমন মার্কিন যুক্তিরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল ভূমিকম্প ইনফরমেশন সেন্টার (www.neic.cr.usgs.gov)। তবে ঝুঁকি নির্ণয়ের জন্য কম মাত্রার ভূমিকম্পের ওপরও আমাদের তথ্য প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক তথ্য নিয়ে ১৯৯৯ সালে একটা ক্যাটালগ তৈরির কাজ শুরু হয়। তাছাড়া বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (ইটঊএঞ) এর পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় একটা প্রকল্প হাতে নিয়েছে । এটির মূল লক্ষ দুটি –

ক. অতীত থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত ভূমিকম্প সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের পর তার যথাযথ বিশ্লেষণ।
খ. ঢাকা শহরের মধ্যে যেসব পুরকৌশল স্থাপনা আছে, বিশেষ করে যেসব ইমারত আছে, তাদের থেকে উপাত্ত সংগ্রহ । সম্ভাব্য ভূমিকম্প মোকাবেলায় যাতে করে ঐসব উপাত্তগুলো কাজে লাগানো যায় ।

দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা

১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোন সরকারি সংস্থাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে সামগ্রিক দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র জোর দেওয়া হয়েছে দুর্যোগ-উত্তর ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডের ওপর যার প্রতিফলন ঘটেছে বন্যা, সাইক্লোন, খরা ও দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত নানা স্থায়ী নির্দেশনার ওপর। গত কয়েক বছরে এসব বিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। ১৯৯৩ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো গঠিত হয়েছে। ত্রান ও পুনর্বাসন মন্ত্রনালয়ের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রনালয়। ২০০৪ সালে এই মন্ত্রনালয় খাদ্য মন্ত্রনালয়ের সাথে একীভূত হয়ে নতুন নাম হয়েছে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়। এর ফলে প্রস্তুতি ও দুর্যোগপূর্ব পরিকল্পনার ওপর অব্যাহতভাবে জোর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

'বন্যা মোকাবিলায় স্থায়ী নির্দেশনা' (১৯৮৪) ও 'ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় স্থায়ী নির্দেশনা' (১৯৮৫) কে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্থায়ী নির্দেশাবলী' (বাংলা ১৯৯৭, ইংরেজি ১৯৯৯)-এ রূপান্তর করা হয়েছে যা ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা ছাড়াও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। দুর্ভাগ্যজনক এই যে, এই সব স্থায়ী নির্দেশাবলী তৈরির সময় ভূমিকম্পের বিবেচনাটা মাথায় রাখা হয়নি। সম্প্রতি এই নির্দেশনাবলীতে ভূমিকম্পের বিষয়টাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সুনামি হওয়ার ফলে এই বিষয়টা নিয়ে ভাববার সময় এসেছে। সামগ্রিকভাবে এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অংশ হিসেবে ন্যাশনাল ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট এডভাইজরী কমিটি গঠনের কথা উল্লেখ রয়েছে, যাদের বছরে তিনবার মিলিত হওয়ার কথা; যারা ভুমিকম্প-প্রকৌশল বিদ্যার ওপর বিশেষ দক্ষতা অর্জন করবেন তাদের এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে (স্টান্ডিং অর্ডার ১৯৯৯)। ১৮৯৭ সালের মত যদি কোন ভূমিকম্প আবার আঘাত হানে তাহলে

ঢাকা শহরের বহু ঘরবাড়ি ধ্বসে পড়বে। তাই এই মুর্হূতে বিশেষভাবে দরকার হয়ে পড়েছে উদ্ধার তৎপরতার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঢাকাতে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা নেই। যেমন- ১৯৮৫ সালে জগন্নাথ হলের মিলনায়তন ধ্বসে পড়ার পর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একটা গাড়ি পর্যন্ত পাওয়া যায়নি যেটা ব্যবহার করে ভবনের নিচে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধার করা যেতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে যদি বড় মাপের কোন ভূমিকম্প হয়, তাহলে শত শত ভবন থেকে এ-ধরনের উদ্ধার তৎপরতা চালাতে হবে। সে হিসাবে আমাদের কোন প্রস্তুতিই নেই।

সুনামি মোকাবেলা

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের সুন্দরবন থেকে দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের টেকনাফ পর্যন্ত ৭২০ কি.মি. জুড়ে বিস্তৃত যে উপকূলীয় অঞ্চল আছে, সেখানে বর্তমানে প্রায় দেড় কোটি লোক বাস করে। এদের অনেকেই উপকূলীয় দ্বীপসমুহে থাকে যেখানে ভূমিপৃষ্ঠ থেকে মাত্র কয়েক ফুট উঁচু। এই সব উপকূলীয় অঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বছরে প্রায় ৩ শতাংশ (জাতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেখানে ১.৭%)। বাংলাদেশে ভুমিকম্প প্রতিরোধ সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্যটা হলো ঘড়বাড়ি ও অবকাঠামো রক্ষা এবং এই দুর্যোগ সংক্রান্ত জনসচেনতা বৃদ্ধি। সংশোধিত জোনিং ম্যাপে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের অনেক এলাকা জোন-৩-এ ফেলা হয়েছে যা পড়েছে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মধ্যে। কিন্তু এই বিল্ডিং কোডে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ভূমিকম্পের ফলে অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি, মাটির তারল্য এবং ভূমিধ্বস ঠেকানোর কৌশল নিয়ে। এই কোড তৈরীর সময় বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা বা প্রকৌশলীরা সুনামি নিয়ে কখনই ভাবেননি। তবে উপকূলীয় অঞ্চলে আগেই বলা হয়েছে ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাসের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং যদিও সুনামি মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি আমাদের নেই তবুও আমরা যদি যথেষ্ট সতর্কতামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করি এবং বঙ্গোপসাগরের পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশগুলোর সহযোগিতায় একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করি, তাহলেই বিপুল জনগোষ্ঠীকে সুনামির ঝুঁকি থেকে আমরা বাঁচাতে সক্ষম হব।

উপসংহার

প্রাপ্ত তথ্যউপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানই কোন না কোনভাবে ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে আছে। প্রায় আড়াই কোটি মানুষ জোন ৩-এ বাস করে, যা কিনা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬ ভাগের ১ ভাগ এবং এই অঞ্চলকে বলা হচ্ছে সবচেয়ে বেশী ঝূঁকিপূর্ণ অঞ্চল। এক কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ অধ্যুষিত ঢাকা মহানগর ছাড়াও প্রধান বন্দর নগরী চট্রগ্রাম পড়েছে জোন ২-এ। আমাদের দরকার ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিংগুলোকে চিহ্নিত করা ও তাদের ভূমিকম্প প্রতিরোধী হিসেবে গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ও খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয় জনসচেনতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও বিভিন্নভাবে গবেষণাকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে,

বিশেষ করে তারা গবেষণা চালাচ্ছে ভূ-তত্ত্ব, ভূমিকম্প, ভূমিকম্প-প্রকৌশল বিদ্যা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (ভারত), সুমাত্রা ও ইন্দোনেশিয়ায় অগ্নুৎপাতের কারণে এর আগে বাংলাদেশে সুনামি আঘাত হেনে থাকতে পারে। ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর যে সুনামি হয় তাতে বাংলাদেশ সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে। এই ভূমিকম্পের দরুন অল্প কিছু অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। অবশ্য এর ফলে খাল পুকুরের পানি ব্যাপক উত্তাল হতে দেখা যায়, (যেটাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় 'সাইস' বলা হয়) এবং এর ফলে জনমনে সৃষ্টি হয় আতংক। ২০০৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর যে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয় তাতে করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে জোরপূর্বক নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু সেটা ভুল সতর্কসংকেত হওয়ার কারণে দুই মাস পর সাইক্লোন সিডরের সময় এর একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে অস্বীকৃতি জানায় (১৫ নভেম্বর, ২০০৭)। ভারত মহাসাগরের আশপাশে প্রতিষ্ঠিত সুনামি সতর্কীকরণ নেটওয়ার্কে আন্তর্জাতিক সংগঠনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন দরকার জনগনের সচেতনতা ও সতর্কতার যথাযথ প্রচার প্রচারণা, আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ যেখানে মানুষ দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারে। (কিছুটা সংক্ষিপ্ত রূপ)

অনুবাদ সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দার

[ড. প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী, প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, পুরকৌশল (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং) বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। বর্তমানে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বাংলাদেশ ভূমিকম্প সোসাইটির সভাপতি। তাঁর লেখা Risk of Earthquake and Tsunami in Bangladesh and Mitigatory Measures প্রবন্ধের এটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।]

ভূমিকম্পেরও আগাম বার্তা পাওয়া সম্ভব

আ ই নু ন নি শা ত

[আজ ২৯ নভেম্বর ২০০৮ তারিখ। বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতা'র পক্ষ থেকে আমরা মুখোমুখি হয়েছি ড.আইনুন নিশাত-এর। 'হালখাতা'র এবারের বিষয় 'বাংলাদেশে ভূমিকম্প'। এ বিষয়ে কিছু প্রশ্নের জবাব আজ আমরা জানতে চাইব ড. নিশাত-এর কাছ থেকে। জনাব নিশাত প্রাক্তন অধ্যাপক, পানিসম্পদ কৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। বর্তমানে তিনি InternationalUnion For Conservation Of Nature-Gi Country Representative. এছাড়া তিনি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণামূলক কাজ করছেন। একাডেমিকালি ভূমিকম্প নিয়ে গরেষণাকর্ম না থাকলেও, এবিষয়ে তাঁর রয়েছে দেশে-বিদেশে অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা। প্রকৌশলী হওয়ার কারণে ব্যক্তিগতভাবে এক্ষেত্রে ড. নিশাতের রয়েছে বিশেষ আগ্রহ।]

হালখাতা

প্রায়ই শোনা যায় বাংলাদেশ ভূমিকম্প-ঝুঁকিতে আছে; আপনি বলবেন কি, প্রধানত কী কারণে বাংলাদেশ ভূমিকম্পের এতটা ঝুঁকির মধ্যে আছে?

আইনুন নিশাত

প্রথমে বলে নেয়া দরকার যে আমি ভূমিকম্প বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নই। তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোন থেকে এ বিষয়ে কিছু পড়াশুনা করেছি। আমরা যে ধরনের ভূমিকম্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি, সেটা হল টেকটনিক প্লেট-এর নড়াচড়ার কারণে আশঙ্কা রয়েছে যে বড় ধরনের ভূমিকম্প আমাদের এখানে যে-কোনো সময় হতে পারে। গত দুইশত বৎসরের উপাত্ত দেখলে দেখা যাবে যে বড় বড় ভূমিকম্প হয়েছে শ্রীমঙ্গলকে কেন্দ্র করে, বগুড়াকে কেন্দ্র করে, বিহারকে কেন্দ্র করে, আসামকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ আমাদের দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশ, উত্তর-পূর্বাংশ এবং পার্বত্যচট্টগ্রাম– এসব জায়গাগুলোতে ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা যথেষ্ট। এবং স্ট্যাটিস্টিক্যালি ৭.৮ রিখটার স্কেল মাত্রার ভূমিকম্প যে-কোনো সময় বাংলাদেশে ঘটে যেতে পারে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, প্রবাবিলিটির বিচারে একশত বছরে একবার যে

উঁচুমাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তা গত একশত বছরে হয়নি। কাজেই বুঝতেই পারছেন আমরা কতটা ভূমিকম্প ঝুঁকিতে আছি।

হালখাতা

যে টেকটোনিক প্লেটের কথা গবেষকরা বলে থাকেন, এখানে আপনিও সেই প্লেটের কথা বললেন। আপনি আরেকটু বিস্তারিতভাবে বলবেন কি, এই টেকটোনিক প্লেট আসলে কী?

আইনুন নিশাত

ভূপৃষ্ঠের নিচে যে রক বা পাথরের স্তর রয়েছে সেই পাথর কিন্তু একটি পাথর নয়। মানুষের মাথার খুলি যেমন অনেকগুলো হাড় দিয়ে গঠিত, আমরা কঙ্কালের খুলিতে যে হাড়ের জোড়াগুলো দেখতে পাই, পৃথিবী আসলে সেরকম অনেকগুলো পাথরের প্লেটের সমষ্টি। মাথার খুলির মতো এই পাথরগুলোর জোড়া যেখানে অর্থাৎ একটা পাথরের সাথে আরেকটা পাথরের ওভারল্যাপ আছে সেখানে। এই জোড়া বা ওভারলেপ যেখানে আছে সেখানে নানা কারণে প্লেট-এর স্থানচ্যুতি হতে পারে। তার ফলেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর মানচিত্রে আপনারা দেখবেন ভূমিকম্প বেশি হয় কতগুলো আঁকা-বাঁকা লাইন ধরে। এই আঁকা-বাঁকা লাইনগুলোই হল ঐ পাথরগুলোর সংযোগস্থল বা প্লেটগুলোর জয়েন্ট। একটা প্লেট ইন্দোনেশিয়ার দিক থেকে বেরিয়ে আন্দামানের পাশ দিয়ে মায়ানমারের ভিতর দিয়ে চীনের দিকে চলে গেছে। এছাড়া শিলং ফল্ট বলেও আরেকটা ফাটল আছে। বাংলাদেশের উত্তরে শেরপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ, সুনামগঞ্জ– অর্থাৎ যে সীমারেখাটা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে গেছে সেটার সমান্তরাল। এই এলাকায় বড় ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে। আমাদের এখানে ভূমিকম্প যে কারণে আঘাত করতে পারে সেটা হল প্লেটের মুভমেন্টের কারণে। এই প্লেট যে একবার মুভ করে থেমে যায় তা নয়। সে-কারণে অনেক সময় একটি ভূমিকম্প হয়ে যাওয়ার পরে একাধিক ঝাঁকুনি দেয়; এটাকে আফটার শক বলে। এবং পরের ঝাঁকুনি আগের ঝাঁকুনির চেয়েও শক্তিশালী হতে পারে। আরো একটি কারণে ভূমিকম্প হতে পারে। সেটা হল আগ্নেয়গিরি অগ্নুৎপাতের কারণে সমুদ্রের নীচে লাভা উদগিরণের সময়ে বড় ধরনে ভূমিকম্প হয়।

হালখাতা

বাংলাদেশে কিংবা এর আশপাশে তো আগ্নেয়গিরি নেই, সে-কারণে অন্তত আগ্নেয়গিরির কারণে যে ভূমিকম্প হয়, সেটা তো এখানে হবে না? সে-দিক থেকে আমরা কি নিরাপদ?

আইনুন নিশাত

আমাদের দেশটি যে অঞ্চলে অবস্থিত সে অঞ্চলটি প্রধানত পলি দ্বারা গঠিত। এই অঞ্চলে আগ্নেয়গিরি নেই। এমনকি এর আশপাশের যে অঞ্চল, যেমন ধরা যাক

হিমালয় বা হিমালয়ের যে রেঞ্জ অর্থাৎ আসাম, অরুণাচল– এখানেও আগ্নেয়গিরি নেই। সেজন্য বাংলাদেশে টেকটোনিক প্লেটের কারণেই বড় ধরনের ভূমিকম্প হবে। ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং একটি বড় মাত্রার ভূমিকম্প ঘটলে প্রচণ্ড মাত্রার ক্ষয়-ক্ষতি হবে এবং বাংলাদেশে এটা ঘটার আশঙ্কা প্রচুর।

হালখাতা

আগ্নেয়গিরি থেকে ভূমিকম্প এবং ভূমিকম্প থেকে সুনামির সৃষ্টি হয় কীভাবে– বিষয়টি সম্পর্কে বুঝিয়ে বলবেন কি?

আইনুন নিশাত

আমাদের কাছাকাছি আগ্নেয়গিরি আছে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স– এসব এলাকায়। তবে ইন্দোনেশিয়াতে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত ঘটলে আমরা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি। এখন থেকে দেড়শ বছর পৌনে দু'শ বছর আগে ইন্দোনেশিয়াতে 'ক্রাকাতুয়া' বলে যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়, এবং সেখান থেকে যে সুনামির সৃষ্টি হয়েছিল, সেটার কারণে– এশিয়াটিক সোসাইটির রেকর্ড অনুসারে দেখা যায় যে– বরিশাল অঞ্চলে তখনকার দিনেও এক লক্ষের মতো লোক মারা গিয়েছিল। পঁচিশ-ত্রিশ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস আমাদের উপকূলে আঘাত হেনেছিল।

হালখাতা

২০০৪-এর সুনামি পুরো এশিয়াকে কাঁপিয়ে তুলেছিল এবং আতঙ্কগ্রস্ত করেছিল। আমরা জানি, এই সুনামিটি সৃষ্টি হয় ভূমিকম্প থেকে। নিকট অতীতের মধ্যে এটিই সর্ববৃহৎ সুনামি। ২০০৪-এর এই সুনামি সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে খানিকটা বিস্তারিত পরিসরে জানতে চাই।

আইনুন নিশাত

সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্প হলে তার প্রভাবে হঠাৎ করে পানির স্তর ফুলে উঠতে পারে এবং তা একটি বড় ঢেউয়ের আকৃতিতে উপকূলের দিকে চলে এসে জলোচ্ছাসের আকারে আঘাত হানতে পারে। ২০০৪-এর ডিসেম্বরে যে সুনামি ইন্দোনেশিয়ায় ঘটে, যার কারণে থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, ভারত, মালদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া এমনকি মরিশাস-এর উপকূলে উঁচু - উঁচু ঢেউ আছড়ে পড়ে– সেদিন আমরা খুব ভাগ্যবান ছিলাম। ঐ সুনামিটি আমাদের উপকূলে পৌঁছতে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সময় লেগেছিলো। তখন আমদের উপকূলে মরাকটাল চলছিল অর্থাৎ তখন ভাটার সবচেয়ে নিচু স্তরে পানি অবস্থান করছিল। ঐ সময় আমাদের উপকূলে পানির স্তর যেখানে থাকার কথা ছিল সেখান থেকে পানির উচ্চতা নয়-দশ ফুট বাড়িয়ে দিয়েছিল। তখন এখানকার পানি স্বাভাবিক স্তরের চেয়েও অনেক নিচে ছিল, বলেই সুনামির ঢেউ বড় ধরনের ক্ষয়-ক্ষতির পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। কিন্তু তখন যদি আমাদের উপকূলে ভরাকটাল চলতে

থাকত তাহলে বড় ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে যেত। আমার অফিসের এক সহকর্মী তখন টেকনাফে ছিলেন; তিনি আমাকে এসে বললেন, হঠাৎ করে বড় বড় ঢেউ এসে উপকূলে আছড়ে পড়ছিল এবং সেটা ভরাকটালের সময় যতটা উঁচু হয়ে ঢেউ আসে ততটা উঁচু হয়েই আসছিল। আমার কথা হল আমাদের উপকূল মরাকটালে ছিল তাতেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু উপকূল যদি ভরকাটালে থাকত তাহলে তো নিঃসন্দেহে নয়-দশ ফুটের একটি জলোচ্ছ্বাস আমাদের এখানেও হয়ে যেত। কাজেই আরেকটা সুনামি যে হবে না সেটা আমরা কী করে বলি?

হালখাতা

আমরা জানি আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্প সংক্রান্ত আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে; আপনার সেই অভিজ্ঞতার কিছুটা হালখাতা'র পাঠকদের জন্য বলবেন কি?

আইনুন নিশাত

আমি কয়েকটি আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি গেছি; এর একটি হল, ফিলিপাইনের লেগাসপি শহরের মিয়ন আগ্নেয়গিরি। ফিলিপিনসে একবার মাঠ-পর্যায়ে কাজ করছিলাম, সেখানে মাউন্ট ব্লুসান বলে একটি মৃতপ্রায় আগ্নেয়গিরি থেকে হঠাৎ করে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হল, (আমি যে অফিসে বসে কাজ করছিলাম সেটি টিনশেডের ছিল– ঐ এলাকায় তারা পাকা দালান করে না) সেই অগ্নুৎপাতের কারণে অন্তত পঞ্চাশ-ষাট বার ভূমিকম্প হল। আরেকটি আগ্নেয়গিরি দেখেছি, সেটা হল জাভা দ্বীপের থেরাপি। ওখানে আমি প্রথম ভূমিকম্প মাপক সিসমোগ্রাম দেখি। একবার জাপানের এক গবেষণাগারে আর্টিফিসিয়াল ভূমিকম্প দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। ভূমিকম্প হচ্ছে একটা হরিজেন্টাল ঝাঁকুনি, একটা ওয়েবের মধ্যদিয়ে হয়, যার আর্টিফিসিয়াল রূপ আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন ভূমিকম্প নিরোধ করার জন্য কিভাবে ঘর-বাড়ি তৈরি করা যায় সেই বিষয়ে গবেষণা চলছিল।

হালখাতা

বাংলাদেশ আক্রান্ত হয়েছিল এরকম দু-একটা ভূমিকম্পের কথা কি আমাদের বলবেন যেগুলো ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে? অর্থাৎ সেসব ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো নজির কি আছে যেগুলো সেসব ভূমিকম্পেরও সাক্ষ্য বহন করছে?

আইনুন নিশাত

এখন থেকে একশ বছরের কিছু আগে শ্রীমঙ্গলকে কেন্দ্র করে একটি বড় ভূমিকম্প হয়, ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে বড় ভূমিকম্প হয়; ১৮৩০-খ্রীস্টাব্দেও বড় ভূমিকম্প হয়েছিল। বুয়েটের এক সময়ে অবস্থান ছিল বর্তমানে ফজলুল হক হল যেখানে তার পেছনে। সেখানে একটা চিমনি ছিল, সেই চিমনিটা ভূমিকম্পে ভেঙে যায়। এরকম আরও

স্থাপনা আমাদের এই ঢাকা শহরেই ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির দাগ নিয়ে এখনো প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

হালখাতা

বাংলাদেশে ছোট-খাটো ভূমিকম্প তো সবসময়ই হচ্ছে; প্রশ্ন হল বাংলাদেশে কি কাছাকাছি সময়ের মধ্যে বড় ধরনের কোনো ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা আছে?

আইনুন নিশাত

বাংলাদেশে যে কোনো সময়ে একটা বড় ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে। ভৌগলিকভাবে আমাদের অবস্থান বিবেচনা করে ঝুঁকির বিচারে আমরা বেশ বিপদজনক অবস্থায় আছি। যে ঝুঁকি সমন্ধে আমাদের দেশে সমীক্ষণ চালানো হয়েছে। এই ঝুঁকি দেশের সব জায়গায় সমান নয়। তাই দেশকে তিনটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। তিনটি লাইন টেনে এই জোনগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। বগুড়ার কাছ থেকে একটা লাইন সিরাজগঞ্জের ওপর দিয়ে ময়মিনসিংহ হয়ে সিলেট জেলার নিচ দিয়ে পার্বত্যচট্টগ্রামের পূর্বাংশকে আলাদা করা হয়েছে। এটাই সবচেয়ে বেশিমাত্রার ভূমিকম্পের সম্মুখীন হবে। দেশের দক্ষিণাংশ মোটামুটি নিরাপদ ভবন নির্মাণের সময় প্রত্যেকটি জোনের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে তা বাংলাদেশের বিল্ডিং কোড নামক নির্দেশাবলীতে পরিষ্কার করে বলা আছে।

হালখাতা

এরকম জোনগুলোতে বিল্ডিং করার ক্ষেত্রে তো মারাত্মক ঝুঁকি রয়েছে অথচ ক্রমাগতভাবে বিল্ডিং কিন্তু উঠেই যাচ্ছে; কথা হল এই ঝুঁকি হ্রাস করার ক্ষেত্রে আমাদের সরকার তো তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না; যদি বিল্ডিং কোডের কথা বলি, সেটাও তো গৃহীত হয়েছে সম্প্রতি। তো এবিষয়ে আপনার মত কী?

আইনুন নিশাত

এরকম ঝুঁকিপূর্ণ জোনগুলোয় বিল্ডিং করার ক্ষেত্রে সরকারি বিল্ডিং কোডে যে বিধিবিধান রয়েছে, সেগুলো মেনে করা হলে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি কমিয়ে আনা যেতে পারে। আপনি যে বললেন সরকার তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি এটা ঠিক নয়। বিল্ডিং কোড সরকার গ্রহণ করেছে সম্প্রতি, কিন্তু কোড বানানো হয়েছিল নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে। বিল্ডিং কোড ফলো করে কেউ যদি বাড়ি-ঘর তৈরি করে তাহলে তাদের বাড়িগুলো স্বাভাবিকভাবেই নিরাপদ হবে।

হালখাতা

নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে কোড বানানো সত্ত্বেও সেটা গৃহীত হতে এত সময় লাগল কেন? দুর্নীতির এই উর্বর ভূমিতে ঐ কোড যে মেনে চলা হবে তারই বা বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হবে কীভাবে?

আইনুন নিশাত

আমলাতান্ত্রিক কারণে ওটা যথাসময়ে চালু হয়নি। কিন্তু এখন তো কোডটা মেনে চলা বাধ্যতামূলক। কিন্তু বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হবে কীভাবে– এর জবাব বোধ করি একদিনেই দিয়ে দেয়া যাবে না, এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তবে সমস্যা হল আমাদের এখানে কাগজে-কলমে অনেক কিছুই থাকে কিন্তু বাস্তবে সেটা অনুসরণ করা হয় না। একটা বাড়ি ডিজাইন অনুসারে যদি না হয় কিংবা কাগজ-কলমে দেখানো হল যে অনুসরণ করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে অনুসরণ করা হল না– সেই ক্ষেত্রে বিল্ডিং তো নিরাপদ হবে না। বিল্ডিং কোড তথা প্লান পাস করানোর জন্য যে ড্রয়িং করা হয়েছে সেটা মেনে কাজ হচ্ছে কি না– তাও খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। এই কাজগুলো প্রধানত সরকারকেই করতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল সরকারের মধ্যকার সব ব্যক্তিই তো সমান দায়িত্বশীল নন। এখানে ব্যক্তির নীতি- নৈতিকতার বিষয়টিও গভীরভাবে জড়িত। ধরা যাক, মতিঝিলে যে উঁচু বিল্ডিংগুলো রয়েছে এগুলোর মধ্যে বিশতলার উপরে যে বিল্ডিংগুলো রয়েছে আমি ধরেই নিচ্ছি যে সেগুলোর ডিজাইন বিল্ডিং-কোড মেনে নিয়েই করা হয়েছে। কিন্তু এগুলোর ফাউন্ডেশনটা সঠিকভাবে দেয়া হয়েছে কিনা, বিমের ইনফোর্সমেন্ট সঠিক করা হয়েছে কিনা, কী করে বুঝব!

হালখাতা

আমাদের রাজনীতিকে কোনোভাবে কি আপনি এজন্য দায়ী করেন? অর্থাৎ আপনার কি মনে হয়, আরও বেটার রাজনীতি থাকলে অন্যান্য সেক্টরের মতো এই সেক্টরেও আরও কাজ হতে পারত? এই যে অনেক কিছুই হতে পারত কিন্তু সেভাবে হয়নি– এজন্য আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে পশ্চাৎপদতা– এটাকে আপনি কোনোভাবে দায়ী করেন কি-না?

আইনুন নিশাত

আমাদের রাজনীতিবিদরা এখনো পর্যন্ত একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে পরিচালিত করতে পারেননি। পরাধীন আমলের চিন্তাভাবনা, ব্যবস্থাপনা এখনো বহুলাংশে বজায় আছে। এখনো চেষ্টা করা হয় ব্রিটিশ পিরিয়ডের আইন-কানুন, নিয়ম-কানুনকেই চালু রাখতে। যেমন, একটা দুর্যোগ ঘটলে যে প্রেসরিলিজ দেয়া হয়, দেখা যাবে সেই ব্রিটিশ আমলের কোনো প্রেসরিলিজেরই শুধু তারিখ আর ঘটনার নাম বদলিয়ে দিয়ে দেয়া হচ্ছে, বাকি সব ধরন-ধারণ একই রকমের আছে। একটি স্বাধীন দেশে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এসবের সংস্থানের যে প্রক্রিয়া তার সাথে দারিদ্র্য বিমোচনের

অন্তর্নিহিত আরও যে কারণগুলো আছে সেই অন্তর্নিহিত বিষয়ের প্রতিও নজর দেয়া উচিত; যেমন কোনো দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অনেকে হয়তো ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে কিন্তু অনেকেই থাকে যারা অতি দরিদ্র হওয়ার কারণেই ক্ষয়ক্ষতি কোনোভাবেই কাটিয়ে উঠতে পারে না; এই অতি দরিদ্রদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া দরকার। ১৯৯১-৯২-তে ফ্লাড-এ্যাকশন প্ল্যান-এর ১১ নম্বর কম্পোনেন্টের অধীনে প্রাক্-দুর্যোগ এবং দুর্যোগ-পরবর্তী যে প্রস্তুতি তার ওপরও জোর দিয়েছি। এজন্য কিন্তু সরকারের স্ট্যান্ডিং অর্ডারও আছে। কিন্তু সমস্যাটা হল এগুলো কাগজ-কলমেই আছে। এর বাস্তব জায়গাগুলো যদিও ভিন্নরকম। যেমন ধরুন ভূমিকম্পের সঙ্গে আগুন লাগার সম্ভাবনা আছে, তাহলে আগুন নেভানোর যে প্রস্তুতি যেমন অনেক যন্ত্রপাতি আমাদের থাকা দরকার সেটা আমাদের নেই।

হালখাতা

ধরুন এখন যদি বাংলাদেশে বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়, তাহলে আমাদের প্রকৃতিতে কী ধরনের বৃহৎ পরিবর্তন ঘটতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

আইনুন নিশাত

যদি একটি বড় মাত্রার ভূমিকম্প হয় তাহলে যমুনা নদী তার বর্তমান ধারা পরিবর্তন করে নতুন ধারায় প্রবাহিত হতে পারে। অন্য কোনো নদীও বর্তমান ধারা টপকে আরেকধারায় চলে যেতে পারে। যেমনটি ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে আসামের ভূমিকম্পের পরে ঘটেছিলোও। ঐ ঘটনায় পুরনো ব্রহ্মপুত্রের যে ধারা জামালপুর–ময়মনসিংহের পাশ দিয়ে ভৈরবে মেঘনার সাথে, সেখান থেকে যমুনা নদী লাফ দিয়ে ঝিনাই এবং সেই ঝিনাই থেকে এসে বর্তমান ধারায় এসেছেন। সে-কারণে যমুনা কিন্তু অতি সাম্প্রতিককালের নদী। ১৮০০ থেকে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এটার দৈর্ঘ্য, প্রশস্ত এবং গভীরতা ওঠানামা করে। এবং ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে আসামে যে ভূমিকম্প হয় তার ফলেই এর প্রশস্ততা এবং গভীরতা বেশি মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। এই নদী দিয়ে তখন প্রচুর পলি চলে আসে। আসামের নদীর তলদেশ অনেক উপরে উঠে যায় এবং যার প্রভাব এখনও পড়ছে।

হালখাতা

বড় ধরনের ভূমিকম্প হওয়ার এমন কি কোনো হিসাব আছে যে, একটা নির্দিষ্ট সময় গ্যাপ দিয়েই কেবল হয়? নাকি ছোট-খাটো ভূমিকম্পের মতো বড়গুলোও যে-কোনো সময়ই হতে পারে?

আইনুন নিশাত

মূল কথা হচ্ছে, প্রাকৃতিকভাবে যেসব ঘটনা ঘটে তার একটা সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেব যদি আমরা করি, তাহলে দেখব যে প্রকৃতিতে ৫০ বছর বা ২০০ বছরে এরকম বড় ঘটনা

দুই-একবার অবশ্যই ঘটে। আরও দেখা গেছে যে, প্রাকৃতিক ঘটনা যেটি যত বড় আকারে হয় সেটি তত বেশি সময় গ্যাপ দিয়ে হয় অর্থাৎ সেক্ষেত্রে এক ঘটনা থেকে পরবর্তী ঘটনার মধ্যকার কাল বা সময়টা দীর্ঘ হয়। তবে তার অর্থ এই নয় যে, এ বছর হয়েছে বলে সামনের বছর ভূমিকম্প হবে না। সেক্ষেত্রে একটা ভূমিকম্পের কতদিন পরে এর পরের ঘটনা ঘটবে তার কোনো গাণিতিক হিসেব নেই।

হালখাতা

আপনার মতে আমাদের দেশের কোন ধরনের স্থাপনাগুলো ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে অধিক ঝুঁকির মধ্যে আছে?

আইনুন নিশাত

মূলত ফ্রেম-স্ট্রাকচার যেগুলো আছে সেগুলো ঝাঁকিটা খেলে তা সহ্য করতে পারে; সেগুলি মোটামুটি নিরাপদ। ঢাকার বাণিজ্যিক ভবনগুলি অর্থাৎ উঁচু দালানগুলো যদি সঠিক ডিজাইন মাফিক নির্মিত হয়ে থাকে তাহলে সেগুলোকে নিরাপদ ভাবা যেতে পারে। কিন্তু সঠিকভাবে সেগুলো আছে কি-না সেটা তো আমরা বলতে পারছি না। পুরনো চুন-সুরকির বাড়ি ইতোমধ্যেই দুর্বল অবস্থাতে আছে, কথা হল ভূমিকম্প হলে ঝাঁকিটা তো শুধু বিল্ডিং-এ হবে না; ওর ফাউন্ডেশনের ওপরও হবে। আমাদের এখানে এমন অনেক বাড়ি আছে, এই বাড়িগুলো যেখানে তৈরি হয়েছে সেখানে হয়তো কখনো ডোবা ছিল; সেই ডোবার মধ্যে ময়লা এবং বালি ফেলে ভরাট করে তার ওপর এই সব বাড়ি করা হয়েছে। ভূমিকম্পে এ সকল বাড়ির কী হবে? এগুলো তো অতি সহজেই সামান্য ঝাঁকুনিতেই বালু সরে গেলে কাত হয়ে পড়বে। ভারতের মহারাষ্ট্রের ভুজ নগরীতে ভূমিকম্প হয়েছিল, সেখানে আমরা দেখেছি যে, একটি বিল্ডিংও আস্ত ছিল না। সেখানকার মাটির তৈরি ঘর সমস্ত গুঁড়ো হয়ে পড়ে গেছে। কাজেই আমি বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলে জেনেছি যে পুরনো বাড়িগুলোকে কিন্তু আর্থকোয়েক প্রুফড করা যায়, শক্তিশালী করা যায়। আমাদের বিশেষজ্ঞরা নতুন বাড়ি নিয়ে মাথা ঘামান কিন্তু আমি বহুবার আবেদন জানিয়েছি যে পুরনো বাড়ির ব্যাপারেও আপনারা কিছু কথাবার্তা বলেন। তারা তখন দেখি খুব একটা ভরসা দিতে চান না, পুরনো বাড়ি নিয়ে খুব একটা কথা বলতে চান না। অথচ এখনো সময় আছে পুরনো বাড়িগুলোকে কিছুটা শক্তিশালী করার।

হালখাতা

নতুন বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে বিল্ডিং-কোড একটি বড় বিষয়; তো বলবেন কি, ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডে ভূমিকম্পের বিষয়টা চূড়ান্ত করা হয়েছিল কিভাবে?

আইনুন নিশাত

এই বিল্ডিং কোড বানাতে গিয়ে গবেষকেরা বিভিন্ন এলাকার ভূমিকম্পের আশঙ্কার বিষয়গুলো খতিয়ে দেখেছেন। ভূমিকম্প বিষয়টি নিয়ে হয়তো অনেকদিন ধরেই কথাবার্তা হচ্ছিল; উল্লেখ্য, আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার সার কারখানা যখন হয় তখন একে আর্থকোয়েক-প্রুভড করার বিষয়টি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের গবেষণা হয়। আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি মেঘনার চরে প্রতিষ্ঠিত, সেখানের চরে বালু ফেলে ফ্যাক্টরিটা বসানো হয়– সেক্ষেত্রে ঠিকাদার প্রশ্ন তুললেন, আর্থকোয়েকের ব্যাপারে কী হবে? এর ফলে সেটা নিয়ে উচ্চপর্যায়ে প্রচুর গবেষণা শুরু হয়। এর পরবর্তী সময়ে বুয়েটের আরও অনেকে ভূমিকম্পের নানা দিক ও বিষয়ের ওপর কাজকর্ম করেছেন, গবেষণা করেছেন, লেখালেখি করেছেন, পিএইচডি করেছেন। এবং তার ভিত্তিতে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডে ভূমিকম্পের বিষয়টা চূড়ান্ত করা হয়েছিল। চলমান সময়ে ঢাকা শহরের উঁচু দালানগুলো তৈরির ব্যাপারে এই কোড ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সম্প্রতি যমুনা ব্রিজ নির্মাণের সময়ে ভূমিকম্পের বিষয়টি আরও সিরিয়াসলি স্টাডি করা হয়।

হালখাতা

এই যে বল্লেন যমুনা ব্রিজ নির্মাণের সময়ে ভূমিকম্পের বিষয়টি আরও সিরিয়াসলি স্টাডি করা হয়; আপনি তো যমুনা ব্রিজ নির্মাণের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন, যমুনা ব্রিজ নির্মাণের ক্ষেত্রে ভূমিকম্পের বিষয়টি কীভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছিল?

আইনুন নিশাত

তখন বিশ্বে শ্রেষ্ঠ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করা হয়। কনসালটেন্টরা এক্ষেত্রে যাদের কনসাল্ট করেছেন আবার সরকারও তাদের কনসাল্ট করেছেন। কেন কনসাল্ট করেছেন তার একটা মজার কাহিনী আছে; এই ব্রিজটার যখন পিয়ার নির্মাণ ফাউন্ডেশন চলছে, পিয়ারগুলো তৈরি করা হচ্ছে, স্টিলের যে পিয়ারগুলো যার সাইজ বাইরে থেকে বোঝা যায় না যার ডায়ামিটার হচ্ছে ৩.২ মিটার অর্থাৎ প্রায় ১০ ফুটের মতো। এবং এই ডায়ামিটারগুলো স্টিলের তৈরি, মাঝখানটা ফাঁকা; যে ফাঁকা জায়গাগুলো বালু দিয়ে ভরে দেয়া হবে। তখন এই কাজগুলো হচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে জাপানের কোবে নগরীতে যে একটা ভূমিকম্প হয়েছিল সেটার মাত্রা রিখটার স্কেলে ৮.২ বা ৮.৩ এর মতো হবে। সে-কারণে তখন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, যমুনা ব্রিজের ভূমিকম্প সহিষ্ণুতা ৮.২-তে নিতে হবে। প্রশ্ন দেখা দিল যে, ৮.২-তে নিতে হলে কী করতে হবে; দেখা গেল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ইউরোপ, জাপান–এসব দেশের বিল্ডিং কোডে এই মাত্রার ভূমিকম্পের জন্য গৃহীতব্য পদক্ষেপ উল্লেখ নেই। মানে এই ৮.২ মাত্রার যে ভূমিকম্প হতে পারে সেটা উন্নত দেশের ন্যাশনাল কোডেও অন্তর্ভুক্ত নেই। ভূমিকম্প নিয়ে ঐসব দেশের বিশেষজ্ঞরা কাজ করেছেন কিন্তু কোড তৈরি করেননি। শেষে দেখা গেল শুধু একটা দেশে কোডে আছে, সেই দেশটি হচ্ছে নিউজিল্যান্ড। তখন আমরা বললাম ঠিক আছে নিউজিল্যান্ডের বিল্ডিং কোডই আমরা

মানব। তখন নিউজিল্যান্ডের কোড মানতে গিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে যমুনা ব্রিজের যে পিয়ারগুলো আছে সেই পিয়ারের ফাঁকা জায়গাগুলোতে কংক্রিট ঢুকিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ কম্পোজিট স্ট্রাকচার করতে হবে। আমি আপনাদের জানাতে চাই যে, যমুনা ব্রিজের ডিজাইন কিন্তু পরিবর্তন করে নির্মিত হয়েছে।

হালখাতা

যে বাড়িগুলো নতুন নির্মাণ করা হবে, সেগুলো নির্মাণকালে ভূমিকম্প সহনীয় হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলোকে আপনার মতে অধিক গুরুত্ব দেয়া দরকার?

আইনুন নিশাত

আগে মাটির নিচ থেকে ইট গেঁথে যে ফাউন্ডেশনটা করা হয়, তার ওপর একটা কংক্রিটের ঢালাই দেয়া হত– তার ওপরে জানালা লেভেলে একটা টানা লিনটেল দেয়া হত। ছাদে বিমের মাধ্যমে লোডটাকে ডিস্ট্রিবিউট করা হত। এখন দেখবেন অল্প কিছু পয়সা বাঁচানোর জন্যে প্রতিটি জানালার ওপরে লিনটেল দেয়া আছে; ওটা টানা করা নেই; ফউন্ডেশনে দরজার ওখানে নিচে কিছু জায়গাতে দেয়া আছে, কিন্তু টানা নেই; অথচ এই টানা রিঙগুলো যদি থাকত, কলামের ব্যবহার করা হত, তাহলে নিশ্চয়ই এগুলো শক্তিশালী হত।

যে-স্থাপনাগুলো আগেই নির্মিত হয়ে গেছে, আর যে-গুলো নির্মিত হবে– এই দুই ধরনের স্থাপনার ক্ষেত্রেই আমাদের করণীয় কী– সেটা আমাদের স্থির করতে হবে। আমার মতে, যে বিল্ডিংগুলো ভবিষ্যতে নির্মিত হবে সেগুলো শক্তিশালী হওয়ার কথা, যেগুলো সাম্প্রতিক নির্মিত হয়েছে সেগুলোও শক্তিশালী হওয়ার কথা এবং যেগুলো অতীতে নির্মিত হয়েছে সেই পুরনো বিল্ডিংগুলো কীভাবে শক্তিশালী করা যায় সে-ব্যাপারে জোরালোভাবে আলোচনা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এবং বিশেষ করে যে সমস্ত জায়গার বাড়িগুলো অতি পুরনো, যেমন– শাঁখারি বাজার, সদরঘাট, পাটুয়াটুলি– এসব জায়গার বাড়িগুলো নিয়ে অতি দ্রুত পর্যালোচনা করা উচিত।

হালখাতা

আপনার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বলবেন কি, ভূমিকম্প বা অন্য কোনো দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও ব্যক্তির সমন্বয়ে কীভাবে দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনার কাজটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হতে পারে ?

আইনুন নিশাত

পৃথিবীতে কম দেশই আছে যেখানে দুর্যোগ সংক্রান্ত আলাদা মন্ত্রণালয় আছে। বাংলাদেশেও'খাদ্য ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়' নামে আলাদা মন্ত্রাণালয়ই আছে। তবে বাংলাদেশ সরকারের স্বাভাবিক কাজ দুর্যোগ চলাকালীন এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে কী কাজ করতে হবে সেটাকে ঘিরে। এই মন্ত্রণালয়টি তৈরি হয়েছিল ফ্লাড একশন

প্ল্যানের এগারো নম্বর কম্পোনেন্টের মাধ্যমে। আমরা তখন বলেছিলাম, যে-কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রাক্ বা পূর্বপ্রস্তুতি থাকা উচিত। সাইক্লোনের ওয়ার্নিং, ফ্ল্যাডের ওয়ার্নিং পৌঁছে দেয়া এবং ওয়ার্নিং এর পরে উদ্ধার ও ত্রাণ-কার্য পরিচালনা করা ইত্যাদি– এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের একটি স্ট্যান্ডিং অর্ডার আছে; অর্থাৎ কোনো দুর্যোগ ঘটলে কে কী কাজ করবে– দুর্যোগের আগে, দুর্যোগের সময় এবং দুর্যোগের পরে কার কী কাজ সেই সংক্রান্ত এই অর্ডারটি। এখন বন্যা বা টর্নেডোর ক্ষেত্রে হয়তো দুর্যোগের আগে কাজ করার বা ওয়ার্নিং দেয়ার বিষয় থাকে কিন্তু বন্যা-টর্নেডোর মতো ভূমিকম্প তো বলে-কয়ে আসে না, কাউকে কিছু জানান দিয়ে আসে না, সুতরাং ভূমিকম্পের ওয়ার্নিং বা পূর্বাভাস কোনোভাবেই দেয়া সম্ভব নয়। তবে ভূমিকম্প চলাকালীন সময়ে এবং ভূমিকম্পের পরে অবশ্যই কাজ করার আছে। এবং সেক্ষেত্রে কে-কী কাজ করবে– জেলা প্রশাসক, থানা প্রশাসক, ইউনিয়ন প্রশাসক, সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান– এদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সেই অর্ডারে লিপিবদ্ধ করা আছে। ভূমিকম্পের পরপরই উদ্ধারকাজটা হল প্রথম কাজ। ঘরের দেয়াল বা অন্য কিছুতে চাপা-পড়া মানুষ উদ্ধার করা, আবার বিশেষ করে খাবার পানিটা দূষিত হয়ে যায় তখন বিশুদ্ধ পানির সাপ্লাইটা করা আরেকটি বিষয় হল সেনিটেশনের সমস্যা এবং সেনিটেশনের কারণে দেখা যায় প্রত্যেকটা দুর্যোগের পরে রোগ-বালাই মহামারী আকারে দেখা দেয়।

আমাদের যদি জানা থাকে যে, ঐ এলাকার কোনো বিল্ডিংটি শক্ত, তাহলে ঐ বিল্ডিংটি-কে কেন্দ্র করে ত্রাণকার্য চালানো যেতে পারে। আমার একটি ব্যাপার সবসময়ই মনে হয়, সেটা হল, যে-কোনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অবশ্যই স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার বা মহিলা মেম্বার যারা আছেন, তারা ভালোভাবে জানেন ঐ এলাকাতে কারা-কীভাবে আছেন, ফলে দুর্গতদের তদারকি করা, তাঁবু খাটানো, তাৎক্ষণিকভাবে খাওয়ানো, দেখাশুনা-চিকিৎসা করানো এসব কাজ কিন্তু ঐ এলাকার লোকদের দিয়ে হলে ভালো হয়।

হালখাতা

ভূমিকম্প বা অন্য কোনো দুর্যোগ-পরবর্তী উদ্ধারকার্য এবং ত্রাণকার্য সরকার এককভাবে করলে কি ভালো হয়? নাকি সেখানে অন্যদের অংশগ্রহণও থাকতে পারে?

আইনুন নিশাত

প্রশ্ন হল, কাজটি সরকার করবে নাকি অন্যরা করবে? আমার মনে হয় ত্রাণকার্য পুরোপুরি অন্যদের হাতে কিংবা এনজিওদের হাতে ছেড়ে দেয়া ঠিক না, বরং সরকারি রিসোর্স বৃদ্ধি করে সুষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে সরকারকেই এই পুরো ত্রাণকার্যটা পরিচালনা করা উচিত। দেশি-বিদেশি এনজিওরা অবশ্যই সেখানে কাজ করতে পারে। তবে মূল পরিচালনা ও সমন্বয়টা সরকারের হাতেই থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের দেশের এনজিওরা বিদেশি ফান্ডের ওপর নির্ভরশীল– এখন

বিদেশি এনজিও যারা, যেমন অক্সফাম– এদের দুর্যোগ মোকাবেলার প্রয়োজনীয় রসদ হয়তো সংগ্রহে আছে কিন্তু আমাদের দেশীয় এনজিওগুলোর তো সেই রসদ মজুদ নেই। ফলে তাদের চাইতে হবে, আবেদন জানাতে হবে বিদেশের কাছে– বিদেশ থেকে সেই রসদ আসতে আসতে কী অবস্থা দাঁড়াবে সেটা বুঝতেই পারছেন। দুঃখজনক হলেও আমি সরেজমিনে যেটা দেখেছি যে, একটা দুর্যোগ হয়ে যাওয়ার পরে ত্রাণকার্যটা পরিচালিত হয় যোগাযোগের সুবিধা অনুসারে। যেখানে যোগাযোগ ভালো সেখানে সরকার ও এনজিও উভয়ই ত্রাণকার্য চালায় কিন্তু যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো নয় সেখানে কেউই ত্রাণ নিয়ে যেতে চান না। আমার কথা হল মূল কাজটা সরকারই করবেন, এরপর অন্য কেউ যদি ত্রাণ দিতে আসে তাকে এলাকা ভাগ করে এমন জায়গায় পাঠাতে হবে যেখানকার লোকেরা ত্রাণ পায়নি। তাহলে ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে একটা সুন্দর সমন্বয় আসবে। আবার একটি নির্দিষ্ট এলাকার ভেতরকার সব লোকজন ত্রাণ পান না। এবার সিডরের পরে আমি লক্ষ করেছি যে, যেখানে ট্রাক, বাস বা লঞ্চ, ট্রলার যায় সেখানেই সবাই ত্রাণ দিয়ে ছবিটবি তুলে চলে আসে কিন্তু যেখানে ট্রাক-বাস বা লঞ্চ-ট্রলার যায় না হয়তো এক বা দুই কিলোমিটার পায়ে হেঁটে কাদার মধ্যদিয়ে যেতে হবে সেখানে কেউ ত্রাণ নিয়ে যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে আমাদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। আরেকটা বিষয় হল যারা দুর্যোগে আক্রান্ত হন, তারা ট্রমায় আক্রান্ত হন, ট্রমার বাংলা আমি জানি না; অর্থাৎ তারা ভেঙে পড়েন, বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন, কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েন, স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলেন, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন– যারা ত্রাণকাজে যাবেন তাদেরও ঐ ট্রমার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বহু ডেডবডি, আহত মানুষজন এবং মানুষের আহাজারি দেখে তারাও যেন ঠিক থাকতে পারেন। ১৯৬৮-তে যে টর্নেডো হয়েছিল, তখন আমরা ছাত্র, দল বেঁধে সেই আক্রান্ত অঞ্চলে গিয়েছিলাম। জীবনে সেদিন আমি প্রথম দুর্যোগাক্রান্ত মানুষের যে আর্তনাদ সেটা প্রত্যক্ষ করি সেটা এখনও মনে আছে। সেই ধরনের দৃশ্য দেখে অনেকেই আছেন যে, অনেক সময় ঠিক থাকতে পারেন না, অনেকের ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায়, কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে ইত্যাদি। কাজেই যারা ত্রাণকার্য চালাবেন তাদের মানসিক প্রস্তুতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হালখাতা

বাংলাদেশে ভূমিকম্প নিয়ে যে গবেষণা হচ্ছে, আপনার কি মনে হয় সেটা যথেষ্ট? এবং কেউ যদি এবিষয়ে গবেষণা করতে চান, তাহলে তথ্য প্রাপ্যতার দিকটিও কি আপনি মনে করেন যে, যথেষ্ট?

আইনুন নিশাত

বাংলাদেশ দুর্যোগ গবেষণার সূতিকাগার। ভূমিকম্প বিষয়ক গবেষণার দিক থেকে আমি বলব বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে যে সকল গবেষকদের গবেষণা অছে সেটা বাংলাদেশের মতো একটি দেশের জন্য বেশ উঁচুমানের। আমি বলছি না যে, গবেষণা আর দরকার

নেই। আমি বলছি যে, বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে যে তথ্য-জ্ঞান থাকা উচিত সেটা আমাদের আছে। আমি এই কথাটি এই জন্য বলছি যে,আমি যখন যমুনা ব্রিজ নির্মাণের সঙ্গে জড়িত ছিলাম, তখন দেখেছি যে, যারা কন্ট্রাক্টর ছিলেন তারা বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন, যারা উপদেষ্টা ছিলেন তারাও বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন আবার তাদের সঙ্গে গবেষণার কার্যের পক্ষ থেকে আমরাও যোগাযোগ করেছি– যমুনা ব্রিজের নির্মাণ-গবেষণার সময় আমাদের কয়েকজনের নাম এভাবে বলে দেয়া হয়েছিল যে, 'এরা যদি দেখে দিয়ে থাকে তাহলে আমাদের আর বলার কিছু নেই।' তার মধ্যে বাংলাদেশের প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী একজন। তবে ভূ-তত্ত্বের যারা ছাত্র তারা ভূমিকম্প নিয়ে পড়াশুনা করেন, গবেষণা করেন কিন্তু অবকাঠামো নির্মাণে এটা কীভাবে বিবেচনায় আনতে হবে, বিশেষ করে উঁচু অবকাঠামো নির্মাণে কিংবা যে অবকাঠামো ভেঙে গেলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে এসব বিষয় নিয়ে ভাবেন না। ধরেন যদি কাপ্তাই ড্যাম আজ ভেঙে যায়, তাহলে কিন্তু পুরো চিটাগাং শহর ভেসে যাবে সমুদ্রে। এতটাই পানির স্রোত হবে সেখানে। কাজেই সব গবেষণা সব কাজে আবার খাটানো যাবে না, এটাও বুঝতে হবে। দেখা যাবে যে, ভূমিকম্প পরবর্তী দুর্যোগ সমন্ধে আমাদের গবেষণা আবার অনেকটা প্রাথমিক পর্যায়েই আছে।

হালখাতা

বন্যা বা সাইক্লোনের পূর্বাভাস জানা সম্ভব কিন্তু ভূমিকম্পের তো পূর্বাভাস জানা সম্ভব নয়। যেটা আপনিও একটু আগে উল্লেখ করেছেন। আপনার মতে কোনো উপায় বা পথ উন্মুক্ত হওয়া সম্ভব কি-না, যে উপায় অবলম্বন করে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস জানা সম্ভব হতে পারে?

আইনুন নিশাত

বন্যা ও সাইক্লোনের মতো ভূমিকম্পের আগাম সতর্ক বার্তা বা পূর্বাভাস এখনও বিজ্ঞান সম্মতভাবে দেয়া সম্ভব হয়নি। তবে চীনে একধরনের গবেষণা চলছে তার মাধ্যমে কিছু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যেহেতু আমি ইদানিং প্রকৃতি নিয়ে বেশি কাজ করছি সেহেতু এ বিষয়ে আমার বেশ আগ্রহ জন্মেছে; চীনারা এখন যে পদ্ধতি ব্যবহার করছে সেটা হল মাটির নিচে যেসব প্রাণী থাকে যেমন– কেঁচো, সাপ, ব্যাঙ, পিপঁড়া, উইপোকা ইত্যাদি– এরা যে-কোনোভাবেই হোক ভূমিকম্প হলে আগাম টের পেয়ে যায়। এরা একদিন, দুইদিন বা তিনদিন আগে থেকেই মাটির নিচ থেকে উপরে উঠে আসার জন্যে ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। তারা নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে চেষ্টা করে। যেমন আমাদের দেশে যখন বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ মাসে কালবৈশাখী ঝড় আসে, এমনকি আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে যা হয়, হয়তো দিনভর বৃষ্টি হচ্ছে, তখন দেখবেন যে পিঁপড়াগুলো মুখে ডিম নিয়ে কোথায় যেন রওনা দিচ্ছে। তার মানে হল দুইদিন তিনদিন পরে তার আবাসস্থলটা পানিতে ডুবে যেতে পারে সেই আসঙ্কায় সে অন্য

নিরাপদ জায়গায় চলে যাচ্ছে। দুর্যোগ আসতে পারে এই খবরটা তো আপনি-আমি পাই না। কিন্তু ভূমিকম্পের সাথে প্রকৃতির জীব-বৈচিত্র্যের একটা সম্পর্ক আছে। কিছু প্রাণী আছে যারা আগাম বার্তাটি পেয়ে যায়। হয়তো ভূ-পৃষ্ঠে অনেক প্রাণী আছে তারাও আগাম অনেক কিছু বুঝতে পারে। সেদিক থেকে বলা যায়, ভূমিকম্পেরও আগাম বার্তা পাওয়া সম্ভব। আমার ধারণা এবার সিডরের সময় সুন্দরবন এলাকার অনেক প্রাণী পশ্চিম দিকে সরে গেছে। আমি মনে করি, বাংলাদেশে, প্রথমে মিরপুরের চিড়িয়াখানায় জীবজন্তুদের মাঝে এরকম পরীক্ষামূলকভাবে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

হালখাতা

বাংলাদেশের বিল্ডিং কোডে বিল্ডিংকে ভূমিকম্প-সহনীয় করার ক্ষেত্রে রিখটার স্কেলে কত মাত্রা পর্যন্ত উল্লেখ আছে।

আইনুন নিশাত

বাংলাদেশের বিল্ডিং কোডে ৭.৮ পর্যন্ত ধরা আছে। ফলে যমুনা ব্রিজের ক্ষেত্রে আমাদের নিউজিল্যান্ডের কোড ফলো করতে হয়েছিল।

হালখাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগের নিবেদিত একজন গবেষক, উনি কথা প্রসঙ্গে একদিন বললেন, প্রতি মাসে সামান্য কিছু টাকা অর্থাৎ হাজার বিশেক টাকা কোথাও থেকে না-পাওয়ার কারণে তিনি ভূমিকম্পের একটা যন্ত্র বসাতে পারছেন না। সেটা বসাতে পারলে হয়তো আরও দ্রুত ও ব্যাপকভাবে ভূমিকম্পের তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হত। প্রশ্ন হল, এই যে যেখানে টাকা দরকার সেখানে টাকা পাওয়া যাচ্ছে না আবার অনেক ক্ষেত্রেই আছে যেখানে টাকার বেশ ছড়াছড়ি কিন্তু কাজের কাজ হয়তো কিছুই হচ্ছে না। বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখবেন?

আইনুন নিশাত

বিশহাজার টাকা দামের কোনো যন্ত্রের কথা বলছেন তা বুঝতে পারছি না। আমাদের বিজ্ঞান মন্ত্রণায়ে প্রতি বৎসর ১৮ কোটি টাকা দেয়া হয় গবেষণার জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে বিশ হাজার টাকা নেই– এটা ভাবতে পারছি না। নিশ্চয়ই আপনাদের বুঝতে ভুল হয়েছে।

হালখাতা

প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও হালখাতা-কে সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আইনুন নিশাত

আমরা অধিকাংশরাই এ ধরনের বিষয়ে ইংরেজিতে লিখি, বাংলায় এ বিষয়ে প্রকাশনা প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই একটি ভালো উদ্যোগ। সাধারণ মানুষের ভূমিকম্প বিষয়ে জানা ও এ-বিষয়ে তাদের আগ্রহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে হালখাতা'র এ-সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। আপামর জনসাধারণের জীবন ও অস্তিত্ব বিপন্নকারী ভূমিকম্পের মতো জনগুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের ওপর বিশেষ সংখ্যা করার জন্য হালখাতা-কেও ধন্যবাদ।

প্র ব ন্ধ

ভূমিকম্প ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মো. আ বু সা দে ক

ভূমিকম্প একটি আপদ। আপদকে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে– এমন কোনো সম্ভাব্য বিষয় যাহা কোনো জনগোষ্ঠির জন্য সমূহ বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিবেচনায় ঝুঁকি বলতে আমরা বুঝি–আপদ ও বিপদাপন্নতার সহ-অবস্থান। অর্থাৎ দুর্বল কোনো স্থাপনা, জনগোষ্ঠি অথবা প্রতিবেশ যখন আপদাক্রান্ত হয় তখন সেই প্রতিবেশকে ঝুঁকিপূর্ণ বলা যায়। কোনো জনগোষ্ঠি যদি সম্ভাব্য ভূমিকম্প আপদপ্রবণ থাকে এবং সেই জনগোষ্ঠি যদি নিজেদেরকে সম্ভাব্য বিপদ থেকে রক্ষা করার মতো প্রস্তুত না থাকে তাহলে সেই জনগোষ্ঠি ভূমিকম্প আপদজনিত ঝুঁকিতে আছে বলে ধরা হয়।

পৃথিবীর দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টিকারী প্রায় সবগুলো আপদই এখানে বিদ্যমান। যেখানে ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গন, খরা, পাহাড় ধ্বস ইত্যাদি। ভৌগলিক অবস্থানই হল কোনো একটি অঞ্চল বা দেশের দুর্যোগ প্রবণতার প্রধান নিয়ামক বা কারণ। অধিকাংশ প্রাকৃতিক আপদেরই পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হলেও কিছু কিছু আপদের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগের পূর্বাভাস দেয়া

এখনো সম্ভব হচ্ছে না। আগাম পূর্বাভাসকে আমরা ২টি অংশে ভাগ করতে পারি– দুর্যোগাক্রান্তের স্থান ও সময়। এক কথায় 'ভূমিকম্পজনিত দুর্যোগের আগাম সতর্ক পাওয়া যায় না' বলার পক্ষে আমি নই। পৃথিবীর উপরিভাগের শক্ত শিলাস্তর খণ্ড খণ্ড পাটাতনে (Plate) বিভক্ত এবং এই পাটাতনগুলো প্রতিনিয়ত প্রবাহিত উত্তপ্ত লাভার ওপরে চলমান। পাটাতনগুলোর স্বাভাবিক চলার পথে সাময়িক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে Plate সীমানায় ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় হয় এবং পরিশেষে হঠাৎ এই শক্তির অবমুক্তিই পাটাতন তথা ভূমির কম্পন ঘটায় যা ভূমিকম্প হিসাবে স্বীকৃত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ভূমিকম্পগুলোর উৎপত্তিস্থল Plate এর প্রান্তদেশে। যদিও প্লেটের মধ্যকার কিছু ফাটলের সীমানায়ও শক্তির সঞ্চয় এবং অবমুক্তি হওয়া সম্ভব যা তুলনামূলকভাবে কম শক্তির ভূমিকম্পের কারণ হতে পারে। অতীত ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ ভূমিকম্প আন্তঃপ্লেট সীমানায় সংঘটিত হয়েছে। বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে প্লেটগুলোর সীমানা রেখাও মানুষের জানা। অতএব পৃথিবীর ৯৫ শতাংশ ভূমিকম্পের উৎসস্থলের অবস্থান আমাদের জানা আছে। বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান ও ইউরেশিয়ান প্লেটের সীমারেখার অতি নিকটে অবস্থিত বিধায় প্রায় সমগ্র বাংলাদেশই ভূমিকম্পজনিত ঝুঁকিতে আছে। সুতরাং ভূমিকম্প কখন আঘাত হানতে পারে সেটা না বলতে পারলেও কোথায় কোথায় আঘাত হানতে পারে সেটা অগ্রিম বলা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে এটা ধরে নেয়া যায় যে বাংলাদেশ একটি ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ। বিশেষত সমগ্র পূর্ব অঞ্চল ও উত্তর অঞ্চল এবং রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য অধিকাংশ বড় শহর ভূমিকম্প ঝুঁকিতে আছে। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ জুনের গ্রেট ইন্ডিয়ান ভূমিকম্পের প্রভাবে সমগ্র বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং তৎকালীন সময়ে প্রায় ১৫০০ লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল।

ভূমিকম্প প্রবণতার দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় বাংলাদেশের সিলেট, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা ইত্যাদি শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা অধিকতর ভূমিকম্পপ্রবণ। ভূমিকম্প প্রবণতার সাথে বিপদাপন্নতা (Vulnerability) তথা অপরিকল্পিত নগরায়ণ, দুর্বল স্থাপনা, আইনের প্রয়োগে শিথিলতা এবং সর্বোপরি ব্যাপক জনসচেতনতার সংমিশ্রণে বাংলাদেশের প্রধান শহর ঢাকা মেগাসিটি বিশ্বের অন্যতম একটি বিপদাপন্ন শহর। এক সমীক্ষায় বিশ্বের ২০টি বড় শহরের মধ্যে ঢাকা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ শহর হিসেবে দেখা যায়।

প্রচলিত অর্থে ভূমিকম্পের আগাম সতর্ক সংকেত নেই। কিন্তু পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ এ বিষয়ে কিছুটা এগিয়েছে। ভূমিকম্পের ধংসাত্মক ওয়েভ কোনো নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার পূর্বেই আধুনিক যন্ত্র দ্বারা আনুমানিক ১০-২০ সেকেন্ড পূর্বেই ভূমিকম্পের আঘাতের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। আরও একটু বিশদভাবে আলাপ করলে বিষয়টা দাঁড়ায় এরূপ– ভূমিকম্প এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয় অন্তত ৪টি সিসমিক ওয়েভের মাধ্যমে। এই চারটি ওয়েভের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুততম ওয়েভ হচ্ছে P-Wave যার গতিবেগ মাটিভেদে কম-বেশি ৭ কি.মি./সেকেন্ড বা প্রতি সেকেন্ডে ৭ কি.মি.। অন্যদিকে অধিকতর ধ্বংসাত্মক ওয়েভ ঝ-ডধাব যার গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে

মাটিভেদে কম-বেশি ৩.৫ কি.মি. । সুতরাং সহজ হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, উপকেন্দ্র বা Epicenter-এর দূরত্বের সাথে ঝ-ডধাব-এর আঘাত হানার সময়ের পার্থক্য আছে। এই সময়ের পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ, গ্যাস ট্রান্সমিশন, দ্রুতগামী যানবাহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব এবং ভূমিকম্প-পরবর্তী বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিটের মাধ্যমে আগুন লাগা ও গ্যাসের মাধ্যমে উহার বিস্তার রোধ করা সম্ভব। দ্রুতগামী যানবাহন বিশেষভাবে রেলগাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ ও ব্রেক করার মাধ্যমে গতি নিয়ন্ত্রণ যা রেললাইনের অংশবিশেষ স্থানান্তরের কারণে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। এখানে উল্লেখ্য যে, ভূমিকম্প আপদে শুধু ভবন ধ্বসেই জানমালের ক্ষতিসাধন হয় না বরং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যেমন– আগুন লাগা ও পানীয় জল এবং জ্বালানীর অভাব ও জানমালের ক্ষতির অন্যতম কারণ এই ভূমিকম্প ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিবেচনায ঝুঁকি বিশ্লেষণ আমরা কিভাবে করব? কোনো-একটি শহরের ঝুঁকি বিশ্লেষণের জন্য আমরা কিভাবে এগুতে পারি তা হল–

প্রথমত আমাদেরকে দেখতে হবে যে কোনো ভূমিকম্পে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় সেটার ধরন কী? একটা কথা প্রচলিত আছে– ভূমিকম্প নয় বরং দুর্বল স্থাপনাই মানুষের মৃত্যুর প্রধান কারণ। কোনো এলাকায় কতগুলো দুর্বল ভবন আছে? শহরের রাস্তাঘাট ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাসহ সার্বিক পরিকল্পনা ব্যবস্থা কেমন? মানুষের সচেতনতা কেমন? ব্যবহৃত নির্মাণসামগ্রীর সার্বিক গুণগত মান, গুণসম্পন্ন নির্মাণসামগ্রীর প্রাপ্যতা, শহর পরিকল্পনা ও ভবন নির্মাণে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধিবিধান এবং আইন ও বিধিবিধানের প্রয়োগ ঘটেছে কিনা। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, স্কুল কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-এর কাঠামোলোর অবস্থা, জরুরি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন– হাসপাতাল, অনুসন্ধান ও উদ্ধারকাজের প্রস্তুতি আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । অতএব, দেখা যাচ্ছে– ভূমিকম্পজনিত দুর্যোগ মোকাবিলার কোনো একটি একক সংস্থার কাজ নয় বরং সর্বস্ত রের সকল শ্রেণী পেশার লোক এবং সকল সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত উদ্যোগই পারে এরকম একটি ঝুঁকি মোকাবিলা করতে।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সার্বিক ভূমিকম্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে সেগুলো হল– রাজউক, সিটি কর্পোরেশন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, আমর্ড ফোর্সেস ডিভিশন। ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবিলাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়– পূর্ব প্রস্তুতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা।

বিভিন্ন সরকারি পদক্ষেপসমূহ

* ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে প্রণীত হয় প্রথম ভূমিকম্প আপদ মানচিত্র যেটা প্রধানত এলাকাভিত্তিক মাটির কম্পনের ধারণা দিয়ে থাকে। এটাকে আমরা Zoning Map হিসেবে জানি।

* ১৯৭৯ সালে জিএসবি-এর উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে প্রণীত হয় ২য় ভূমিকম্প জোনিং ম্যাপ। যেখান থেকে ভূমিকম্প আপদের ধারণা পাওয়া যায়।
* ১৯৯৩ সালে প্রণীত হয় বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড। এই কোর্ড-এ সংযোজিত হয় আপডেটেড জোনিং ম্যাপ। বর্তমানে ১৫ বছর পার হয়ে গেলেও এখনো বিল্ডিং কোড অথবা জোনিং ম্যাপের কোনো আপডেট করা হয়নি।
* গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে প্রধান স্থপতির নেতৃত্বে বিল্ডিং কোড আপডেট করার জন্য নতুন করে কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে।
* বিল্ডিং কোডের প্রয়োজনীয় অংশ আইন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।
* গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে বিল্ডিং কোড এডাপশন-এর ব্যাপারে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।
* রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সনাতনী নির্মাণ বিধিমালাকে ঢেলে সাজিয়ে নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮ প্রণয়ন করেছে।
* নতুন নির্মাণ বিধিমালায় ভূমিকম্প বিবেচনায় নির্মাণকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ সংযোজিত হয়েছে।
* বাজারে গুণগত মানসম্পন্ন নির্মাণ সামগ্রীর প্রাপ্যতা, যা ভূমিকম্প সহনীয় নির্মাণের পূর্বশর্ত, নিশ্চিত করণে বিএসটিআই-এর তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
* গণপূর্ত অধিদপ্তর তাদের সকল সরকারি ভবন নির্মাণে বর্তমানে ভূমিকম্প বিষয়টি বিবেচনায় রাখছে।
* ঢাকা শহরের ৯০টি ওয়ার্ডের সকল বাড়িঘর পরীক্ষা করে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের একটি তালিকা প্রণয়নের জন্য সিটি কর্পোরেশন কাজ করছে।
* প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কিছু গবেষণা কাজ হচ্ছে এবং ঢাকাসহ আরও কয়েকটি শহরের মাইক্রো জোনিং ম্যাপ তৈরির প্রক্রিয়া চলছে।
* জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
* জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অংশ হিসাবে Eventwise পরিকল্পনা যেমন- ভূমিকম্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ঘূর্ণিঝড় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ইত্যাদির কাজ শুরু হয়েছে।
* ভূমিকম্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিভিন্ন সংস্থা নিজেদের Contingency Plan তৈরির কাজ শুরু করেছে।
* আমর্ড ফোর্সেস ডিভিশন এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ইতোমধ্যে তাদের নিজস্ব Contingency Plan-এর খসড়া প্রণয়ন করেছে।
* জরুরি অনুসন্ধান ও সাড়া প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর বিদ্যমান Logistic সুবিধা বৃদ্ধি ও নতুনভাবে যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হচ্ছে।

* যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জরুরি সাড়া প্রদানের জন্য ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স ও আমর্ড ফোর্সেস ডিভিশন-এর Capacity building করা হচ্ছে।
* স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিশেষ করে সকল পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে Activate করা হচ্ছে।
* ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির সফলতা থেকে শিক্ষা নিয়ে জাতীয়ভাবে সেচ্ছাসেবক দল গঠনের বিশেষ করে আরবান সেচ্ছাসেবক দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
* ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট শহরের আর্থকোয়েক ভালনারেবিলিটি এটলাস প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে।
* ভূমিকম্প বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০-এর অধিক সেমিনার / কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
* রাজধানীতে বিল বোর্ড স্থাপনের কাজ শুরু হয়।
* বেশ কয়েকটি ডকুমেন্টরী তৈরি ও প্রদর্শিত হচ্ছে।

সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ভূমিকম্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এর মধ্যে উল্লেখ করার মতো নিম্নরূপ:

* বাংলাদেশ আর্থকোয়েক সোসাইটি বিভিন্ন সময়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও প্রকাশনার মাধ্যমে জনসচেতনতা বিশেষ করে প্রকৌশলী সমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির কাজ করে যাচ্ছে।
* 'একশন এইড বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম শহরের স্কুল ও হাসপাতাল নিয়ে কাজ করছে এবং আর্থকোয়েক ভালনারেবিলিটি এটলাস প্রকাশ করছে।
* ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ চট্টগ্রাম ও সিলেট শহরে জনসচেতনতায় কাজ করছে।
* বাংলাদেশ কংক্রিট সোসাইটি মানসম্পন্ন কংক্রিট প্রস্তুতের মাধ্যমে ভূমিকম্প প্রতিরোধী বাড়ি নির্মাণের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা ২০০৯ হাতে নিয়েছে।
* আইইবি, রিহ্যাব, কনসালটিং ফার্ম ও কনস্ট্রাকশন ফার্ম এসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন সংগঠন স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অবদান রেখে যাচ্ছে।

আবারো বলব বাংলাদেশ বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় যে সাফল্য অর্জন করেছে সে তুলনায় ভূমিকম্প মোকাবেলায় কোনো অবস্থানই সৃষ্টি করতে পারেনি। এ পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারীভাবে যে সব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। ধরা যাক ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ জুন তারিখ-এর ভূমিকম্পের অনুরূপ ভূমিকম্প ঢাকা, চট্টগ্রাম বা সিলেট শহরের মতো জনবহুল শহরে আঘাত করলে ০.২৫% লোকের প্রাণহানির এবং ১% লোকের আহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তাহলে রাজধানী ঢাকা শহরে প্রাণহানির সংখ্যা দাঁড়ায় কম-বেশি ৩০০০০ এবং আহতের সংখ্যা ১২০০০০ জন। একইভাবে ব্যাপক সম্পদের ক্ষতি এবং বেশ কিছু সময়ের জন্য বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদির অনুপস্থিতির বিষয়টি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার ওপর প্রভাব বিশেষভাবে উৎপাদন, রফতানি ও সেবাখাত ইত্যাদিসহ সার্বিক জিডিপি-এর ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তা বাংলাদেশের কাটিয়ে উঠতে কত বছর লাগবে সেটা আমার ধারণায় আসে না। অর্থাৎ সার্বিকভাবে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসবে। আমার বিশ্বাস আজ থেকেই যদি আমরা পরিকল্পিতভাবে কাজ শুরু করি এবং খোদা সহায় হোন যে আগামী ১৫-২০ বছরের মধ্যে যদি আমাদের দেশ ভূমিকম্পে আক্রান্ত না হয় তাহলে আমাদের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে সহনীয় অবস্থায় নিয়ে আসা সম্ভব। তার জন্য দরকার সুপরিকল্পিত উদ্যোগ। সেই লক্ষ্যে আমাদের দরকার

- একটি বাস্তবভিত্তিক ও প্রয়োগযোগ্য ভূমিকম্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিশেষভাবে ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা।
- পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইনের সহায়তা।
- পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও পেশার সঠিক মূল্যায়ন এবং পুরস্কার ও তিরস্কারের বিধান।
- যোগ্য লোককে যোগ্য দায়িত্ব প্রদান।
- বিষয়টিকে উন্নয়নের ও পরিকল্পনার মূল ধারার সাথে সম্পৃক্তকরণ।
- জাপান ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের কারিগরি ও অন্যান্য সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ।
- সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর যোগ্যতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- সার্বিক বিষয়ে আগামী ১৫-২০ বছরের জন্য মহা-পরিকল্পনা গ্রহণ।

ভূমিকম্প ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনায় প্রত্যেকটি সংস্থার প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দায়িত্ব প্রদানের কোনো বিকল্প নেই। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি সংস্থার দায়িত্ব নিম্নরূপ প্রস্তাব করা যায় যেমন-

১। ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর:

- বর্তমান শহর এলাকা ও ভবিষ্যতের পরিকল্পিত শহর এলাকার জিওলজিক হেজার্ড ও ইঞ্জিনিয়ারিং জিওলজিক্যাল হ্যাজার্ড ম্যাপ প্রণয়ন।
- ভূকিম্প ঝুঁকি হ্রাসে সকল কর্মসূচিকে তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহকরণ।
- প্রাপ্ত ম্যাপসমূহের আপডেটিং।
- সকল প্রকাশনা ও কাজ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও ব্যক্তির সাথে Share করার জন্য প্রতিনিয়ত সেমিনার ও ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা চালু রাখা, ইত্যাদি।

২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো:

- ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সকল সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সকল ম্যাপ ও তথ্য উপাত্ত সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট পৌঁছানোর জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে সকল স্তরের (পলিসি লেভেল থেকে শুরু করে নির্মাণ শ্রমিক পর্যন্ত) জনসাধারণের জন্য প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ।
- আবশ্যক (Life line) সরবরাহসমূহ যেমন- বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদির নির বিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- দুর্যোগের সময় নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- সঠিক ও যুগোপযোগী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভূমিকম্প ঝুঁকি হ্রাস ও সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমানো।
- নিরাপদ ভবন নির্মাণ ও শহর পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমুহকে সহযোগিতা প্রদান।
- ঐতিহাসিক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও অন্যান্য কাঠামো সংরক্ষণে এবং রেট্রোফিটিং ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে সহযোগিতা করা।
- ভূমিকম্প ঝুঁকিহ্রাসে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় সাধন করা।
- রেট্রোকিট ও রিপ্লেসমেন্ট-এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পুরস্কার ও তিরস্কারের ব্যবস্থা প্রদান।
- দুর্যোগ মোকাবেলা তহবিল গঠন করা।
- ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সংযোজন করা–

* জিও সাইন্স	* ভূমি ব্যবহার
* জরুরি সাড়া	* রিকভারি
* বর্তমান ভবনসমূহ	* নতুন কনস্ট্রাকশন
* জরুরি সেবাসমূহ	* রাস্তাঘাট ও ব্রিজ
* পূর্ব প্রস্তুতি	

অনুরূপভাবে সকল সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের দায়িত্ববণ্টনসহ একটি কার্যকরী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু না হলে বিভিন্ন সংস্থার কাজে এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো বাদ পড়বে এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে অনেক মূল্যবান সময় ক্ষেপণ হবে।

পরিশেষে বলতে চাই, অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হল সকলের সকল কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোই হোক অথবা খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ই হোক– নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে যদি সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা যায় তাহলেই কেবল অন্যান্য সকল বিষয়ের সফলতা অর্জন করা সম্ভব হবে।

[মো. আবু সাদেক একজন পুরকৌশলী (সিভিল ইঞ্জিনিয়র) এবং পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো।]

বাংলাদেশে ভূমিকম্প: গুরুত্বপূর্ণ তিন প্রসঙ্গ

মো. আলী আকবর মল্লিক

বাংলাদেশ বড় মাত্রার ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে এমন আশংকার কথা দেশি বিদেশি ভূমিকম্প-বিশেষজ্ঞদের বরাত দিয়ে নিকট বছরগুলোতে বিভিন্ন গণমাধ্যমে বার বার এসেছে। আজকের বাংলাদেশের সীমানায় ভূমিকম্প ঘটার ইতিহাস মোটেই সুখকর নয়। গত ১৫০ বছরে রিখটার স্কেলে ৭.০ থেকে ৮.৭ মাত্রার যে সাতটি ভূমিকম্প দ্বারা আজকের বাংলাদেশের ভূখণ্ড কম্পিত হয় তার মধ্যে ১২ জুন ১৮৯৭ সালে আসাম বেসিনে ঘটা ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্পটি ছিল পৃথিবীতে এ পর্যন্ত ঘটা একটি অন্যতম মহাপ্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প। ভূগর্ভস্থ টেকটনিক প্লেটের বৈশিষ্ট্যে এটাই লক্ষণীয় যেখানে একবার ভূমিকম্প ঘটে সেখানে কোনো-এক রিটার্ন পিরিয়ডে আবারও ওই একই মাত্রার ভূমিকম্প ঘটতে পারে। তাছাড়া (১) বাংলাদেশ ও আশপাশ ঘিরে চারটি সক্রিয় চ্যুতির উৎস অঞ্চল অবস্থান করছে, (২) নব্বই দশকের শেষের দিকে সিলেট,

চট্টগ্রাম ও মহেশখালীতে তিনটি নিম্ন-মধ্য মাত্রার ভূমিকম্প ঘটে ভবন বিধ্বস্ত ও প্রাণবিয়োগের মতো ঘটনা ঘটেছে, (৩) আন্তর্জাতিক ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে বাংলাদেশেও বড় মাত্রায় কম্পিত হবার আশংকা পাওয়া গেছে, এবং (৪) ইদানীং বারবার ছোট মাত্রার কম্পন হয়ে চলছে, যাকে বড় মাপের ভূমিকম্পের আগাম বার্তাও বলা যেতে পারে।

গত দশ বছরে বাংলাদেশ ছোট বা মধ্য মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় ৩০০ বার কেঁপেছে। বাংলাদেশও যে একটি ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ, এই বাস্তবতার উপলব্ধি আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত থাকার সবচেয়ে বড় কারণ হল– বর্তমানে যাদের বয়স ৭৫ বছর তারা পর্যন্ত এ দেশে বড় মাত্রার ভূমিকম্প এখনও প্রত্যক্ষ করেনি। অথচ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা যেখানে কোটি লোকের বাস সেই ঢাকাকে (১) ভূমিকম্প হবার সম্ভাবনা বা এক্সপোজার, (২) ভূমিকম্পের দুর্যোগ বা হ্যাজার্ড, (৩) ভূমিকম্পের ঝুঁকি বা ভালনারেবিলিটি এবং (৪) ভূমিকম্প ঘটার পরে উদ্ধারকাজ বা রেসকিউ এই চারটি সূচক-এর ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর ২০টি শহরের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ শহর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জাপানের-টোকিও শহরে ভূমিকম্প হবার সম্ভাবনা ঢাকার চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু টোকিও শহর ওই বিশটি শহরের মধ্যে নেই। তার কারণ টোকিওর প্রস্তুতি ও সচেতনতা অতি উচ্চমানের। ব্যাপারটি এরকম– কোনো-এক ধনীর বাড়িতে ডাকাতি হবার সমূহ সম্ভাবনা আছে বলে বাড়ির মালিক ডাকাতি ঠেকাতে পর্যাপ্ত গার্ড নিয়োগ করলেন, বাড়ির সবাই থাকলেন সচেতন। ফলে ওই বাড়িতে ডাকাত এলেও ডাকাতি করার সুযোগ পাবে না। অন্য একজন মধ্যবিত্তের বাড়িতে ডাকাতি হবার সম্ভাবনা তেমন নেই মনে করে বাড়ির মালিক আত্মরক্ষামূলক কোনো ব্যবস্থা নিলেন না। ফলে ওই বাড়িতে সহজেই ডাকাতি হতে পারে।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থানটা হচ্ছে শেষোক্ত উদাহরণটির মতো। বাংলাদেশের অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় না এ দেশে সাধারণ জনগণ, এমনকি অনেক প্রকৌশলী এবং রিয়াল স্টেট ডেভলপারের মধ্যেও ভূমিকম্প বিষয়ে সচেতনতা আছে। যেমন আবাসিক ভবনগুলোর সবচেয়ে নিচের তলায় কার পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রাখতে গিয়ে ওই তলার বাইরের কলামগুলোকে আরসিসির শেয়ার ওয়াল বা ব্রেসিং দ্বারা যুক্ত করতে দেখা যায় না। যার ফলে ওই তলাগুলো দুর্বল তলার (সফ্‌ট স্টোরি) ত্রুটি নিয়ে নির্মিত হচ্ছে। আবার আরসিসির বিম ছাড়া শুধু স্লব (ফ্লাট প্লেট) দ্বারা এখনও অনেক আবাসিক ভবন নির্মিত হতে দেখা যায় যা ভূমিকম্পের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালে তৈরি হওয়া বিল্ডিং কোডে আমেরিকার ইউনিফর্ম বিল্ডিং কোড অনুসরণ করে সাইজমিক ডিজাইনের গাইডলাইন দেয়া হয়েছে। এদেশের ডিজাইনাররা খুব বেশি হলে এই গাইডলাইনের ওপর ভিত্তি করে সাইজমিক ডিজাইন করছেন। কিন্তু বেশির ভাগ আবাসিক ভবন ভূমিকম্পের দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লিখিত দুটি ত্রুটিসহ নির্মাণ করতে দেখা যায়। তাই বিল্ডিং কোড সঠিকভাবে মেনে চলার আগে কোডকে আত্মস্থ করা অত্যন্ত জরুরি কাজ।

১২ মে ২০০৮ চায়নার সিচুয়ান প্রদেশে রিখটার স্কেলে ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পটি প্রায় এক লাখ জীবন কেড়ে নিয়েছে। অনেক স্কুলভবন ধ্বংস হয়ে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী মারা গেছে। অনেক পরিবার সন্তানহারা হয়েছে।

ভেঙে পড়া সেই সব স্কুলভবনগুলোর নির্মাণে নিম্নমানের কংক্রিট এবং রডের পরিমাণ অনেক কম ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ভবন নির্মাণে বড় ধরনের কারচুপির অভিযোগ এসেছে; ভূমিকম্পটি না ঘটলে এই কারচুপির বিষয়টি জনসমক্ষে আসত না। এমনি ভাবে ভূমিকম্পের পরে ভবন নির্মাণে কারচুপি ছিল, ডিজাইনে ভুল ছিল, নির্মাণকালে কাজ ঠিকমতো হয়নি-সহ অনেক বিষয় যদিও বেরিয়ে এসেছে কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

বাংলাদেশে সর্বসাধারণের মাঝে ভূমিকম্প বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বছরের একটি দিন ভূমিকম্প দিবস ঘোষণা করা দরকার। দিবসটি হতে পারে ১২ জুন। অন্য কোনো দিনও হতে পারত। তবে যতদূর জানা যায় ১৮৯৭ সালের ১২ জুনের ভূমিকম্পে এ দেশ বা অঞ্চল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দি গ্রেট ইন্ডিয়ান আর্থকোয়েক নামে পরিচিত এ ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল ঢাকা থেকে মাত্র ২৩০ কিমি দূরে সিলেটের কাছে আসামে। ভূমিকম্পটি ঘটেছিল বিকেল ৫ টা ১১ মিনিটে। উৎপত্তি হয়েছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩২ কিমি গভীরে। প্রায় চার লাখ বর্গ-কিমি জুড়ে প্রলয়ঙ্করী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। প্রাণ হারায় ১৫৪২ জন লোক। আসাম, ত্রিপুরা, ধুবরি, শিলং, পূর্ববঙ্গ ইত্যাদি অঞ্চল বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন বিশেষ করে লন্ডন টাইমস ১৪ জুন থেকে ১০ আগস্টের মধ্যে ৭ টি সংখ্যায় এবং নিউইয়র্ক টাইমস ১৪ জুন এই ভূমিকম্পটির বিষয়ে রিপোর্ট করেছিল। মডিফাইড মার্কারি ইন্টেনসিটি স্কেলে যে রোমান বারোটি স্কেল আছে, ঢাকা শহর কেঁপেছিল তার অষ্টমতম স্কেলে। ঢাকার থেকে বেশি মাত্রায় কেঁপেছিল সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর এবং এসব শহর বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির, নাটোরের রাজবাড়ির একাংশ, ত্রিপুরার রাজবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছিল এই ভূমিকম্পে। আজ থেকে ১১১ বছর আগে ১৮৯৭ সালে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে স্থাপনা বলতে ইটের তৈরি কিছু বাড়ি, রাজবাড়ি আর মসজিদ-মন্দির ছাড়া কিছুই ছিল না। তাই ব্যাপক আকারে স্থাপনা ধ্বংস হবার তখন সুযোগ ছিল না। আজকে বাংলাদেশে আছে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে-ওঠা লক্ষ লক্ষ স্থাপনা। এমন একটি ভূমিকম্প এখন যদি ঘটে তবে কী হতে পারে তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়।

ভূমিকম্প বিষয়ে বাংলাদেশকে অনেক দূর যেতে হবে; সে কারণে একটি ভূমিকম্প দিবস ঘোষণা করে প্রথমে অন্তত একটি মাইলফলক গড়া দরকার। ভূমিকম্প দিবসে এমন কিছু কর্মতৎপরতা থাকবে যা থেকে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে। এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো। তার সাথে বাংলাদেশ আর্থকোয়েক সোসাইটি (বিইএস) এবং বিভিন্ন এনজিওদের সক্রিয় ভূমিকা থাকতে পারে। তা ছাড়া ভূমিকম্পে প্রস্তুতি ও সচেতনতার বিষয়টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার যেমনটি

অন্যান্য ভূমিকম্পপ্রবণ দেশে করা হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না ভূমিকম্প মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা কমিয়ে আনতে পারে। এমনিতে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, খরা, নদীভাঙন এসব দুর্যোগের অত্যাচারে বাংলাদেশ একপা আগায় তো দু'পা পেছায়। তার ওপর ভূমিকম্প এমনই এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা কাউকে বলে-কয়ে আসে না।

ভূমিকম্প মোকাবেলার জন্য আমরা কতটা প্রস্তুত তার প্রমাণ মিলেছে সাভার, তেজগাঁ, র‍্যাংগস ভবন ট্রাজেডি এবং কারওয়ান বাজারের ইস্পাত ভবনে আগুন লাগার ঘটনাগুলো মোকাবেলার মান থেকে। ভূমিকম্প মোকাবেলার প্রস্তুতির প্রথম পদক্ষেপটি হওয়া উচিত ভূমিকম্প সহনশীল ভবনসহ সব ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করা। বাংলাদেশ সরকার উদ্ধার কাজের জন্য বেশ কিছু ভারি মেশিনপত্র কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারের তত্ত্বাবধানে উদ্ধার কাজে উপযোগী অনেক ছোট-বড় মেশিন যেমন থাকবে তার সাথে প্রাইভেট সেক্টরে ক্রেন, বুলডোজারের মতো ভারী মেশিন থাকা দরকার। দেশের নেতৃস্থানীয় কনস্ট্রাকশন কোম্পানিগুলোকে এসব মেশিন নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে ট্যাক্স ফ্রি উপায়ে আমদানি করার সুযোগ দিলে ভালো হয়। বিশেষ করে অনেক উন্নত দেশে রিকন্ডিশন মেশিনের বড় বড় অকশন হয় যেখান থেকে আমাদের দেশের কনস্ট্রাকশন কোম্পানিগুলো কম দামে এসব মেশিন কিনতে পারে। এবং বিষয়টি এমন হওয়া দরকার যে, এসব মেশিন-এর পরিচয় ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোয় লিপিবদ্ধ থাকবে। সরকার কোনও দুর্যোগ মোকাবেলায় যখনই এই মেশিনগুলো প্রয়োজন মনে করবে তখনই ওই কোম্পানিগুলো তা সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে।

দুই

২৭ জুন ২০০৮-এর প্রথম প্রহরে তথা মধ্যরাত সময় ১২ টা ৫২ মিনিটে ঢাকা শহর কেঁপে ওঠার মাত্র কয়েক মিনিট আগে আমি জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে আসি ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ের উদ্দেশ্যে। ভূমিকম্পটির ফলে ঢাকায় ঝাঁকুনির তীব্রতা বাস্তবে অনুভব করার সুযোগ আমার না হলেও, বোঝার বাকি থাকে না যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হলের কাঠামো যে মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং অনেক ছাত্র আতঙ্কিত হয়ে উপরতলা থেকে যে ভাবে লাফিয়ে পড়েছে তাতে স্মরণকালের একটি বড় মাত্রায় ঢাকা এবার কেঁপেছে নিসন্দেহে। বাংলাদেশের সব কিছু যেমন সরকার, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সূতিকাগার জড়ো হয়ে আছে ঢাকায়– সেকারণে এই শহরটির কথা চলে আসে সবার আগে। একমাত্র ভূমিকম্প হচ্ছে এমন দুর্যোগ যা সিডর, নার্গিস, বন্যা সবকিছুকে ছাপিয়ে মাত্র কয়েকটি সেকেন্ড সময় নিয়ে একটি শহরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারে। এমন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে অন্তত একটি দেশের সবকিছু দেশটির রাজধানী শহরে জড়ো করা ঠিক নয়।

ভূমিকম্পের প্রস্তুতি ও সচেতনতার অভাবে ঢাকা শহর এরকমেরই ঝুঁকির মধ্যে আছে। যদিও কয়েক বছর আগে যেখানে ভূমিকম্পের বিষয়ে সচেতনতা শূন্যের কোঠায় ছিল সেখানে ইদানিং বিষয়টি নিয়ে সাধারণের মধ্যে কিছুটা হলেও আগ্রহ লক্ষ করা যায়। আগ্রহ কিছুটা তৈরি হলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন নেই বললেই চলে। বাংলাদেশ আর্থকোয়েক সোসাইটি (বিইএস) প্রায় প্রতি মাসে ভূমিকম্পের ওপর সেমিনার-ওয়ার্কশপ করা ছাড়াও এবছর ১২ জুন অন্যান্য কয়েকটি সংস্থার সাথে পাঁচশ'র বেশি লোক সমাগম করে একটি র‍্যালি বের করে পাবলিক লাইব্রেরি থেকে শাহবাগ হয়ে শিশু একাডেমি পর্যন্ত। উদ্দেশ্য ছিল ১২ জুন সিলেটের অদূরে আসামে ঘটে যাওয়া রিখটার স্কেলে ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্পটির ফলে ঢাকা শহরসহ দেশের অন্য সব শহর তখন যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া।

মানুষ যে কাঠামোর মধ্যে বাস করে সেই কাঠামোটি যদি একটি উচ্চমাত্রার কম্পন সহ্য করে টিকে থাকতে পারে (অক্ষতভাবে বা সামান্য কিছুটা ক্ষত নিয়ে) তবেই জান-মাল রক্ষা হতে পারে। প্রকৃতির খেয়ালে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পকে ঠেকানো মানুষের সাধ্যের বাইরে। ধরে নিলাম দিনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে একটি বড় মাত্রার ভূমিকম্প ঘটেই গেল। একটি পরিবারের সাতজন সদস্যের মধ্যে তিনজন ধরে নিলাম ছিল নিজ বাড়িতেই। বাকি চারজনের একজন অফিসে, একজন স্কুলে এবং দুজন বাইরে। বাড়িটি যদি ভূমিকম্পে টিকে থাকতে না পারে তবে বাড়িতে থাকা তিনজন মারা পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। অফিস ও স্কুলে থাকা দুজনের জীবনও নির্ভর করছে ওই ভবন দুটির ওপর। বাইরে থাকা সদস্য দুজনের বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সুতরাং মৃত্যুর কারণ কিন্তু ভূমিকম্প নয় বরং মানুষের তৈরি করা ভূমিকম্প সহনশীল নয় এমন ভবন। ভূমিকম্পটি যে ঘটেছে তা প্রতিরোধ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব না হলেও বাড়ির দালান, অফিস ও স্কুল ভবনগুলো ভূমিকম্প সহনশীল করে নির্মাণ করা সম্ভব।

বর্তমান যুগে ভূমিকম্প সহনশীল ভবন তৈরির যে কলাকৌশল মানুষের আয়ত্তের মধ্যে আছে তার একটি হচ্ছে ভবনের নকশা তৈরিতে কিছু নিয়ম মেনে চলা এবং কাঠামো ডিজাইনের হিসাব-নিকাশে ভূমিকম্পের বিষয়টি সম্পৃক্ত করা। দেশ বা অঞ্চল ভেদে কাঠামো ডিজাইনের বিষয়টিতে হেরফের হতে পারে। বাংলাদেশে এমন কিছু নিয়ম-কানুন নিয়ে একটি নির্দেশিকা বা বিল্ডিং কোড ১৯৯৩ সালে তৈরি হয়েছিল। কাঠামো ডিজাইনে ভূমিকম্পের পার্শ্বশক্তি সম্পৃক্ত করতে মূলত আমেরিকার কোড অনুসরণ করে তৈরি হওয়া বাংলাদেশের বিল্ডিং কোডটি অনেক কাঠামো-প্রকৌশলীই অনুসরণ করছেন বলে মনে হয়। তবে কোড সঠিক নির্দেশনা দিলেও কোডকে সঠিকভাবে আত্মস্থ না করার কারণে ত্রুটিপূর্ণ ভবন নির্মাণ হয়েই চলেছে। ৭-৮ ইঞ্চি পুরু আরসিসির ফ্লাট প্লেট দ্বারা নিচুতলা ভবন (যেমন ছয় তলা) নির্মাণ এর একটি বড় উদাহরণ।

এই সব নিচুতলা ভবনের কলামগুলোর আকার কমবেশি ১০x২৫ বর্গ-ইঞ্চি। ভূমিকম্পের সময় এই কলামগুলো বিশাল আকারের প্লেট দ্বারা কর্তনীয় ও বক্রনীয়

উভয় পীড়নে আক্রান্ত হবে। ভূমিকম্পের মুহূর্তে পুরু প্লেটের বেশি মাত্রার ভর বেশি মাত্রার পার্শ্ব শক্তি সঞ্চালন করে পুরো ভবনই কর্তনীয় পীড়ন দ্বারা ধরাশায়ী করতে চাইবে। আবার বিম না থাকার ফলে ভূমিকম্পের মুহূর্তে বিশাল আকারের ফ্লাট প্লেটের শতকরা ৭০ ভাগ যেহেতু বিমের ন্যায় কাজ করবে সেহেতু উহার বক্রনীয় পীড়ন কলামের বক্রনীয় পীড়নের চেয়ে অনেক বেশি হবে। অথচ বিমের চেয়ে কলামের বক্রনীয় পীড়ন শতকরা ২০ ভাগ বেশি থাকতে হবে বলে কোড নির্দেশ করে। তা সত্ত্বেও ফ্লাট প্লেট দ্বারা ভবন নির্মাণ করা এবং এ ধরনের ভবন জনপ্রিয়তা পাবার বড় কারণ (ক) বাড়ির কক্ষগুলো ইচ্ছে মতো বিন্যাস করা যায়, (খ) বিম না থাকাতে দেখতে ভালো লাগে এবং (গ) নির্মাণ সময় কম লাগে যেহেতু ফ্লাট প্লেটের ফর্মওয়ার্ক করা বা আরসিসির ঢালাই দেয়া সহজ হয়। এসব ইউটিলিটির দৃষ্টিকোণ থেকে জনপ্রিয়তা পেলেও ভূমিকম্পের দৃষ্টিকোণ থেকে এমন ভবন ঝুঁকিপূর্ণ।

বাংলাদেশে আবাসিক ভবনে গাড়ি রাখার তলাটি সাধারণত দুর্বল তলা হিসেবে নির্মিত হতে দেখা যায়। কারণ এই তলাটিতে পার্শ্ববর্তী দুটি কলাম একটি আর একটির সাথে গুণ চিহ্ন আকারের ব্রেসিং বা শেয়ার ওয়াল দ্বারা সংযুক্ত করতে দেখা যায় না। অথচ ভূমিকম্পের মুহূর্তে ভবনের সর্বনিম্ন তলাটি অন্য সব তলার চেয়ে বেশি মাত্রার কর্তনীয় ও বক্রনীয় উভয় পীড়ন দ্বারা আক্রান্ত হয়।

এমন সব ত্রুটি নিয়ে ক্রমাগত ভবন নির্মাণ করার যে ধারা সেটা অব্যাহতভাবে চলতে পারে না। যেগুলো নির্মিত হয়েছে সেগুলোতে থাকা দুর্বল দিকগুলোকে রেট্রফিটিং-এর মাধ্যমে ঠিকঠাক করা সম্ভব। রেট্রফিটিং করতে অতিরিক্ত কলাম তৈরি করা, নির্মিত কলামকে শক্তিশালী করা, পার্শ্ববর্তী দুটি কলামকে গুণ চিহ্ন আকারের আরসিসির ব্রেসিং বা শেয়ার-ওয়াল দ্বারা সংযুক্ত করার মধ্য দিয়ে ত্রুটিগুলো সমাধান করা যেতে পারে। জাপানের কোবে শহরে ১৯৯৫ সালে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের পর সে দেশের দুর্বল স্থাপনাগুলো রেট্রফিটিং করা হয়েছে। ভূমিকম্প সহনশীল কাঠামো নির্মাণ শুধু জাপান, মেক্সিকো, আমেরিকা, তাইওয়ান বা চায়নার বিষয়ই নয় বাংলাদেশেরও বিষয়। বাংলাদেশিদের মধ্যে এই উপলব্ধি যত তাড়াতাড়ি গড়ে উঠবে ততই মঙ্গল।

তিন

২০০১ সালে গুজরাটের ভূমিকম্প, ২০০৪ সালে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় ভূমিকম্প-সুনামি এবং ২০০৫ সালে কাশ্মিরে ভূমিকম্পের পর বাংলাদেশে ভূমিকম্পের বিষয়টি নিয়ে গবেষকদের মধ্যে কিছুটা আগ্রহ বাড়লেও সচেতনতা মোটেই বাড়েনি। অথচ ভূমিকম্পে প্রস্তুতি আর সচেতনতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে মানুষ ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি বহুলাংশে কমিয়ে আনতে পারে।

ঢাকাসহ যে শহরগুলোতে মিটার ছাড়া গ্যাসের লাইন আছে সেখানেই অকারণে গ্যাসের চুলা সর্বক্ষণ জ্বালিয়ে রাখা হয় বলে তিতাস গ্যাস সূত্রে জানা যায়। বাংলাদেশিদের অনেক নেতিবাচক ঐতিহ্যের মধ্যে এটি একটি। বিল যেহেতু নির্ধারণ

করা সুতরাং যত পারো গ্যাস পোড়াও। ন্যাচারাল রিসোর্স যেমন গ্যাস পানি বিদ্যুৎ ইত্যাদি সাশ্রয় করে খরচ করা আদর্শের প্রতীক, কৃপণতা নয়। অথচ গ্যাসের চুলা সর্বক্ষণ জ্বালিয়ে রাখে কেমন দেশপ্রেম।

কিন্তু সমস্যা বা আশঙ্কা অন্যখানে। একটি বড় মাত্রার ভূমিকম্পের ফলে বড় মাত্রার ঝাঁকুনি হলে ওই মুহূর্তে যদি একটি বাড়ির গ্যাসের চুলা জ্বালানো অবস্থায় থাকে তবে মুহূর্তে বাড়িটিতে আগুন লেগে যেতে পারে। তা হলে শুধু ঢাকাতেই তিতাসের দেয়া সাড়ে সাত লাখ গ্যাসের লাইনের অর্ধেক যদি জ্বালানো অবস্থায় থাকে; তাহলে কী অবস্থার সৃষ্টি হবে সেটা ভাবতে গেলেও স্তম্ভিত হতে হবে। কাজেই ভূমিকম্প প্রতিরোধ করা যেহেতু অসম্ভব, তাই সব ধরনের সতর্কতামূলক কর্ম-পরিকল্পনাই পারে আমাদের জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে রাখতে।

[ড. মো. আলী আকবর মল্লিক। কাঠামো প্রকৌশলী, ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ এবং মহাসচিব, বাংলাদেশ আর্থকোয়েক সোসাইটি।]

সম্ভাব্য ভূমিকম্প: নিশ্চিত ক্ষতি থেকে সাধ্যমতো রক্ষা

মো. জাহাঙ্গীর আলম

প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের পরে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি/ভয়াবহতা আজও মানুষের কাছে অপ্রতিরোধ্য। এই দুর্যোগ মোকাবিলার যথাযথ প্রাক্-প্রস্তুতি বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কোনোটাই এখনও আমরা সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারি না। বিশ্বের বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া মারাত্মক ভূমিকম্পগুলো এখনও দেশের পুরপ্রকৌশলী, স্থপতি, নির্মাতা ও বাড়ির মালিকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারেনি। প্রত্যেক দেশে ভূমিকম্প সৃষ্ট দুর্যোগ থেকে ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যু এড়াতে দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা অবশ্যই থাকতে হবে। কিন্তু তা সময় সাপেক্ষব্যাপার। বাংলাদেশ একটি ভূমিকম্প ঝুকিপূর্ণ স্থান। বাংলাদেশে বিশেষত রাজশাহী, সিলেট, ঢাকা ও বন্দরনগরী চট্টগ্রাম অত্যন্ত জনবহুল। অপরিকল্পিত ও অপ্রকৌশলগতভাবে দুর্বল কাঠামোর উপর গড়ে ওঠা দালান-কোঠা, শিল্প-কারখানা, মসজিদ-মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়

ইত্যাদির কারণে এখানে বড় মাপের ভূমিকম্প হলে ক্ষয়ক্ষতি হবে ভয়াবহ। ভূমিকম্প আটকানো যেমন সম্ভব নয়, তেমনি ভূমিকম্পে মানুষও মরে না। মানুষ মরে বাড়িঘর ভেঙে পড়ে। তাই মৃত্যু এড়াতে আগাম বা প্রাক্-প্রস্তুতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। আগাম বা প্রাক্-প্রস্তুতি ব্যবস্থা দুই ধরনের হতে পারে। প্রথমত নতুন বিল্ডিং বা অবকাঠামো নির্মাণে ভূমিকম্প বিষয়ক বিশেষ নিয়ম মেনে চলা, দ্বিতীয়ত পুরনো বিল্ডিং বা অবকাঠামোগুলো পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহারযোগ্য, সংস্কারযোগ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করে, সংস্কারযোগ্য অবকাঠামোগুলো প্রকৌশলগতভাবে শক্তিশালীকরণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাঠামোগুলো অনতিবিলম্বে ভেঙে ফেলা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে- যে সব দালানকোঠার অবকাঠামো দুর্বল বা ভূমিকম্প প্রতিরোধক (Earthquake Resistant) নয় সেগুলোর ব্যাপারে ভূমিকম্পের প্রাক্-প্রস্তুতি হিসেবে কী করণীয় থাকতে পারে? এই ব্যাপারে এই নিবন্ধের শেষে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অতীব জরুরি কিছু প্রস্তাব দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। অবশ্যই একেবারে নিকট-অতীতে কোনো বড় মাপের ভূমিকম্প না ঘটায় পুরপ্রকৌশলী, স্থপতি, নির্মাতা ও বাড়ির মালিক, সরকারি সংস্থাগুলো বা জনসাধারণ বিষয়টি নিয়ে তেমন সচেতন নয়। এ প্রবন্ধে ভূমিকম্প মোকাবেলার প্রাক্-প্রস্তুতি হিসাবে আমাদের বিজ্ঞ প্রকৌশলী, নক্শাবিদ এবং সর্বোপরি বাড়ি নির্মাতা ও মালিকদের প্রতিও কিছু দিক-নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রবন্ধে ভূমিকম্পের সময় ও পরে জনসাধারণের করণীয় বিষয়াবলী এবং এ বিষয়ে সরকারের এ মুহূর্তে করণীয় কী তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

ক. আপনি যদি ভূমিকম্প-ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বসবাস করেন তাহলে নিম্নের নির্দেশাবলী মেনে চলুন:

১. ভূমিকম্প কিভাবে এবং কেন হয় জানুন। ভূমিকম্প পরিণতি কী হবে জানুন।

২. আপনি যে বিল্ডিং অথবা বাসায় বসবাসরত আছেন তা ভূমিকম্পের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কিনা জেনে নিন। এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার/স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের সহায়তা নিন।

৩. আপনার ছেলে/মেয়েকে যে স্কুলে পাঠাচ্ছেন, ঐ বিল্ডিং-এর ভূমিকম্প-রোধ ক্ষমতা আছে কিনা খোঁজ নিন।

৪. যদি ভূমিকম্পের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়, তাহলে ঐ বিল্ডিং অথবা বাসা ত্যাগ করুন।

৫. ভূমিকম্পের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং অথবা স্থাপনাসমূহে বসবাস অথবা চলাচল থেকে বিরত থাকুন। ঐসব বিল্ডিং-এর মেরামত অথবা কাঠামোগত শক্তিবৃদ্ধি করুন। এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার/স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ নিন।

৬. অতি ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং অথবা স্থাপনাসমূহ ভেঙে ফেলুন।

৭. টর্চলাইট ও রেডিও এমন একস্থানে রাখুন যাতে সহজেই ভূমিকম্প দুর্যোগের সময় পাওয়া যায় ।
৮. ঘরের ফার্নিচার নির্দিষ্ট জায়গায় গুছিয়ে রাখুন । চলাচলের জায়গায় ফার্নিচার রাখবেন না ।
৯. মূল্যবান জিনিসপত্র যেমন: টেলিভিশন, কম্পিউটার, গ্যাস সিলিন্ডার, ফাইল কেবিনেট, বুককেইস ভালোভাবে শক্ত জিনিসের সাথে বেঁধে রাখুন ।
১০. পরিবারের সবাইকে বৈদ্যুতিক মেইন সুইচ ও গ্যাসের সুইচ কিভাবে বন্ধ করতে হয় জানিয়ে রাখুন ।
১১. যদি সম্ভব হয়, আগুন নেভানোর যন্ত্র প্রতি ঘরে একটি করে রাখুন ।
১২. প্রতি ঘরে প্রয়োজনমতো মাথায় পরার হেলমেট নির্দিষ্ট জায়গায় রাখুন ।
১৩. ঘরে একটি ৪ ফুট ঢ ৬ ফুট লোহার টেবিল রাখুন । ভূমিকম্পের সময় পরিবারের সবাই উক্ত টেবিলের নিচে আশ্রয় নিন ।

খ. ভূমিকম্পের সময় কী করবেন:

১. শান্ত থাকুন ও অন্যদের শান্ত রাখুন ।
২. দরজার দিকে দৌড় দিবেন না ।
৩. লিফট ব্যবহার করবেন না ।
৪. শান্তভাবে হাঁটুন ।
৫. বিদ্যুৎ চলে যেতে পারে, টর্চ ব্যবহার করুন ।
৬. যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হতে পারে, সজাগ থাকুন ।
৭. মাথায় হেলমেট দিয়ে দরজার নিচে অথবা লোহার টেবিলের নিচে আশ্রয় নিন ।
৮. মাটির বাড়ি থেকে যত সম্ভব দূরে থাকুন ।

গ. রাস্তায় থাকলে কী করবেন:

১. খালি জায়গায় হাঁটুন, শান্ত থাকুন এবং সজাগ থাকুন ।
২. দৌড় দেবেন না ।
৩. ঝুঁকিপূর্ণ বাড়িঘর থেকে দূরে থাকুন ।
৪. মাটির বাড়ির থেকে নিরাপদ জায়জায় চলে আসুন ।
৫. পুরাতন বিল্ডিং থেকে দূরে থাকুন ।
৬. বৈদ্যুতিক তার থেকে দূরে থাকুন ।
৭. ঢালু জায়গা বা দেওয়াল থেকে দূরে থাকুন ।

ঘ. চলন্ত গাড়ি বা গাড়ি চালানোর সময় কী করবেন:

১. চলন্ত গাড়ি বন্ধ করে রাখবেন ।
২. খোলা জায়গায় গাড়ি বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকুন ।
৩. বৈদ্যুতিক তার থেকে দূরে গাড়ি পার্কিং করুন ।
৪. দেওয়ালের পাশে বা গাছের নিচে গাড়ি পার্কিং করবেন না ।

ঙ. ভূমিকম্পের পরে কী করবেন:

১. শান্ত থাকুন, রেডিও খোলা রাখুন এবং যদি মোবাইল থাকে তাহলে নিকটস্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করুন ও রেডিওর নির্দেশ মেনে চলুন ।
২. সাগর অথবা নদীর পারে থাকবেন না । সাগর অথবা নদীর পানিতে বন্যা (সুনা -মি হতে পারে ।
৩. মনে রাখবেন ভূমিকম্প একবার আসে না । পরপর অনেকবার ভূমিকম্প হতে পারে এবং কয়েকদিন পর্যন্ত ।
৪. গ্যাস লাইন ও ইলেকট্রিক লাইন বন্ধ রাখুন ।
৫. সিগারেটের আগুন অথবা কোনো ধরনের লাইটার জ্বালাবেন না । গ্যাস অথবা বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের জন্য আগুন লেগে যেতে পারে ।
৬. যদি আগুন লেগে যায়, তাহলে তা নিবারণের ব্যবস্থা নিন ।
৭. যদি কোনো লোক মারাত্মকভাবে আহত হয়, তাহলে নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা নিন ।
৮. জরুরিভিত্তিতে ধ্বংসাত্মক দাহ্য জিনিষপত্র পরিষ্কার করুন ।
৯. যদি আপনি জানেন যে, কোনো লোক বিল্ডিং অথবা জিনিষের নিচে চাপা পড়েছে তাহলে উদ্ধারকর্মীদের সহায়তা নিন । দৌড়াদৌড়ি করবেন না । তাতে আপনি ও আহত ব্যক্তির অবস্থার আরও অবনতি হতে পারে ।
১০. ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তার থেকে দূরে থাকুন ।
১১. খোলা বোতল থেকে অথবা ছাঁকুনি ছাড়া পানি পান করবেন না ।
১২. আপনার বাড়ি যদি মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঐ বাড়িতে আর ঢুকবে না ।
১৩. বিশুদ্ধ পানি, খাদ্য ও সাধারণ ঔষধ সাথে রাখুন ।
১৪. কখনও ক্ষতিগ্রস্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং-এ ঢুকবেন না ।
১৫. আশেপাশে কী হয়েছে দেখার জন্য রাস্তায় হাঁটবেন না ।
১৬. উদ্ধারকর্মীদের গাড়ি/যন্ত্রপাতি চলাচলের জন্য আপনার পাশের রাস্তা পরিষ্কার রাখুন ।

চ. এ মুহূর্তে সরকারের করণীয় কী:

১. প্রতি গ্রাম, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে একটি ভূমিকম্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের শাখা খুলতে হবে।

২. অনতিবিলম্বে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে ভূমিকম্প-পরবর্তী তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্য সক্রিয় করতে হবে।

৩. প্রধান হাসপাতালগুলোতে ভূমিকম্প-পরবর্তী চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. প্রতি গ্রাম, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে আগাম পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রীর ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিংগুলো থেকে জনসাধারণের বসবাস ও আনাগোনা বন্ধ রাখতে হবে। সম্ভব হলে ঐ বিল্ডিংগুলো পরিত্যক্ত ঘোষণা করে সীল করে দিতে হবে।

৬. কর্ণফুলি ও হালদা নদীর উপর ৩টি সেতু মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। ভূমিকম্পের ফলে যদি ঐসব সেতু ভেঙে যায়, তাহলে বিকল্প পর্যাপ্ত পরিমাণ ফেরি দিয়ে ভূমিকম্প-পরবর্তীতে আহত লোকজন আনা-নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. প্রতি গ্রামে, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ভূমিকম্প-পরবর্তী উদ্ধারকাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত উদ্ধারকর্মী ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আগাম মজুদ রাখতে হবে।

৮. প্রতি উপজেলাা ও জেলা পর্যায়ে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৯. রেডিও, টেলিভিশন ও দৈনিক পত্রিকাতে ভূমিকম্পের আগে ও পরে করণীয় তথ্যাদি প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. তৈলশোধনাগারগুলোকে অনতিবিলম্বে ভূমিকম্পরোধক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১. চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে অবস্থিত অবকাঠামো যেমন: জিনিষপত্র উঠানামার ক্রেন, কনটেইনার হ্যান্ডেলিং যন্ত্রপাতি, গোডাউন ইত্যাদির ভূমিকম্পরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২. বিমান-বন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ার ও নিয়ন্ত্রণকক্ষ ভূমিকম্পরোধক করতে হবে।

১৩. দেশের প্রায় ব্যাংকের প্রধান ও শাখাগুলো ভূমিকম্প ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং-এর মধ্যে অবস্থিত। অনতিবিলম্বে প্রত্যেক ব্যাংকের প্রধান অফিস ও শাখাগুলোর সকল তথ্যাদি, দলিলাদি, রেকর্ডসমূহের এক কপি নিরাপদে সংরক্ষণের নির্দেশ দিতে হবে যেন কোনো ধরনের মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন না হয়।

১৪. দেশের গ্যাস ও বিদ্যুৎ লাইনের নিয়ন্ত্রণকক্ষগুলোতে সার্বক্ষণিক সর্তকতা বজায় রাখার নির্দেশ দিতে হবে।

১৫. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের সার্বক্ষণিক সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিতে হবে।

১৬. ভূমিকম্প থেকে বাঁচার জন্য গ্রামে, মহল্লায়, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে নির্দেশাবলী সম্বলিত পোস্টার ও পুস্তিকা প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৭. পর্যায়ক্রমে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যদের ভূমিকম্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হবে।

১৮. ভূমিকম্প-পরবর্তী দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। যেমন: খেলার মাঠ, স্টেডিয়াম, পার্ক, খোলা মাঠ ইত্যাদি ভূমিকম্প-পরবর্তী আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

১৯. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর ইত্যাদি আগাম জনসাধারণের কাছে জানাতে হবে।

২০. চট্টগ্রাম শহর ও তার আশেপাশের স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা ভবনগুলো অত্যন্ত ভূমিকম্প ঝুঁকিতে আছে। অনতিবিলম্বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমিকম্প-নিরাপদ ভবন তৈরির ব্যবস্থা নিতে হবে।

২১. যে সব হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবনগুলোর ভূমিকম্প-প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেই অনতিবিলম্বে উক্ত ভবনগুলোর ভূমিকম্প-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২২. শিল্পকারখানাগুলো বিশেষ করে যে ভবনগুলোতে গার্মেন্টস্ শিল্প অবস্থিত, সে গুলো মোটেও ভূমিকম্প প্রতিরোধ পরিকাল্পনা ও ডিজাইন অনুযায়ী করা হয় নাই। অনতিবিলম্বে উক্ত ভবনগুলো থেকে শিল্পকারখানা সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

২৩. সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে বসবাসরত লোকদের নিরাপদ আবাসের ব্যবস্থা করা। যাতে করে ভূমিকম্প-সুনামি সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা হ্রাস পায়।

২৪. গ্রাম অঞ্চলে মাটির বাড়ি, ইটের বাড়ি তৈরির প্রবণতা বেশি। ঐ সব বাড়ি তৈরিতে প্রকৌশলগত নক্সা প্রণয়ন করে বাংলাভাষায় প্রচার ও বিলির ব্যবস্থা নেওয়া।

ছ. ভূমিকম্প বিষয়ক পরামর্শ:

১. বাড়িঘরের ভিত ও কাঠামো শক্ত করে তৈরি করুন এবং তৈরির সাথে মাটির গুনাগুণ পরীক্ষা করুন।

২. বিল্ডিং কোড মেনে চলুন এবং ভবন তৈরির সময় পুর প্রকৌশলীর পরামর্শ নিন।

৩. ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য একাধিক পথ রাখুন।

৪. ভূমিকম্পের সময় ঘরের দরজা খুলে দিন।

৫. নরম মাটি বা গর্তের উপর ভবন নির্মাণ করতে হলে পুরপ্রকৌশলীর পরামর্শ মোতাবেক করবেন।

৬. ভূমিকম্পের সময় দ্রুত বৈদ্যুতিক সুইচ, গ্যাসের চুলা বন্ধ করুন।

৭. হেলমেট কিনে রাখুন ও ভূমিকম্পের সময় মাথায় দিন।

৮. ভূমিকম্পের সময় ঘরে না থেকে পার্শ্ববর্তী খোলা মাঠে আশ্রয় নিন।

৯. ভূমিকম্পের সময় ঘরে থাকলে শক্ত খাট, লোহার টেবিল ইত্যাদির নিচে আশ্রয় নিন।

১০. ভূমিকম্পের সময় গাছের নিচে আশ্রয় নেবেন না।

১১. ভূমিকম্পের সময় দেয়ালনির্ভর ঘরের কোণে আশ্রয় নিন এবং কলামনির্ভর ঘরে কলামের গোড়ায় আশ্রয় নিন।

১২. ভূমিকম্পের সময় সাহস ও মনোবল অটুট রাখুন।

১৩. মনে রাখবেন, ভূমিকম্প মানুষ মারে না কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ ভবনই মানুষের মৃত্যু ঘটায়।

নতুন বিল্ডিং বা কাঠামো নির্মাণ করার ক্ষেত্রেঃ

১. যে কোনো বিল্ডিং-এর নকসা তৈরি করার পূর্বেই স্ট্রাকচারাল নকসার দিকগুলোর নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে সঠিক স্ট্রাকচারাল নকসা না হলে ভূমিকম্পরোধক বিল্ডিং হবে না।

২. বিল্ডিং ডিজাইনের আগেই অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা মাটির গুনাগুণ বিশ্লেষণ ও মাটির ধারণক্ষমতা নির্ভুলভাবে নির্ণয়পূর্বক রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।

৩. বিল্ডিং নির্মাণের সময় অভিজ্ঞ সিভিল পুর ইঞ্জিনিয়ারদের তদারকি রাখতে হবে যাতে গুণগতমান ঠিক থাকে।

৪. সঠিক মানের সিমেন্ট, রড, বালি ইত্যাদি ব্যবহার হচ্ছে কিনা দেখতে হবে। যেন কংক্রিটের মিকসার কোনো অবস্থাতেই ৩০০০ পিএসআই-এর নিচে না আসে। তার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে সাইটে নিযুক্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা কিউব অথবা সিলিন্ডার টেস্ট করাতে হবে।

৫. উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রড পরীক্ষা করে ব্যবহার করতে হবে, যাতে করে রডের ক্ষমতা ৬০,০০০ পিএসআই-এর কাছাকাছি থাকে।

৬. বর্তমানে যে হাবে **ঐ, খ, ঞ, ণ, ট** সাইজের বিল্ডিং-এর নকসা করে দালান তৈরি হচ্ছে এতে ভূমিকম্পের ফলে দুর্ঘটনায় প্রবল ঝুঁকি থাকবে। আপনার বিল্ডিং যতই সোজা ও সরল হবে যেমন মোটামুটি বর্গাকার, আয়তাকার নকসা, ততই ভূমিকম্পরোধ শক্তি বেশি হবে। যদি আপনার বিল্ডিং-এর জায়গামতো নকসা সরল বা সোজা না হয়, তাহলে ত্রি-মাত্রিক ডাইনামিক বিশ্লেষণ করে বিল্ডিং ডিজাইন করতে হবে।

৭. বিল্ডিং-এর প্লান ও এলিভেশানে দুইদিকই সমতা থাকতে হবে।

৮. বেশি লম্বা প্লানের বিল্ডিং করবেন না। দরকার হলে এক্সপানশান ফাঁক রাখতে হবে।

৯. বেশি চিকন ও উঁচু বিল্ডিং-এর পাশ হঠাৎ করে কমাবেন না। যদি কমাতে হয় তাহলে ত্রিমাত্রিক ডাইনামিক বিশ্লেষণ করে ডিজাইন করতে হবে।

১০. বিল্ডিং-এর উচ্চতা/পাশের মাপ ৪ গুণের অধিক করলেই ত্রি-মাত্রিক ডাইনামিক বিশ্লেষণ করে ডিজাইন করতে হবে।

১১. 'সেটব্যাক' বা হঠাৎ করে বিল্ডিং-এর পাশের মাপ কমাবেন না। যদি করতেই হয় তাহলে ত্রি-মাত্রিক বিশ্লেষণ করে ডিজাইন করতে হবে।

১২. জঠিল কাঠামোগত প্লানের জন্য অবশ্যই ত্রি-মাত্রিক ভূমিকম্প বিশ্লেষণ করে ডিজাইন করতে হবে।

১৩. 'শেয়ার ওয়াল' বা কংক্রিটের দেয়াল সঠিক স্থানে বসিয়ে ভূমিকম্পরোধ শক্তির পরিমাণ বাড়াতে হবে।

১৪. সাম্প্রতিক সময়ে যে হারে ঋষধঃ চষধঃব ইঁরষফরহম ংুংঃবস (বিম ছাড়া কলাম ও স্লাব) বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে, তা মাঝারি ধরনের ভূমিকম্প হলেই তার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। সুতরাং বিম, কলাম ও ছাদবিশিষ্ট বিল্ডিং তৈরি করতে হবে।

১৫. প্রত্যেক ইঞ্জিনিয়ারকে "বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড-১৯৯৩" অনুসরণ করে বিল্ডিং-এর প্লান /ডিজাইন করে ভূমিকম্পরোধক বিল্ডিং তৈরি করতে হবে।

১৬. নিচের তলায় পার্কিং-এর জন্য খালি রাখতে হলে, ঐ তলার পিলারগুলো বিশেষভাবে ডিজাইন করতে হবে। প্রয়োজনমতো কংক্রিটের দেয়াল দিয়ে পিলারগুলোতে বেষ্টনী করতে হবে।

১৭. বিল্ডিং-এর 'বিমের' থেকে 'পিলারের' শক্তি বেশি করে ডিজাইন করতে হবে। কমপক্ষে ২০% বেশি করতে হবে।

১৮. মাটির গুণাগুণের ওপর ভিত্তি করে যথাযথ ফাউন্ডেশান প্রকৌশলগতভাবে যাচাই/বাছাই করে ডিজাইন করতে হবে। যাতে করে ভূমিকম্পের সময় 'উশের' মতো মাটি 'উতরাই' উঠে, বিল্ডিং ভেঙে না পড়ে। যদি দরকার হয় প্রকৌশলগতভাবে মাটির শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে।

১৯. ৫ ইঞ্চি ইটের দেয়ালগুলো ভূমিকম্পের জন্য আদৌ নিরাপদ নয়। তাই এই দেয়ালগুলো ছিদ্রযুক্ত ইটের ভিতরে চিকন রড দিয়ে আড়াপআড়ি ও লম্বালম্বিভাবে তৈরি করে 'লিন্টেলের' সাথে যুক্ত করে দিতে হবে। সর্বদিকে 'লিন্টেল' দিতে হবে। বিশেষ করে দরজা/জানালার খোলা জায়গায় চিকন রড দিয়ে ৫ ইঞ্চি ইটের দেয়াল যুক্ত করতে হবে।

২০. মনে রাখতে হবে নতুন বিল্ডিং নির্মাণে ভূমিকম্প প্রতিরোধ নিয়মাবলী প্রয়োগ করলে, শুধুমাত্র ২-৩% নির্মাণ খরচ বৃদ্ধি পায়।

পুরাতন বিল্ডিং / ভূমিকম্পের জন্য ডিজাইন ছাড়া বিল্ডিং-এর ক্ষেত্রেঃ

১. অভিজ্ঞ প্রকৌশলী দ্বারা বিল্ডিংগুলোর ভূমিকম্প-প্রতিরোধ ক্ষমতা পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে আসল নির্মাণ খরচের অতিরিক্ত ৫০-৬০% খরচ লাগতে পারে।

২. অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর পরামর্শে প্রয়োজনমতো প্রকৌশলগতভাবে ব্যবহারযোগ্য বিল্ডিং-এর শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে ভূমিকম্পের সময় ভেঙে না পড়ে।

৩. ব্যবহার-অযোগ্য/ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিংগুলো অনতিবিলম্বে খালি করে ভেঙে ফেলতে হবে।

৪. অনতিবিলম্বে যেসব স্থানে প্রচুর লোকের সমাগম ও অতিপ্রয়োজনীয় যেমন – হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মীয় স্থান, ড্যাম, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন কেন্দ্র, পেট্রোলিয়ামজাত আধার, গুরুত্বপূর্ণ ব্রীজগুলোর প্রকৌশলগত কাঠামোর শক্তি পরীক্ষা করে ভবিষ্যতে ভূমিকম্পের জন্য শক্তি বৃদ্ধি করার প্রকল্প হাতে নিতে হবে।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে নিম্নের প্রস্তাবনা:

১. নতুন বিল্ডিং /কাঠামোর নকসা/ডিজাইন অনুমোদনের পূর্বেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভূমিকম্প-প্রতিরোধী স্ট্রাকচারাল কাঠামো নির্ধারণ করা।

২. অনতিবিলম্বে সংস্কারযোগ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিংগুলো চিহ্নিতকরণ। সংস্কার যোগ্য বিল্ডিং /কাঠামোগুলো ভবিষ্যতে ভূমিকম্পের জন্য যথাযথ প্রকৌশলগত ভাবে শক্তি বৃদ্ধিকরণ ও ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং/কাঠামোগুলো থেকে বসবাসরত মানুষজনের আনাগোনা থেকে বিরত রেখে, তা অনতিবিলম্বে ভেঙে ফেলার নির্দেশ প্রদান করা।

৩. ভূমিকম্পের সময় ও পরে গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন লাইনের নিরাপদ সঞ্চালন ও স্থাপন নিশ্চিতকরণ।

৪. প্রতি জেলাতে একটি করে 'ভূমিকম্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র' নির্মাণ ও পরিচালনাকরণ।

৫. দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাতে কম্পিউটার ডাটা নিয়ন্ত্রিত ভূমিকম্প পরিমাপ নির্ণয়ক যন্ত্র স্থাপন করন।

৬. দেশের প্রকৌশলী, স্থপতি, নকসাকারক ও নির্মাতাদের প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য "ভূমিকম্প বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" স্থাপন।

৭. টিভি, রেডিও ও নিউজপেপারে ভূমিকম্প ও তার পরিণতির প্রতি মনোযোগ/গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য বুলেটিন প্রচারকরণ।

৮ ভূমিকম্পের ব্যাপারে সচেতনতার জন্য স্কুল-কলেজে জাতীয় শিক্ষাসূচির অধীনে ভূমিকম্পের ওপর ছোট পাঠদান অন্তর্ভুক্তকরণ।

এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ভূমিকম্পের ব্যাপরে বিল্ডিং নির্মাণের সাথে জড়িত প্রকৌশলী, স্থপতি, নকসাকারক, নির্মাতা, বাড়ির মালিক ও জনসাধারণকে সতর্ক করা। সরকারকে সতর্ক করা। প্রয়োজনে অপ্রস্তুত অবস্থায় যাতে লোকক্ষয় অন্তত সীমিত রাখা যায়। সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সজাগ ও তড়িৎ সিদ্ধান্ত একান্তভাবে কাম্য। বিষয়টি অতীব জরুরি ও জনগুরুত্বপূর্ণ।

[ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম, অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ (সিভিল ইঞ্জিনিয়রিং), চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমন্বয়ক, ভুমিকম্প প্রকৌশল গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।]

ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে বাংলাদেশ

রেশাদ মহম্মদ ইকরাম আলী

বন্যা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশের মানুষের কাছে অতি পরিচিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও ভূমিকম্পের ভয়াবহতা তেমন পরিচিত নয়। ২০০৪ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর ভূমিকম্পজনিত এশিয়ান সুনামি সারা বিশ্বসহ বাংলাদেশকে ভূমিকম্পের ভয়াবহতা সম্

পর্কে সচেতন করে তোলে। ভূমিকম্প অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতন প্রায়শই সংঘটিত হয় না তবে একটি ভূমিকম্প একটি সভ্যতাকেও একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। ১৮৯৭ সালের গ্রেট ইন্ডিয়ান ভূমিকম্পের পর এদেশ তেমন কোনো বড় ভূমিকম্পের সম্মুখীন হয়নি বলে আজকের প্রজন্মের কাছে ভূমিকম্পের ভয়াবহতা তেমন পরিচিত বিষয় নয়। তবে বর্তমান অবস্থায় ১৮৯৭ সালের মতন ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সময় এসেছে ভূমিকম্প সম্পর্কে জাতীয় এমনকি ব্যক্তি পর্যায়ে সচেতন হওয়ার।

সম্প্রতি বিলহাম এবং অন্যান্যরা (২০০১) গবেষণা করে দেখেছেন হিমালয় অঞ্চলে ন্যূনতম ৮.১ হতে ৮.৩ মাত্রার একটি ভূমিকম্প নিকট ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবী। এমনটি হলে এ অঞ্চলের ৫০ মিলিয়ন লোক ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে আছে। এই ৫০

মিলিয়নের বিরাট অংশই বসবাস করে আগ্নেয় প্লাবনভূমিতে আর বাংলাদেশ এই প্লাবনভূমির অংশবিশেষ। অন্যদিকে বাংলাদেশ, জাপান কিংবা ইন্দোনেশিয়ার মতো ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় অবস্থান না করলেও শুধুমাত্র ভূমিকম্প মোকাবেলায় প্রস্তুতির অভাবের কারণে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ স্থান হিসেবে বাংলাদেশের ঢাকা ও ইরানের তেহরান নগরকে সবচেয়ে ভূমিকম্প ঝুঁকিপূর্ণ নগরী হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই চিহ্নিতকরণের কারণ কী? দুর্বল অবকাঠামো? অধিক জনসংখ্যা? দরিদ্রতা? যার জবাব হল এগুলোর সব কিছুই এবং আমাদের কুটিল অর্থনীতির কারণে দুর্যোগ মোকাবেলা ও উদ্ধার তৎপরতায় রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি পর্যায়ে অসমর্থতা ঢাকা নগরীকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

ভূমিকম্পের ফলে প্রধানত ইট ও কংক্রিটের ঘর-বাড়ি ভেঙে মানুষ চাপা পড়ে। স্বাধীনতার পর ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন নগরীর অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ হয়েছে অপরিকল্পিতভাবে এবং দ্রুত। ফলে একটি মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পও ঢাকা শহরে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটাতে পারে। তাই সচেতন হবার এখনই সময়।

ভূমিকম্প বিষয়ে আলোচনার পূর্বে ভূমিকম্পের কারণ বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবী ৭টি প্রধান প্লেটসহ অসংখ্য ছোট ছোট প্লেটে বিভক্ত। এসকল প্লেট খুবই সক্রিয়। এ প্লেটগুলোর সংযোগস্থলে সাধারণত ভূমিকম্প হয়ে যাচ্ছে। সংযোগস্থল আবার ২ রকম, কোথাও কোথাও প্লেটগুলো বিপরীত দিকে অগ্রসরমান, কোথাও কোথাও একই দিকে অগ্রসরময়। যে সকল স্থানে প্লেটগুলো একই দিকে অগ্রসরময় সে সকল স্থানে বেশি এবং বড় মাত্রায় ভূমিকম্প হয়ে যাচ্ছে। একই দিকে অগ্রসরময় প্লেট বাউন্ডারিকে ট্রেন্স সিস্টেম বলে। বিপরীত দিকে অগ্রসরমান প্লেট বাউন্ডারিকে রিজ সিস্টেম বলে। এ ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বড় বড় ফাটল আছে। এ সকল ফাটলকে ভূতাত্ত্বিক ভাষায় ফল্ট বলে। ফল্ট বরাবর ভূস্তরের হঠাৎ বিচ্যুতির জন্যও ভূমিকম্প হয়ে থাকে। এই ফল্ট বরাবর বিচ্যুতি সৃষ্টি প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি অন্যান্য কারণেও সৃষ্টি হতে পারে। অনেক সময় বাঁধ দিয়ে পানির জলাধার তৈরি করলে পানির অত্যধিক ভারে ভূস্তরের দুর্বল স্থান অথবা ফল্ট বরাবর ভূস্তরের বিচ্যুতির ফলে ভূমিকম্প হয়ে থাকে।

এখন বাংলাদেশের অবস্থান এবং ভূমিকম্পের ইতিহাস বর্ণনা করা যেতে পারে; বাংলাদেশের উত্তর এবং পূর্ব বরাবর ভারত এবং ইউরেশিয়া প্লেটের সংযোগস্থল এবং উত্তর-পূর্ব বরাবর এই ২টি প্লেট একই দিকে অগ্রসরমান। আগেই বলেছি একই দিকে অগ্রসরমান প্লেট বরাবর অধিক এবং শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়ে যাচ্ছে। এই প্লেটস্তরের সংযোগস্থলের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান বিধায় বাংলাদেশ ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে অবস্থিত। প্রশ্ন উঠতে পারে এই প্লেট বাউন্ডারি তো বাংলাদেশের বাইরে তাহলে বাংলাদেশ কেন ঝুঁকির মধ্যে আছে। উত্তর হিসাবে বলা যেতে পারে ১৯৮৮ সালের মেক্সিকো ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল মেক্সিকো সিটি থেকে ৩৫০-৪০০ কিলোমিটার দূরে। এই ভূমিকম্পের ফলে ৪০০ কিলোমিটার দূরে মেক্সিকো সিটির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে অথচ উৎপত্তিস্থলের কাছে তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। তাই বাংলাদেশের

ভৌগোলিক সীমানার বাহিরে যে বাউন্ডারি প্লেট তার ফলে ভূমিকম্প হলে বাংলাদেশের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটতে পারে। গত ১৫০ বছরে বাংলাদেশে ভূমিকম্পের প্রভাবের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে আমরা এর প্রমাণ দেখতে পাব। এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে ৭টি বড় মাপের ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। নিম্নের ছকে ভূমিকম্পের তারিখ, বছর, নাম, মাত্রা ও ঢাকা থেকে এর উৎপত্তির উপকেন্দ্রের দূরত্ব তুলে ধরা হল–

টেবিল: বাংলাদেশকে আঘাত হেনেছে এমন বড় ধরনের ভূমিকম্পের তালিকা-

তারিখ	ভূমিকম্প	মাত্রা	ঢাকা থেকে দূরত্ব কিমি
১০ জানুয়ারি, ১৮৬৯	কাছার ভূমিকম্প	৭.৫	২৫০
১৪ জুলাই, ১৮৮৫	বেঙ্গল ভূমিকম্প	৭.০	১৭০
১২ জুন, ১৮৯৭	গ্রেট ইন্ডিয়ান ভূমিকম্প	৮.৩	২৩০
৮ জুলাই, ১৯১৮	শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্প	৭.৬	১৫০
৩ জুলাই, ১৯৩০	ধুবরি ভূমিকম্প	৭.১	২৫০
১৫ জানুয়ারি, ১৯৩৪	বিহার-নেপাল ভূমিকম্প	৮.৩	৫১০
১৫ আগস্ট, ১৯৫০	আসাম ভূমিকম্প	৮.৫	৭৮০

এ সকল ভূমিকম্প বাংলাদেশকে প্রভাবিত করলেও এগুলোর কোনোটির উৎপত্তির উপকেন্দ্রই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়। ১৮৯৭ সালের ১২ জুলাই তারিখের সংঘটিত ভূমিকম্প পৃথিবীতে অন্যতম ভয়াবহ ভূমিকম্প। এই ভূমিকম্প উৎপত্তির উপকেন্দ্র ছিল ভারতের মেঘালয় রাজ্য। অথচ এ ভূমিকম্পের ফলে সিলেট ময়মনসিংহ রংপুরের ব্যাপক ক্ষতি ছাড়াও বাংলাদেশের সর্বত্র এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। এ সময়ে মোট ১৫৪২ জন লোক মারা গিয়েছিল। তার মধ্যে ৫৪৫ জনই ছিল বাংলাদেশের। এ ভূমিকম্পে ঢাকার আর্মেনিয়ান চার্চেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। তাই বাংলাদেশের বাইরের বড় ধরনের ভূমিকম্প মেক্সিকোর মতন বাংলাদেশেরও ক্ষতিসাধন করতে পারে।

এ সকল বড় মাত্রার ভূমিকম্প ছাড়াও সাম্প্রতিককালের কিছু মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল–

তারিখ	ভূমিকম্প ও স্থান	মাত্রা	ক্ষয়ক্ষতি
৮ মে ১৯৯৭	সিলেট, ২৪.৮৯°ঘ ৯২.২৫°ঊ	৫.৬	সিলেটের বিভিন্ন বিল্ডিং-এ ফাটল দেখা দিয়েছিল
২১ নভেম্বর ১৯৯৭	বান্দরবান, ২২.২৩°উ. ৯২.৭৪°পূ.	৬.০	চট্টগ্রামে বিল্ডিং ধ্বসে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছিল
২২ জুলাই ১৯৯৯	মহেশখালী, ২১.৪৭°উ. ৯১.১০°পূ.	৫.১	মাটির ঘর ধ্বসে ছয় জনের মৃত্যু হয়েছিল

২৭ জুলাই ২০০৩ বরকল রাঙ্গামাটি, ২২.৮২°উ. ৯২.৩০°পূ. ..... কিছু বিল্ডিং-এ ফাটল দেখা দেয়, ২ জনের মৃত্যু হয়েছিল, মাটির ঘর ধ্বংস হয়েছিল।

এ ছাড়াও প্রায়ই বাংলাদেশে মৃদু ভূমিকম্প হয়ে থাকে (সেগুলোর মাত্রা থাকে ৫-এর কম)।

বিশেষজ্ঞরা (১৯৮৭) গবেষণা করে বাংলাদেশে ভূমিকম্প সংঘটিত হবার চার (৪) টি সম্ভাব্য স্থলকে চিহ্নিত করেছেন।

সে সকল সম্ভাব্য ভূমিকম্পের নাম ও মাত্রা নিম্নরূপ–

স্থান	সর্বোচ্চ মাত্রা
আসাম/মেঘালয় ফল্ট/স্থল	৪.০
ত্রিপুরা ফল্ট/স্থল	৭.০
সাব-ডাউকি ফল্ট/স্থল	৭.৩
বগুড়া ফল্ট/স্থল	৭.০

নানা আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত এবং যে কোনো সময় বড় ধরনের একটা ভূমিকম্প এ দেশকে আঘাত হানতে পারে। বিশেষজ্ঞরা ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্প গবেষণা করে দেখেছেন ১০০ বছর পর পর মেঘালয়ের ফল্ট বরাবর এ ধরনের ভূমিকম্প হবার সম্ভাবনা আছে। সে হিসাবে ১৯৯৮ সালের পর যে কোনো সময়ে এ ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে।

একদিকে ছোট ছোট ভূমিকম্প যেমন বড় ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেয় অন্য দিকে ছোট ছোট ভূমিকম্প বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমায়। তবে আমাদের বাংলাদেশে গত ১০০ বছরের বেশি সময়েও তেমন কোনো বড় মাত্রার ভূমিকম্প হয়নি। এই না হবার ফলে প্লেট বাউন্ডারি অথবা ফল্ট বরাবর প্রচুর শক্তি সঞ্চয়ের সম্ভাবনা রয়ে গেছে। এমতাবস্থায় এ শক্তি যখন ভূ-স্তর ধরে রাখার ক্ষমতা হারাবে তখন ভূ-স্তরের বিচ্যুতির ফলে বড় ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে পূর্বেই তো আরও অনেক ভূমিকম্প হয়েছে তবে এখন কেন আমরা ভূমিকম্পের ব্যাপারে এত সচেতনতার কথা বলছি। কথা হল, পূর্বেও ভূমিকম্পের ফলে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে। প্রচুর প্রাণহানি ঘটেছে বাড়িঘর ভেঙে মানুষ চাপা পড়ে। আগে বাংলাদেশে যেমন জনসংখ্যাও কম ছিল এ ধরনের ঘরবাড়ির সংখ্যাও কম ছিল। কিন্তু এখনকার অবস্থা ভিন্ন; ঢাকা শহরের চারদিকে তাকালেই বোঝা যায় সুউচ্চ ইমারতের সংখ্যা কেমনভাবে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে সেই সঙ্গে মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে।

এখন যদি নিজের কাছেই জানতে চাই– ভূমিকম্প হলে এসব ঘরবাড়ি টিকে থাকবে তো? না ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। প্রশ্নের উত্তরটা সহজ নয় এ কারণে যে

আমাদের অধিকাংশ ইমারত বিল্ডিং কোড মেনে ভূমিকম্প সহিষ্ণুভাবে করা হয়নি এমনকি এখনও করা হচ্ছে না। তাই ধরে নিতে পারি ইমারতগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতেই পারে।

এখন সত্যিই যদি ধ্বংস্তূপে পরিণত হয় তবে বিপুল সংখ্যক মানুষ বিল্ডিং-চাপা পরে মারা যেতে পারে। বর্তমানে বিল্ডিং-চাপা পড়ার পাশাপাশি আগুনের ঝুঁকিও কম নয়। জাপানের কোবে শহরে বিল্ডিং ধ্বসে নয় আগুনে পুড়েই ব্যাপক মানুষের মৃত্যু ঘটে। আমাদের বিশেষ করে ঢাকা শহরের প্রতিটি বাড়িই গ্যাসলাইন সংযুক্ত তাই ঢাকায় আগুনের ঝুঁকিও খুব বেশি।

এখন এ ধরনের বড় মাত্রার একটি ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প ঘটলে আমাদের প্রস্তুতি কতটুকু সেটা বিশ্লেষণের চেষ্টা করি; একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সাভারের স্পেকট্রাম গার্মেন্টস বিল্ডিং ধ্বসে যাওয়ার কারণে যে-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানকার ইট-সিমেন্ট সরাতেই প্রায় ১৫ দিন সময় লেগে গিয়েছিল। তাই ঢাকা শহরের শত শত ঘর-বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলে এ ধ্বংসস্তূপ সরাতে কতদিন লাগতে পারে তা কল্পনা করার দুঃসাহসও আমার নেই। এর পরও যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল শহরটি একেবারেই অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠায় রাস্তাঘাট অপ্রশস্ত হওয়াতে দেশের সেনাবাহিনীর ফায়ার ব্রিগেড এমনকি উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনা করাও খুবই কঠিন হবে ।

কিন্তু তাই বলে আমরা তো বসে থাকতে পারি না। ভূমিকম্পের সময় ও তার পরে কিছু নিয়মনীতি মেনে চললে অন্তত প্রাণহানি অনেক অংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

ভূমিকম্পের যথাযথ আগাম সংকেত দেওয়ার কৌশল এখনও বিজ্ঞানীগণ আয়ত্ত করতে পারেননি। তাই ভূমিকম্পের সময় ও তার পরে করণীয় বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া অধিক প্রয়োজন।

[রেশাদ মহম্মদ ইকরাম আলী। প্রকৌশল ভূ-তত্ত্ববিদ। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর।]

এই দেশে প্রতিদিনই ভূমিকম্প ঘটে

তুহিন সমদ্দার

উড়োখবর এক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে অপরাজেয় বাংলাদেশকে কে বা কারা শক্তিশালী এক্সপ্লোসিভ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। ঐ স্থানে মিছিল-পরবর্তী সর্বশেষ সভা করেছিল, এমন একটি প্রগতিশীল সংগঠনের ২/১ জন শীর্ষনেতাকে পুলিশ সন্দেহের ভিত্তিতে ধরতে পেরেছে। তবে এর সাথে আন্তর্জাতিক উগ্রবাদী দলের কোনো সংযোগ নেই এমন কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে এবং যারা এই দেশকে একটি জঙ্গীরাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত ও পরিচিত করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে।

উড়োখবর দুই: সঠিক জায়গায় ভোট না পড়লে ভোটের পরে সকল ভোটারকে 'পেতলের ট্যাবলেট' খাওয়ানো হবে এমন বার্তা কিছু নন-ভোটার লোকজন ভোটারদের বাড়ি বাড়ি ভোটের আগের দিন ভোট চাইতে গিয়ে বলে এসেছে।

উড়োখবর তিন: একমাত্র কাসাভা-ই হতে পারে উত্তরাঞ্চলের মঙ্গাকবলিত এলাকার লোকদের সংকটকালীন খাদ্য!

উড়োখবর চার: মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী ২০২১ সাল নাগাদ ঢাকাকে একটি আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হবে। সড়ক-দ্বীপ ও রাস্তার পার্শ্ববর্তী স্থানে ফোয়ারার সংখ্যা দ্বিগুণ করা হবে।

উড়োখবর পাঁচ: ভর্তিযুদ্ধে হেরে যাওয়া প্রায় দুই লাখ শিশুর বাবা-মাদের সংগঠন 'সে ইয়েস টু চিলড্রেন'-এর সদস্যরা স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে অনশন শুরু করেছে।

উড়োখবর ছয়: অবৈধপথে মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য চট্টগ্রাম থেকে চারশতাধিক আরোহী নিয়ে কয়েকটি বোট ৪৫ দিন পর ভারত মহাসাগরে ডুবে গেছে। বেঁচে-যাওয়া বিরানব্বই জন যাত্রী জানিয়েছে সীমাহীন দুর্ভোগ আর ক্ষুধাতৃষ্ণা সহ্য করতে না পেরে তারা নিজেদের ভেতরের সাতজনকে হত্যা করে তাদের মাংস খেয়ে ফেলেছে।

.....

পুরোখবর:

র‍্যাঙস ভবনটির ধ্বংসস্তূপ দেখে আপামরের মধ্যে যে হা-হুতাশ তৈরি হয়েছিল, এখন সেইখানে তৈরি হওয়া রাস্তাটির দুরবস্থা দেখে মানুষের মনে তারচেয়ে আফসোস আরও বেশি হত নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই আফসোস করার মতো লোকজন ঢাকায় এখন অবশিষ্ট নেই। ঢাকা এখন মৃত নগরী। আক্ষরিক অর্থেই। কারণ তিন কোটি জনগোষ্ঠীর এই মেগাসিটি দুই মাস আগের এক মৃদু ভূমিকম্পে 'ভন্দগ্রাটান্ডদ্রাস্তা' হয়ে গেছে। শব্দটি ধ্বনিগত সাদৃশ্যে রাশিয়ান মনে হলেও এটি একটি স্বসৃষ্ট বাঙলা ধ্বনিবেগ বটে! এ ছাড়া আর কোনো যুৎসই ওয়ার্ড দিয়েই ঐ অবস্থাকে বর্ণনা করা চলে না। তবু বর্ণনাই যেহেতু ঘটনা-বিশ্লেষণের প্রধানতম হাতিয়ার অতএব বর্ণনায় যাই:

স্থানে স্থানে জমাকৃত রাশিরাশি কংক্রিট জাতীয় কুণ্ডলী পার্টি।
বীভৎস ডালপালাসমৃদ্ধ রডসিমেন্টের রক্তাক্ত মহাজোট।
ঐক্যহীন চারদেয়ালের ঘনঘটাপূর্ণ বেমরদ বিবমিষা।
ক্যাবলটিভির মন্দাক্রান্তা তারস্বরের মতো রাস্তা-রেল-রণভূমির অবিশ্রান্ত জমায়েত।
আর মানুষ মানুষ আর ছবিসহ ভোটার তালিকায় জর্জরিত মানুষের লাশের খবর...
কোনো টিভি রিপোর্টার আজ আর সম্প্রচারে ব্যস্ত নয়। কারণ তারাও আছে চিরনিদ্রায় অষ্টবক্র কংক্রিট-কফিনে। দাঁড়কাকের দল মেগাসিটির একমাত্র বেঁচে-থাকা জীব– গত দুই মাসে যারা শুধুমাত্র পচে ফুলে-ওঠা ইন্টেস্টাইন খেতে খেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে!
আপনাদের জ্ঞাতার্থে তবে একটি সুসংবাদ এইখানে রটনা করতে চাই। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও সকল সমালোচনার উর্ধ্বে আমাদের যে সেনাবাহিনী– তাদের আবাসন ও কর্মস্থলগুলো এক্ষেত্রে রক্ষা পেয়েছে। কারণ সকল দল মত ও সমালোচনার উর্ধ্বে এই গৌরবোজ্জ্বল সেনাবাহিনীর দক্ষ ও দ্রুতগামী প্রতিটি সদস্য ঘুম হারাম করে গত দুইটা মাস... ইশশিরে... কি খাটনিটাই না খাটছে লাশগুলিরে দাফন করতে। একদিন দুইদিনের মরা না– পাক্কা দুইমাস ধইরা পইচা ফুইলা ওঠা লাশের পায়ে দড়িবাঁধা কি চাট্টিখানি কথা ? তার উপরে তিনকোটি মানুষের বীভৎস লাশ! আমরা আশাবাদী; আগামী বছর দুয়েকের মধ্যেই সব আবার আগের মতোন সাফসুতরো করে ফেলা যাবে। কারণ অতীতে সকল দল মত ও সমালোচনার উর্ধ্বে এই সেনাবাহিনী

দেশের ক্রান্তিলগ্নে গোটা জাতিকে সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য মাত্র দুটি বছরের অক্লান্ত সাধনায় একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ উপহার দিতে পেরেছে।

কিন্তু ভূমিকম্পের দাপটে দেশে আজ ঘনঘোর সংকট উপস্থিত। জাতি আজ স্বাধীনতা-মুক্তিযুদ্ধের মতো ভয়াবহ তাণ্ডবাকীর্ণ পরিস্থিতির ফেস-টু-ফেস! বক্তৃতা দিতে দিতে পাজামার দড়ি আলগা করে ফেলার সময় এটা নয়। রিকনসিলেশন-সমৃদ্ধ এই মোলায়েম সোন্ধ্যায় সিভিলসোসাইটির লোলচর্মসার ওধ্যাপোকদের টকশো মিস করে এখনি ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ঢাকাকে তা না হলে বাঁচানো যাবে না।

ঢাকা! আমার গৌরবান্নি-তিলোত্তমা-প্রেয়সী। তোমার কাছে থাকার জন্য চাকরি ছেড়ে দিতে পারি আমি ডার্লিং! কিন্তু এ কী হাল হয়েছে তোমার ? যত্রতত্র স্থাপিত বিল্ডিং আর শপিংমলের সেক্সঅ্যাপিল ছাপিয়ে তোমার যে মহীয়সী রূপ- তাতে কে কালি ছিটিয়েছে ? তোমার দিকে আর যায় না তাকানো। সুবিস্তৃত সরণির সমারোহে, শকটের বিশৃঙ্খলায় আর ক্রাউড-মেদুর এই নগরীকে মৃত নগরী লিখতে গিয়ে কবি আলফ্রেড খোকন এই তো সেদিন আত্মহত্যা করতে গিয়ে বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

যদিচ, ভূমিকম্পের ইতিহাসে এই ভূখণ্ড প্রাচীন– কিন্তু এমন উচ্ছাসভরা, মনআনচানকরা মস্ত সর্বনাশ আর কখনো মেলেনি জাতির জীবনে। প্রায় সকল স্তরে দ্বিধাবিভক্ত থাকার পরেও আজ আমরা আবার স্বাধীনতার একই পতাকাতলে দাঁড়িয়ে এই ইন্সিডেন্স মোকাবেলায় সোচ্চার। দেখুন, আমাদের লাশ বহনকারী শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়িগুলোর যুৎসই প্যারেড; পৃথিবীর যে কোনো শান্তিসংস্থানকারী সুসজ্জিত ম্যানপাওয়ারের চেয়ে গর্ববান। তাদের রাতদিন পরিশ্রমে আমরা কি এই মহামারীপূর্ণ দুর্যোগ উৎরাতে পারব না ?

ভূমিকম্পের প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় এনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড... সরি সরি সরি এটা তো গণপূর্তের কাজ, তারা বার্ষিক রিপোর্টে ইতোমধ্যে কী ধরনের বৈদেশিক লগ্নি ও কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হবে– তার একটি এ্যাট-এ-গ্লান্স স্প্রেডশিট ওয়ার্ল্ডব্যাঙ্কে জমা দিয়েছে! প্যাঁপো প্যাঁপো প্যাঁপো ! কোথাও হয়তো এ্যাম্বুলেন্স যাচ্ছে এখন। কোনো ভগ্নস্তূপ থেকে আধমরা কাউকে আবার উদ্ধার করা হল বোধহয়। মানুষগুলোর স্টামিনা দেখুন– পুরো দুইটা মাস ধ্বসে পড়া বিল্ডিংয়ের মধ্যে ঘাপটি মেরে পড়ে রইল– কিন্তু মরল না। অথচ চালের মূল্য কেজিপ্রতি বিশটাকা বাড়তে-না-বাড়তেই সকলের কী নচ্ছার সমালোচনা। আরে মাদারচোদ, আন্তর্জাতিক বাজারের খবর তোরা কোন বালটা রাখিস ? সেখানে যে মদের দাম ফুয়েলের দাম কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, তাই বলে আমরা কি ঐসব কেনাকাটা বন্ধ রেখেছি কখনো ? আর হাউজহোল্ড কমোডিটির দাম তো ফ্লাকচুয়েট করতেই পারে। কত করে বললাম, শালা পাম অয়েলের চাষ কর। এই নে জমি এই নে চারা। হুহ্, থাইল্যান্ডের মতো দেশ শুধু পামঅয়েল বেচে দারিদ্র্যসীমা ঘুচিয়ে ফেলল– আর আমরা পারব না ?

ভূমিকম্পের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাতে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সরাসরি টেলিফোনে যোগ দেবার কথা ছিল জনপ্রিয় কবি, সাংবাদিক, লেখক, কলামিস্ট ও টিভি টকশো স্পেশালিস্ট ডা. জাকির তালুকদার আপনি কি আমাদের কথা শুনতে

পাচ্ছেন...শুনতে পাচেছন...উনি জানিয়েছেন উনি কিছু শুনতে পাচ্ছেন না...চারিদিকে কেবল জমাট ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছেন। শ্রোতাবন্ধু, পরিবর্তে তিনি মুহ্যমান শোকাহত একটি বার্তা পাঠিয়েছেন মাত্র। পুরো কম্পিউটিং সিস্টেম বিকল হয়ে পড়ার কারণে পুরান ঢাকার তারিণী কুমার বসাক লেনের ট্র্যাডেল মেশিনে ছাপা হওয়া একটি দৈনিকে সে খবর আগামীতে আপনারা দেখতে পাবেন। প্রবাসী বাংলাদেশিরা উদ্বেগাকুল হয়ে তাদের পরিজনদের খোঁজখবর করতে চাইছে। কিন্তু কোনো পত্রিকাই তাদের অনলাইন এডিশন আপডেট করেনি বলে সেই পথও আপাতত বন্ধ। যাদের গুগল আর্থ আছে, তারা দেখতে পাচ্ছে ঢাকার স্পাটাল ইমেজ: বুড়িগঙ্গা তার খাতপ্রবাহ পরিবর্তন করে এখন পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে (উহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে যেমন বিবাড়িয়া করা হচ্ছে, তেমনি ব্রহ্মপুত্রকে বিপুত্র করলে কত না সুবিধা হত!) ফলত, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র আবার নতুন করে কল্লোলিনী হতে পারে বলে নদীগবেষণাসূত্রে প্রকাশ। বুড়িগঙ্গার উপরে যে ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজদুটি ছিল– ম্যাচবাক্সের মতো দুমড়ে মুচড়ে কেরানিগঞ্জের কোনাকাঞ্চিতে থুবড়ে আছে দেখা যাচ্ছে। ইটের ভাটার মতো খাঁ খাঁ করছে গুলিস্তান, নিউমার্কেট আর ফার্মগেট এরিয়া। সংসদভবন আর বঙ্গভবনের সামনে দুটি গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এমন সে গর্ত– যা দিয়ে পাতাল অব্দি পৌঁছে যাওয়া যায়। যে সকল পুরাতন রাস্তার নাম পাল্টিয়ে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের নামে রাখা হয়েছিল– ঐ সব রাস্তাই বিশেষত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আড়াআড়ি ফাটল ধরে বেরিয়ে এসেছে খোয়া সুরকি ভূগর্ভস্থ টিএনটির লাইন আর বালির নহর। সংস্কারের নামে এই ধোপদুরস্ত রাস্তাগুলোতেই পিডিবির ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়েরা বেশি ফাঁকি মেরেছেন। একমাত্র ক্যান্টনমেন্ট এলাকাটাই যা অবিকৃত আছে। আর এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে সকল দল মত ও সমালোচনার উর্ধ্বে এই সেনাবাহিনীর দ্বিধাহীন দলনিরপেক্ষতা!!

বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে কোত্থেকে যেন পানি এসে থৈ থৈ। বিদেশি কিছু ডেডিকেটেড কন্সালটেন্ট এর মধ্যেও পতাকাওয়ালা গাড়িতে অফিস করছেন। তাদের ডুপ্লেক্স ফ্লাটের কমোডের ফ্লাশ কাজ করছে না বলে তাদের সব কাজকর্ম আপাতত বন্ধ। খাওয়াদাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে বেচারিদের। বিষয়টিকে ভূমিকম্পের সমান গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছে ওয়াশিংটন পোস্ট! হেডিং: ডেটলাইন ঢাকা, ওহ শীট্ ! এই রিপোর্টটি প্রকাশের সাথে সাথেই আন্তর্জাতিক মহল নড়েচড়ে বসে। হুম, তাই তো। চমৎকার! ধরা যাক দুয়েকটা ইঁদুর এবার! ভোজবাজির মতো উড়ে আসতে লাগল নতুন নতুন রিহেবিলিটেশন প্রজেক্ট। ডোনার এজেন্সিদের এই তাৎক্ষণিক প্রতুৎপন্নমতিত্বে আমাদের রাজপুরুষবৃন্দরা কৃতজ্ঞতায় একদম নুয়ে পড়লেন। প্লেট টেকটোনিকের টনিক হিসেবে আমরা যেন একটু বুঝেশুনে রোডম্যাপগুলো তৈরি করি এমন পরামর্শ বিদেশি সিসমোলজিস্টরা ইতোমধ্যে আমাদের দিয়ে দিয়েছেন। বিপরীত গোলার্ধ থেকে শুধু রিলিফ ফান্ডই নয়, তার পাশাপাশি বিশেষ-অজ্ঞদের ল্যাপটপ ভর্তি হয়ে গেল শুধু সিচুয়েশন এ্যানালাইসিস, বেজলাইন সার্ভে আর স্ট্রাটেজিক প্লানিংয়ে। একটি আন্ত র্জাতিক সাহায্য সংস্থার এশিয়া-প্যাসিফিক-রিজিওনাল অফিসের ডিরেক্টর তার সুইস

হেডকোয়ার্টারকে ই-মেইলে জানালেন: বিশ্বজুড়ে অনুদানের যে মন্দার কবলে আমরা পড়েছিলাম, সেই দুঃসময়কে দ্রুত কাটিয়ে উঠতে সিডরের মতো এবারও এই অঞ্চলে প্রতিপত্তিমূলক কর্মসূচি বহাল রাখায় ঢাকার ভূমিকম্প আমাদের জন্য একটি শুভসম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করেছে; ফলত আরও সত্তর মিলিয়ন ডলারের বিভিন্ন অনুদান দূরপ্রাচ্য ও স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলো থেকে এজেন্সি পাবে বলে আশা করছে।

বাপু ঢাকাকে নিয়ে তুমি যে এমন গর্ব ক্বতিছো– এখানে কী এমন মধু লুকায়ে আচে তা কতি পারো ? তিনকোটি মানুষকে এ্যাকোমোডেট করতে গিয়ে ঢাকা কমবয়সে গোটাচারেক বাচ্চা-বিয়োনো তরুণীর হাড্ডিসার খিটখিটে চেহারা পেয়েছে। তোমার সাথে যে কোনো ডিবেটে আমি প্রমাণ করে দিতে পারি– এই শহর একদিন-না-একদিন পরিত্যক্ত হতই। কেননা সিভিলাইজেশনের ট্রেইটস্ অনুযায়ী মানুষ অতিব্যবহারে ব্যবহারে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্যকে ধ্বংস করে ফেলে। তৈরি হয় নতুন সত্য। এই নতুন সত্য এই যে, ঢাকা ইজ নো মোর ! সেভেনটি ওয়ানের গণ্ডোগোলের সময় ইয়াহিয়া শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করে চেয়েছিল ঢাকাকে ধরে রাখতে; শুধু ঢাকাকে ধরে রাখলে ইস্ট পাকিস্তান ঠেকিয়ে রাখা যাবে, এই মর্মে। হাহ্ পারেনি। চিন্তা করে দেখ, হাইকোর্টের মাজারের সামনে দয়াগঞ্জ থেকে যে খঞ্জ ভিখারি এসে প্রতিদিন সাতশো টাকা ইনকাম করে রাতের বাসে বাড়ি ফিরতো, ইসলামপুর কাপড়ের মার্কেটের সামনের ফুটপাতে আনার আর কমলালেবু বিক্রি করতো যে কেরামত মিয়া, বসিলা বস্তির ওইপাড় থেকে প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় রওয়ানা দিয়ে মিরপুর রূপনগরে প্লান পাশ না-হওয়া গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করত যে মারুফা, আর মদনপুর থেকে বাসে ঝুলে ঝুলে ফার্মগেটে 'এখানে মোবাইলে কথা বলা হয় ২ টাঃ মিঃ' ব্যবসা করতো যে ইউনুস– তারা এখন ফিনিশ। ঢাকাকে বাঁচিয়ে রাখতে এই সমস্ত এলিমেন্ট তুমি পাবে কোথায় ? পুরো শহরসুদ্দ মানুষজন সাফ হয়ে গেলে সেই শহর আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায় এমন শুনেছ কখনো ? এখন ঢাকাকে ফিরে পাওয়ার একটাই পন্থা, অর্থ, পথ, পথ্য– যা-ই বলো। আর সেটা হল: ঢাকাকে নিয়ে, ঢাকার ভেতরের আঢাকা স্তরের স্বপ্নকল্পরূপবাস্তবতা নিয়ে অন্তত গোটাচারেক গল্প লিখে ফেলা। তুমি তাই-ই করতে যাচ্ছো তুহিন সমদ্দার, অন্তত নতুন ভোটাররা পুরনো হয়ে যাওয়ার আগে একবার, শুধু একবার তাদের যথাযোগ্য রায় পোষণের আগপর্যন্ত– এ ছাড়া তোমার করার অবশিষ্ট আর কী-ইবা আছে মহেশ্বর ?

অতএব, গল্প চলুক, চলুক রাত ১২টা থেকে বারোটা না বেজে যাওয়া পর্যন্ত কম কলরেটে কথা বলা। কথা শুধু; কথা কথা কথা কথা কথা...

*শর্ত প্রযোজ্য!
২২ ডিসেম্বর ২০০৮

[তুহিন সমদ্দার। ব্যতিক্রমী ধারার গল্পকার। বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত।]

ভূমিকম্প ও সুনামি ঝুঁকিতে বাংলাদেশ

আ ফ তা ব আ ল ম খা ন / অ নু বা দ ফ রী দু ল আ ল ম

বাংলাদেশ বড় ধরনের ভূমিকম্প-ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে– এর কারণ হল এ দেশটির অবস্থান হচ্ছে সক্রিয় প্লেট-সাংঘর্ষিক অঞ্চলে। কখন এবং কোথায় এ ধরনের বড়মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানবে তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যাবলী সাক্ষ্য দেয় যে বিগত ২৫০ বছরে বাংলাদেশ অঞ্চলে ৭ থেকে ৮ মাত্রার চারটি বড়মাত্রার ভূমিকম্প এবং ৮ থেকে ৯ মাত্রার একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে।
এগুলো হচ্ছে– ১. ১৭৬২ সালের 'বেঙ্গল-আরাকান' ভূমিকম্প, ২. ১৮৮৫ সালের মানিকগঞ্জ ভূমিকম্প, ৩. ১৮৯৭ সালের আসামের মহা-ভূমিকম্প, ৪. ১৯১৮ সালের শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্প, এবং ৫. ১৯৩০ সালের ধুবড়ি ভূমিকম্প। এই ভূমিকম্পগুলোর কারণে সম্পদ ও প্রাণের ব্যাপক হানি ঘটে। এই ভূমিকম্পগুলো বঙ্গীয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের সমূহ এলাকায় ভূমিরূপের ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে, যার মধ্যে রয়েছে– ভূমি কাত হয়ে দেবে যাওয়া, ভূমিধ্বস ঘটা এবং নদীগুলোর গতিপথ পরিবর্তিত হওয়া ইত্যাদি।

এটা স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত সত্য যে ভূমিকম্পের কারণে সক্রিয় স্তরচ্যুতি ফাটলের কেন্দ্রবিন্দু থেকে ১০-১৫ কিমি ব্যাসার্ধ অঞ্চল জুড়েই সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি ঘটে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে অর্থাৎ বঙ্গীয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে বেশ কিছু সক্রিয় স্তরচ্যুতির এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– তিস্তা ফল্ট, করতোয়া ফল্ট, বগুড়া ফল্ট, ধলেশ্বরী-বুড়িগঙ্গা ফল্ট, ডাউকি ফল্ট, সুরমা-সারি ফল্ট, শাহজীবাজার ফল্ট, লালমাই ফল্ট, সীতাকুণ্ড ফল্ট, সীতাপাহাড় ফল্ট, কলাবুনিয়া ফল্ট, বান্দরবান ফল্ট এবং টেকনাফ ফল্ট। ভূতাত্ত্বিক বিচারে এ কথা বলা যায় যে, এই স্তরচ্যুতি বা ফল্টগুলো বড়মাত্রার ভূমিকম্প চলাকালীন সময়ে ভয়ানক বিপদের সৃষ্টি করতে পারে– এই ফল্টগুলো পার্শ্ববর্তী বিশাল এলাকায় ভূমিরূপের ব্যাপক ওলটপালট ও ফাটল ধরাতে সক্ষম। ক্ষয়ক্ষতি কতটা হবে তা নির্ভর করবে অনেকগুলো ভূতাত্ত্বিক উপাদান যথা– মাটির প্রকৃতি, ভূ-ত্বরণ, ভূ-বিবর্ধন, ভূমির নমনীয়তা ও তরল হবার মাত্রা (LIQUEFACTION) এবং গ্রাউন্ড ফ্রিকুয়েন্সি (GROUND FREQUENCY) ইত্যাদি বিষয়ের ভিত্তিতে।

২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বরের ভয়াবহ সুনামি ঘটে যাওয়ার পরে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই যে প্রশ্নটি উঠে এসেছে তা হচ্ছে ভবিষ্যতের কোনো সুনামিতে বাংলাদেশ কী পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সংরক্ষিত রেকর্ড থেকে এটা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয় যে, পূর্ববর্তী সুনামি থেকে পরবর্তী সুনামির মধ্যে কোনটি বেশি ক্ষতিকারক হবে কিংবা আদৌ ক্ষতিকারক হবে কি না। ভবিষ্যৎ সুনামি কতটা ভয়ঙ্কর হবে তা অনুমান করাও সম্ভব নয় রেকর্ডের বিশ্লেষণের মাধ্যমে। বাংলাদেশের সমুদ্রতটের মহীসোপানের ভূমিরূপ, পানির গভীরতা এবং বঙ্গোপসাগরের টেকটোনিক ফ্রেমওয়ার্কের গঠন ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুনামির ভয়াবহতা নতুন করে নির্ণয়ের প্রয়োজন রয়েছে। সংরক্ষিত রেকর্ডের তথ্যে জানা যায়, ১৭৩৭ সালে ১১ এবং ১২ অক্টোবর রাতে গঙ্গার মোহনায় এক ভয়াবহ হারিকেন ঝড় আঘাত হানে– একই সময়ে কলকাতা শহরে গঙ্গার তীরবর্তী বেশ কিছু ইমারত ভয়াবহ ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যায়। 'জেন্টলম্যানস ম্যাগাজিন (১৭৩৮-১৭৩৯)'-এ প্রকাশিত খবরে জানা যায় এ সময় গঙ্গানদীর পানির উচ্চতা স্বাভাবিকের চাইতে ৪০ ফুট উপরে উঠে গিয়েছিল। ১৭৬২ সালের ২ এপ্রিল আরেকটি ভয়ানক বিধ্বংসী ভূমিকম্প গোটা বঙ্গীয় অঞ্চলে আঘাত হানে– তখন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বঙ্গোপসাগরের পূর্বতটের উত্তরাঞ্চলের এলাকাগুলো।

এই ভূমিকম্পে সৃষ্ট বিভিন্ন ফাটল থেকে বিপুল পরিমাণে পানি এবং কাদা উৎক্ষিপ্ত হয়। উপকূলের বাকেরচনক নামক একটি অঞ্চলে ২০০ মানুষ এবং অনেকগুলো গবাদিপশুসহ একখণ্ড ভূমি সোজাসুজি সাগরের অতলে ডুবে যায়। 'বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, চট্টগ্রাম, ১৯৭৫'-এ পরিবেশিত তথ্যে বলা হয়েছে, এ-সময় চট্টগ্রামের ৬০ মাইল দূরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে চেদুয়া দ্বীপটি ২২ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাসে চিরতরে সাগরের বুকে হারিয়ে যায়। তবে এ সকল সংরক্ষিত রেকর্ডের ভিত্তিতে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা যাবে না যে, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল সুনামিপ্রবণ এলাকা।

কোনো-একটি বিশেষ এলাকা সুনামি কবলিত হবে কি না– এটা নির্ণয় করতে হলে সুনামির উৎপত্তি-বিষয়ে কিছু তথ্য পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। সুনামি হচ্ছে এক ধরনের সামুদ্রিক অভিকর্ষ-তরঙ্গ– যা কিনা সমুদ্রতলের ভূমিকম্প অথবা সমুদ্রতলের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত কিংবা সমুদ্রতলের ভূমিধ্বসের কারণে সৃষ্ট হতে পারে। যে ধরনের ভূমিকম্প সুনামি ঘটাতে পারে সেই ভূমিকম্প সুনামিজেনিক (TSUNAMIGENIC) ভূমিকম্প বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। সমুদ্রতলের ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ মাত্রার সকল ভূমিকম্প-ই সুনামি ঘটাতে সক্ষম– প্লেটের সাংঘর্ষিক অবস্থানের অধোগমন অঞ্চলে এই ভূমিকম্প বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে যে, সমুদ্রতলের ফাটলসহ অন্যান্য ফাটলের কারণেই বেশিরভাগ জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয় কিন্তু অন্যান্য আরও অনেকগুলো কারণে এ ধরনের জলোচ্ছ্বাস ঘটতে পারে। ১৯২৩ সালে জাপানে যে সুনামি ঘটেছিল তার কারণ ছিল সমুদ্রতলের ভূমিধ্বস। পার্শ্ববর্তী কোনো অঞ্চলে ভূমিতে সংঘটিত ভূমিকম্পের কারণে সাগরের

তলায় এই ভূমিধ্বস সংঘটিত হয়েছিল। সমুদ্রতীরবর্তী পর্বতে সংঘটিত তুষারধ্বস, শিলাচ্যুতি কিংবা ভূমিধ্বস ইত্যাদি কারণে এবং বিশাল কোনো লেক অথবা মানুষ দ্বারা সৃষ্ট পানির বিশাল রিজার্ভার ইত্যাদির কারণেও ভয়াবহ বিধ্বংসী জলোচ্ছ্বাস ঘটতে পারে। ১৯৫৮ সালের ৯ জুলাই আমেরিকার আলাস্কা রাজ্যের লিটুইয়া উপকূলে একটি জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয় যার কারণ ছিল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভূমিতে সংঘটিত ভূমিকম্পের কারণে সৃষ্ট একটি বিশাল ভূমিধ্বস। বিশাল ভূমিখণ্ড সাগরে পতিত হওয়ায় বিপরীত দিকের তটে জলস্ফীতি ঘটে– বিপুল জলরাশি তার চলার পথের সমস্ত কিছু গ্রাস করে নিয়ে তটের অনেক গভীর ও দূরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বি স্তৃত হয়ে ঢুকে পড়ে। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে ইটালিতে যে ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস ঘটে তার কারণ ছিল এরকম– ভায়োন্ট রিজার্ভারে এক বিশাল ভূমিখণ্ড ধ্বসে পড়ে, পরিণামে ভায়োন্ট বাঁধের ওপরের পানি ১০০ মিটারেরও বেশি উপরে উঠে যায়– পিয়েভ নদীর উপত্যকা সম্পূর্ণভাবে তলিয়ে গিয়ে তিন হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটায়।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণেও ভয়াবহ সুনামি ঘটতে পারে। ভূতাত্ত্বিক বিপর্যয়ের সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনাটি ঘটে ১৮৮৩ সালে– জাভা এবং সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যবর্তী সুন্দা জলধারায় ক্রাকাতোয়া দ্বীপের অবস্থান; এই দ্বীপে রয়েছে ২০০০ মিটার উচ্চতায় ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরি– ১৮৮৩ সালের আগস্ট মাস অবধি এই পর্বতচূড়ার আগ্নেয়গিরি বহুবার অগ্নি উদ্‌গীরণ করেছে, বহুবার বহু ভূমিকম্পের সৃষ্টি করেছে। ১৮৮৩ সালের ২৭ আগস্ট ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির চূড়া বিস্ফোরিত হয় আর যে বিপুল পরিমাণ ছাই এবং ঝামাপাথর উৎক্ষিপ্ত হয় তার পরিমাণ হচ্ছে ১৬ ঘনকিলোমিটার– ১৬ ঘনকিলোমিটার বললে হয়তো ব্যাপারটার ভয়াবহতা অনেকের উপলব্ধিতে আসবে না– ঘনমিটারের হিসাবে অঙ্কটা হচ্ছে চার লক্ষ নয় হাজার ছয় শত কোটি ঘনমিটার। যেখানে একটি সুউচ্চ পর্বতসহ একটি গোটা দ্বীপ অবস্থান করছিল– সেস্থানে দেখা গেল সাগরের পানি ২৫০ মিটার গভীর। ফলাফল হিসেবে অনিবার্যভাবেই ঘটল ইতিহাসের ভয়ঙ্করতম সুনামি– সুন্দা জলধারায় চলাচলরত বহুসংখ্যক জাহাজকে ডুবিয়ে দিয়ে বিপুল, বিশাল জলোচ্ছ্বাস ৩৫ মিটার উচ্চতা নিয়ে উপকূলে আঘাত হানল– ১৬৫ টি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে, ৩৬,০০০ মানুষের প্রাণ হরণ করল এই সুনামি।

সুনামি কী পরিমাণে ভয়াবহতা ধারণ করবে সেটা নির্ভর করে উৎক্ষিপ্ত ও আলোড়িত পানির পরিমাণ ও পানির সামনে এগিয়ে চলার গতিবেগের ওপর। সমুদ্রের তলায় যখন কোনো ভূমিধ্বস বা ফাটল সৃষ্টি হয় তখন বিপুল চাপে পানি উপরের দিকে উঠে আসে– প্রচণ্ডবেগে আলোড়িত হতে থাকে পানির উপরিতল। অভিকর্ষজনিত ত্বরণ এবং পানির গভীরতার ভিত্তিতে জলরাশি এসময় বিপুল গতিবেগ প্রাপ্ত হয়। হিসেব করে দেখা গেছে, পানির গভীরতা এবং অভিকর্ষজনিত ত্বরণের যোগফলের বর্গমূলের সমপরিমাণ অঙ্কের গতিবেগ প্রাপ্ত হয় উৎক্ষিপ্ত জলরাশি। নির্দিষ্ট স্থানটির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, পানির ব্যাপ্তি এবং সমুদ্রতলের ফাটলের বিস্তার, প্রসার ও বিশালত্বের ভিত্তিতে সুনামির বিধ্বংসী ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

সুনামি ঘটাতে সক্ষম এমন কোনো ভূমিকম্প অবশ্যই ৮ কিংবা এর বেশি মাত্রার হয়। তবে, অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণের মিলিত পরিণামে ৭ থেকে ৮ মাত্রার ভূমিকম্পও ছোটখাটো সুনামি-র জন্ম দিতে পারে। সুনামি ঘটাতে সক্ষম এমন ফাটল কিংবা স্তরচ্যুতির ঘটনায় এক আকস্মিক প্রবল ধাক্কা ও চাপের উদ্ভব হয়– যার ফোকাল গভীরতা ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে হতে পারে। পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে, ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বরের ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৯.০ সন (৮.২ সা) এবং ফোকাল গভীরতা ১০ কিলোমিটার, সেটি একটি ভয়াবহ সুনামির জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে পক্ষান্তরে ২০০৫ সালের ২৮ মার্চের ভূমিকম্পটি ছিল ৮.৭ সন (৮.১ সা) মাত্রাসম্পন্ন যার ফোকাল গভীরতা ছিল ২১ কিলোমিটার কিন্তু এই ভূমিকম্পটি কোনো সুনামি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি। এই দুটি ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা অঞ্চল। ২০০৬ সালের ১৭ জুলাই জাভা এলাকায় উৎপত্তিস্থল ছিল এমন একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়। শেষে উল্লিখিত ভূমিকম্পটির ফলে আচমকা ধাক্কার ফলে ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়ার মতো ধরনের স্তরচ্যুতি ফাটল উৎপন্ন হয়; কিন্তু প্রথমে উল্লিখিত ভূমিকম্প দুটি উল্লম্ব ধরনের স্তরচ্যুতি ফাটল সৃষ্টি করে। এই ধরনের ব্যতিক্রমী বা অস্বাভাবিক কার্যকারণ ফাটলসৃষ্টিজনিত আন্দোলন বা সুনামি উৎপন্ন হবার মতো ঘটনার জন্য দায়ী। ২০০৬ সালের ১৭ জুলাইয়ের জাভা ভূমিকম্পটি ৭.৭ মাত্রাসম্পন্ন ছিল যার ফোকাল গভীরতা ছিল মাত্র ৬ কিলোমিটার, যে কারণে এটি সুনামি সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়।

সুনামি সৃষ্টি করতে সক্ষম এমন একটি ভূমিকম্পকে সাগরবক্ষের গভীরে সুগভীর পানির নীচে এমন একটি আলোড়ন তুলতে সক্ষম হতে হয় যে আলোড়নটি সাবডাকশন টেকটোনিক এনভায়ারনমেন্ট (SUBDUCTION TECTONIC ENVIRONMENT)-এর আওতায় প্লেট কলিসন মারজিন (PLATE COLLISON MARGIN)-এর কাছাকাছি হতে হয়। এমন একটি আলোড়ন ঘটানোর জন্য প্রয়োজন হয় বিশাল একটি ফাটলের সৃষ্টি করা এবং স্তরচ্যুতির আন্দোলন-আলোড়ন হতে হয় আচমকা ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ঢুকিয়ে দেবার ধরনের– যার মাত্রা থাকবে ৭ মাত্রার অধিকতর এবং ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার ফোকাল গভীরতা সম্পন্ন। শুধুমাত্র সক্রিয় প্লেট অধোগমন অঞ্চলেই আচমকা ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ঢুকিয়ে দেবার ধরনের স্তরচ্যুতি আলোড়নের এ ধরনের ফাটল তৈরি করা সবচেয়ে সম্ভবপর ও সহজগ্রাহ্য।

বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশের উপকূলের মহীসোপানের গঠনপ্রকৃতি, পানির গভীরতা এবং টেকটোনিক ফ্রেমওয়ার্কের (TECTONIC FRAMEWORK) পর্যালোচনা করে ধারণা করা যায় যে বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চল সুনামি সম্ভাবনাবিহীন একটি অঞ্চল। ২০০ কিলোমিটার বিস্তৃত বাংলাদেশের উপকূলের মহীসোপানের উপরের ১০০ কিলোমিটার অংশে ঢালের মাত্রা প্রতি কিলোমিটারে ০.৫ মিটার যা পরবর্তী নিম্নতর অংশের ১০০ কিলোমিটারের প্রতি কিলোমিটারে ২ মিটার ঢালসম্পন্ন। এর পরই শুরু হয়েছে আকস্মিক প্রায় খাড়া ঢাল যা কিনা প্রতি কিলোমিটারে ২০ মিটার ঢালসম্পন্ন। এই খাড়া ঢাল হঠাৎ উত্থিত পানির স্তম্ভকে বাধা দিতে একটি অত্যন্ত

অনুকূল প্রাকৃতিক বাধা। বঙ্গোপসাগরের টেকটোনিক ফ্রেমওয়ার্ক পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে এই উপসাগরে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো অধোগমন টেকটোনিক ক্রিয়াশীল নেই। এই অঞ্চলের আশপাশে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পগুলোর উৎপত্তিস্থল বিশ্লেষণের দ্বারা এটাও উপলব্ধি করা যায় যে সাগরতলে বড় ধরনের আলোড়ন ঘটাতে সক্ষম হয়নি এই ভূমিকম্পগুলো। সাধারণভাবে, প্রাপ্ত তথ্যাবলীর বিশ্লেষণসাপেক্ষে এ কথা অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে বঙ্গোপসাগরীয় বাংলাদেশ উপকূলে সুনামি আঘাত হানবার খুব একটা সম্ভাবনা নেই।

তবে, ১৮ ডিগ্রি উত্তর ৮৭ ডিগ্রি পূর্ব অক্ষাংশে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপমালার সরু একটি বিস্তৃত অংশ বরাবর একটি স্থান চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে– যে স্থানটিতে সমুদ্রতলায় বিশাল ফাটল সৃষ্টি হওয়া সম্ভব যদি অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তিগুলো ভবিষ্যতের কোনো ভূমিকম্পকে অনুকূল সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে– তবে তার ফলে সুনামি সৃষ্টি হবে যা বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানতে সক্ষম হবে। অতএব, বাংলাদেশের উপকূল সুনামি সম্ভাবনাময় নয়– এমন সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একশত ভাগ গ্রহণযোগ্য নির্ধারণ নয়। সাগরের বিশাল বিশাল ঢেউয়ের তুলনায় সুনামি অনেক বেশি দ্রুতগতিসম্পন্ন, এর গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় ৮০০ কিলোমিটার কিংবা প্রতি সেকেন্ডে ০.২ কিলোমিটার– কমপক্ষে ৫০০০ মিটার গভীর পানি সাথে নিয়ে সুনামি অগ্রসর হয়, তবে ভূমিকম্পজনিত কম্পনঢেউ-এর তুলনায় সুনামির গতি সামান্য কম। ভূমিকম্পজনিত কম্পনঢেউয়ের বিস্তারণমাত্রা এবং সুনামি তরঙ্গের অগ্রযাত্রার গতির তারতম্যের কারণেই সুনামির পূর্বাভাস বা সতর্কীকরণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলো অতি দ্রুততার সাথেই ভূমিকম্পের স্থান, বিস্তার, ফোকাল গভীরতা, স্তরচ্যুতিজনিত ফাটলের ধরন ইত্যাদি নির্ণয়ের মাধ্যমে সুনামি সর্তকীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে পারে। কোনো দেশে স্থাপিত ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রসমূহের পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নিবিড়ভাবে কাজ করার অনুকূল কর্মকাঠামো বজায় থাকলে খুব সহজেই ভূমিকম্প-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলসমূহের মানচিত্র তৈরি করা এবং সুনামির পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব– এর জন্য আলাদাভাবে কোনো সুনামি সতর্কীকরণ ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়ে না।

অনুবাদ ফরীদুল আলম

[ড.আফতাব আলম খান। অধ্যাপক, ভূ-তত্ত্ব (জিওলজি) বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এটি তাঁর Earthquake and Tsunami Risk in Bangladesh. প্রবন্ধের অনুবাদ]]

বাংলাদেশে ভূমিকম্প ও সুনামি

সৈয়দ হুমায়ুন আখতার/অনুবাদ অপর্ণা হাওলাদার

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বাংলাদেশ। ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে বঙ্গোপসাগর উপকূলে এর অবস্থান। আকৃতির দিক থেকে এটি মূলত সমতল নিচু ভূমি; ব্যতিক্রম কেবল উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের কিছু পাহাড়ী অঞ্চল। সমুদ্র থেকে এর উচ্চতা খুব কম, উত্তরাঞ্চলে এই উচ্চতা ৯০ মিটারের মতো। দেশটির আকার গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকায় ৭১০ কিলোমিটার লম্বা এবং মূলভূমি পূর্ব-পশ্চিমে ৩৫০ কিলোমিটার। এর সুন্দরবন অঞ্চল ৫ কিলোমিটার চওড়া আর মেঘনা নদীমুখ চওড়ায় গড়ে ৪০ কিলোমিটার।

মানচিত্রে এর অবস্থান উত্তর-পূর্ব ভারতের পাশে। দুটি জংশনের মিলনস্থলে– ইন্ডিয়া-ইউরেশিয়া জংশন যেটি উত্তর হিমালয়ের দিকে গেছে এবং ইন্ডিয়া-মায়ানমার জংশন যেটি পূর্বে মায়ানমারকে ছুঁয়েছে। দুটি জংশনই ইন্ডিয়ার সাথে অবতল আকারে এবং উত্তর-পূর্বে বিস্তৃত। ইন্ডিয়া প্লেটটি উত্তর-পূর্ব অভিমুখে বছরে ৬ সেমি গতিতে ঘূর্ণায়মান।

ভূমিকম্প হওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। এর মধ্যভাগ উত্তরাঞ্চল আর পূর্বাঞ্চলের গঠনপ্রণালী তো ভূমিকম্প পরিমাপক রিখটার স্কেলে ৫-এর বেশি সম্ভাব্য মাত্রা দেখায়। এদেশের ভূমিগঠন প্রণালীর জন্য ভূমিকম্পের সম্ভাবনা অত্যধিক। হিমালয়ের সাথে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নৈকট্য এবং এর পূর্বের প্লেট আকার এই ভূমিকে কম্পনের উপযুক্ত স্থানে পরিণত করেছে। পাকিস্তানে ৭.৬ মাত্রার ভূমিকম্প এবং উত্তর-সুমাত্রার আগ্রাসী সুনামি (সমুদ্র তলে ৯.৩ মাত্রার ভূমিকম্প) বাংলাদেশের জন্য সাবধানবাণী।

অতীতে তো বটেই, বর্তমানেও বাংলাদেশে বহু সর্বনাশী ভূমিকম্প হয়েছে। সবচেয়ে আগে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য যে ভূমিকম্পের কথা ইতিহাস থেকে জানা যায়, তা ১৫৪৮ সালের কথা। এটি খুবই ভয়াবহ আকারের ছিল। এর হিংস্র থাবায় সিলেট ও চিটাগাং অঞ্চল অনেকখানি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এই ভূমিকম্প সম্ভবত আসাম-ত্রিপুরা অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৭৬২ সালে আক্রান্ত হয় চিটাগাং-মায়ানমার অঞ্চল। এই ভয়ংকর ভূমিকম্পটি সমুদ্রের পানির স্বাভাবিক লেভেলকেই বদলে দিয়েছিল। এর কারণে প্রায় ৫০০ জন মানুষ মারা যায় এবং ঢাকা প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতীতে বঙ্গোপসাগর থেকে সৃষ্ট যে সুনামির কথা জানা যায়, তা ২রা এপ্রিল, ১৯৬২ সালের ঘটনা। সেই ভূমিকম্পই সুনামির উৎস ছিল। এই ভূমিকম্পটি সীতাকুণ্ড পাহাড়ী অঞ্চলে

দুটি অগ্নিমুখের জন্ম দেয়; বঙ্গোপসাগরের বহু দ্বীপাঞ্চল ডুবিয়ে দেয় আর বাড়িয়ে দেয় টেকনাফ অঞ্চলের উচ্চতা।

বাংলাদেশের মধ্যভাগ এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ১৮৮৫ সালে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা ইতিহাসে 'বাংলার ভূমিকম্প' নামে পরিচিত। ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ১৮৯৭ সালে আক্রান্ত হয় 'ভারত ভূমিকম্প'-তে। এতে বহু জানমালের ক্ষতি হয়।

বাংলাদেশের ভিতরে এবং এর চারপাশের অন্তঃস্থিত গঠন একে ভূমিকম্পের জন্য আদর্শ স্থানে পরিণত করেছে।

নিম্ন থেকে শুরু করে ক্রমশ উচ্চতা বাংলাদেশকে সুনামির জন্যও সুবিধাজনক জায়গায় পরিণত করেছে। মাত্র ১ মিটার উঁচু সুনামি ঢেউ-ই দক্ষিণ বাংলাদেশের ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল ডুবিয়ে দেবে। এর ফলে জীবন ও সম্পদের প্রচুর ক্ষতি হবে। ২০০৪ সালের সুনামি থেকে বাংলাদেশ নিরাপদ ছিল কেননা সুনামির ঢেউ সেইবার পূর্ব-পশ্চিম দিকে বয়ে গেছে ; ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিহত করা সম্ভব নয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব। এসব দুর্যোগের প্রভাব তার আকার-প্রকার ও ভয়াবহতার নিরিখে বিচারযোগ্য। যদি বা পরিচালনার অবকাঠামোগত শক্তির ওপরে নির্ভর করে– যেমন সরকার ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। ফলে যখন আমরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন সম্ভাব্য সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করি, আমাদের মাথায় তখন ভূমিকম্প এবং উপকূলীয় সমস্যা নিয়েও চিন্তা থাকতে হবে।

প্রাকৃতির দুর্যোগের বিরুদ্ধে একটি দেশের জনগণের রুখে দাঁড়াবার শক্তি প্রধানত তার অবকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পথ-ঘাট এবং চিকিৎসাদ্রব্য দ্রুত পৌছানোর ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। অবশ্য সব সমস্যার সমাধান এক রকম নয়। একেকটির সমস্যার সমাধানের জন্য একেক ধরনের উপাদান প্রয়োজন। যেমন– সুনামিকে প্রতিহত করার জন্য সময় পাওয়া যায় খুব কম। সাইক্লোন বা ঝড়ে যেমন খুব সহজেই দ্রুত মানুষকে জানানো যায়, কিন্তু সুনামিতে তা সম্ভব না। অর্থাৎ প্রতিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হয় আর এই পদক্ষেপগুলো নেওয়ার ক্ষমতা বিশেষভাবে নির্ভরশীল সেই রাষ্ট্রের জনগণের সচেতনতার ওপর আর সচেতনতা সার্বিকভাবে প্রয়োজনীয় শিক্ষার সাথে জড়িত।

এই ধরনের দুর্যোগগুলোর পূর্ববর্তী প্রস্তুতি ব্যবস্থা নিম্নরূপ:

১. দুর্যোগ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান।
২. দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা।
৩. দুর্যোগ হওয়ার সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে বুঝতে পারা।
৪. দুর্যোগের সম্ভাবনা জানার সাথে সাথে জনগণের দ্রুত রক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার তৎপরতা।

৫. দুর্যোগ সম্পর্কে যথাযথ ও সঠিক শিক্ষাদান।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের দুর্যোগের সম্ভাব্য কারণ, ক্ষয়ক্ষতি এবং প্রতিরোধের ওপর যথাযথ শিক্ষা থাকা প্রয়োজন। সঠিক প্রস্তুতির জন্য, তথ্য আদান-প্রদানে গতিশীলতা দরকার। শুধুমাত্র দুর্যোগ প্রতিরোধের পথ নিয়ে গবেষণাই চূড়ান্ত প্রস্তুতি নয়; সেই গবেষণার ফলাফল মাঠ পর্যায়ে যুক্ত সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সব ধরনের জ্ঞাতব্য বিষয় যারা পরিকল্পনা নেবেন, যারা তা বাস্তবায়ন করবেন এবং সাধারণ জনগণ আর অবশ্যই সেই সব মানুষ যারা এই তথ্যকে গতিশীল করবেন তাদের সবার কাছে পৌঁছাতে হবে সঠিক সময়ে। অর্থাৎ সাজানো-গোছানো তথ্যভাণ্ডারকে খুব সহজে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য উপায়ে দ্রুততর সময়ে নিয়ে যেতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রলয়ংকারী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই ব্যবস্থাপনা অবশ্যই সবাইকে সঙ্গে নিয়ে করতে হবে। সবঁস্তরের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণই পারে দুর্যোগকে ঠেকাতে। শিক্ষার পাশাপাশি, এই প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীর নিজ নিজ ক্ষেত্র নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা ও অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান এবং এর আলোকে সুষ্ঠু প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা তৈরি করা।

ভূমিকম্পের কিছু উল্লেখযোগ্য ক্ষতিকর দিক:

১. দেয়াল ও দালান, সেতু ভেঙে পড়া; আসবাবপত্রের পতন, কাচের জানালা ও আয়না ভেঙে যাওয়া:

ভূমিকম্পের অন্যতম একটি ভয়ংকর ঘটনা হল ভগ্নস্তূপের কারণে সৃষ্ট দুর্ঘটনা। কাচের

জানালা ও আয়না ভেঙে যাওয়ায় অনেক সময় বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

ভূমিকম্পের পরবর্তী সময়ে ভুল পদক্ষেপের কারণে পুরো বাড়ি ভেঙে যেতে পারে।

২. বৈদ্যুতিক লাইন: ভূমিকম্পের ফলে বৈদ্যুতিক স্তম্ভ ভেঙে যেতে পারে এবং তার ছিঁড়ে

আগুন লাগতে পারে।

৩. গ্যাসলাইনের ক্ষতি ও দাহ্য পদার্থ:

ভূমিকম্প থেকে সৃষ্ট আগুন বিধ্বংসী ঘটনা ঘটায়। ভেঙে পড়া গ্যাসলাইন থেকে বের

হওয়া গ্যাস এবং কেরোসিন প্রভৃতি অগ্নিসহায়ক পদার্থের কারণে অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা

বেড়ে যায় যা জানমালের ক্ষতি করে। পানির পাইপেরও ক্ষতি হতে পারে যা এই

অগ্নিকাণ্ড রোধে সমস্যা সৃষ্টি করে।

৪. শিলা ও পাহাড়-পর্বত অঞ্চল:

ভূমিকম্পের সময় ভূমির উচ্চতা বেড়ে পাহাড় আকার ধারণ করতে পারে আবার দ্রুত

তা উপত্যকায় পরিণত হতে পারে ।

৫. বাঁধ ভেঙে বন্যা হতে পারে:-

ভূমিকম্প বাঁধকে ক্ষতিগ্রস্ত করে । আশেপাশের অঞ্চলে পানি ঢুকে যায় ও বন্যা হয় ।

৬. সুনামি: সাগরের ঢেউ-এর স্ফীলনে সুনামি হয় । এটি ভূমিকম্পের অন্যতম ভয়ংকর ফল । উপকূলীয় নিম্নভূমি এতে সম্পূর্ণ প্লাবিত হয় ।

ভূমিকম্প থেকে রক্ষার উপায়:

ভূমিকম্পের পূর্ববর্তী সতর্কতা:

বিপদকালীন ব্যবস্থা করে রাখা সম্পূর্ণ পরিবারের জন্য ।

ভূমিকম্পের সময় প্রয়োজনীয় সব জিনিস হাতের কাছে রাখা; যেমন- শিশুখাদ্য, পানি, প্রাথমিক চিকিৎসাদ্রব্য, টর্চ, রেডিও, ব্যাটারি, আগুন নির্বাপক দ্রব্য, কোদাল জাতীয় জিনিস । এবং সময়ে সময়ে পরীক্ষা করে এগুলোর অবস্থান নিশ্চিত হওয়া দরকার ।

বাসার সবাইকে এগুলোর অবস্থান সম্পর্কে জানতে হবে ।

পরিবারের সবাইকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান ও বাড়ি থেকে নির্গমন পথ জানতে হবে । কারণ ভূমিকম্পের পর পর সাহায্য-স্বল্পতার কারণে চিকিৎসক ও উদ্ধারকর্মী না-ও পাওয়া যেতে পারে ।

ইলেকট্রিক সুইচ, গ্যাসলাইন বন্ধের নিয়ম জানতে হবে ।

উঁচু আলমারিতে ভারি বস্তু রাখা যাবে না ।

ঘর, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্র থেকে বিপদকালীন সময়ে দ্রুত বের হওয়ার রাস্তা জানতে হবে ।

চলাচলের রাস্তায় আলমারি ইত্যাদি আসবাব না রাখা, যাতে নির্গমন পথ সহজ থাকে ।

দ্রুত আশ্রয় নেওয়ার সুবিধার্থে বাড়ির নিরাপদ স্থানগুলো জেনে নেওয়া ।

ভারী যন্ত্রগুলো মেঝেতে এবং ভারী আসবাবপত্র দেওয়ালে ঠেকিয়ে রাখা উচিত ।

যদি কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে কোথায় বাড়ির সবার সাথে মিলিত হবে ঠিক করে রাখতে হবে ।

নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে পরিবারের সবাইকে এবং কর্মক্ষেত্রের সবাই মিলে ভূমিকম্পের পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে ।

নিয়মিত সময় ব্যবধানে ভূমিকম্প ড্রিল করতে হবে ।

শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে ভূমিকম্পে করণীয় সম্পর্কে জানাতে হবে ।

বিপদকালীন সময়ে কর্মক্ষেত্রে সবাকে পরিকল্পনা আগেই জেনে রাখতে হবে ।
ভূমিকম্প সম্পর্কে এলাকার সবাইকে জানাতে হবে এবং ভূমিকম্প পরবর্তী ত্রাণ সহায়তার কাজে ট্রেনিং দিতে হবে ।

ভূমিকম্প চলাকালীন সময়ে **বাড়ির অভ্যন্তরেঃ**

১.বাড়ির ভেতরেই শান্ত হয়ে ধৈর্য রক্ষা করা উচিত । ব্যক্তিগত নিরাপত্তাবলয় তৈরি করে নিতে হবে । বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নির্ভর করে এসব আপদকালীন সময়ে আচরণের উপর । বেশির ভাগ দুর্ঘটনাই দ্রুত বের হতে গিয়ে হয় ।

২. সিঁড়ি অথবা দরজার দিকে দ্রুত দৌড়ানো যাবে না । এগুলো ভেঙে মাথায় পড়তে পারে । আর হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে ।

৩. লিফট ব্যবহার করা যাবে না । লিফটের ভিতরে সমস্যা হতে পারে । নিকটের তলাতে লিফটকে থামিয়ে নিতে হবে এবং ভূমিকম্প হলে লিফট থেকে বের হয়ে আসতে হবে ।

৪. নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে । টেবিলের নিচে আঘাত থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় নেওয়া যায় । ভেতরের দেয়ালের পাশে বা দরজার কাছে আশ্রয় নেওয়া যায় । কারণ বেশির ভাগ ক্ষতি বাইরের দেয়াল থেকে হয় ।

৫. বারান্দায় দাঁড়ানো যাবে না কাচের জানালা, আয়না এবং ভারী উঁচু আসবাব থেকে দূরে থাকতে হবে । উঁচু দালানে থাকলে স্তম্ভ থেকে দূরে থাকতে হবে ।

৬. বিছানায় শোয়া অবস্থায় থাকলেই সেখানেই থাকতে হবে । আঘাত থেকে মাথাকে রক্ষা করতে বালিশের সাহায্য নিতে হবে ।

৭. যতক্ষণ কম্পন চলে বাড়ির ভেতরেই থাকা উচিত এবং তখন বের হওয়া যাবে যখন নিশ্চিত জানবেন, আপনি নিরাপদ ।

যদি বাড়ির বাইরে থাকেন

দালান, গাছ, বৈদ্যুতিক লাইন থেকে দূরে খোলা জায়গায় দাঁড়ানো ।
ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকুন, যতক্ষণ কম্পন শেষ না হয় ।

চলন্ত গাড়িতে থাকলে

বিপদকালীন বাতি জ্বালিয়ে গাড়ির গতি কমিয়ে দিতে হবে এবং বৈদ্যুতিক লাইন থেকে দূরে কোনো ও নিরাপদ স্থানে গাড়ি থামাতে হবে ।

আন্ডারপাস, ওভারপাস বা সেতুর কাছে গাড়ি থামানো যাবে না। লক্ষ রাখতে হবে যেন মাথার ওপরে কোনও পাওয়ার লাইন না থাকে।
লাইট নিভিয়ে পার্কিং-এর জন্য ব্রেক কষতে হবে।
কম্পন থামা অবধি গাড়ির ভেতরে অবস্থান করতে হবে।

ভূমিকম্পের পরবর্তী ব্যবস্থা

প্রথমেই দেখতে হবে কারো আঘাত লেগেছে কিনা এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসা করতে হবে। খুব বেশি আঘাতপ্রাপ্ত মানুষকে নাড়াচাড়া করানো উচিত হবে না। যদি-না তার অবস্থা আশংকাজনক হয়।
প্রতিবেশিদের সাহায্যের কথা মাথায় রাখতে হবে কেননা তাদের অনেকের শিশু, বয়োবৃদ্ধ এবং শারীরিক অসুস্থ রোগি থাকতে পারে।
দেয়াশলাই, লাইটার ব্যবহার করা যাবে না আর বাতিও জ্বালানো উচিৎ হবে না যতক্ষণ নিশ্চিত হওয়া যায় যে গ্যাস লিক হয়নি। টর্চলাইট ব্যবহার করা যেতে পারে।
বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ পরীক্ষা করতে হবে।
রেডিও অথবা টিভি চালিয়ে ভূমিকম্প সম্পর্কিত তথ্য জানতে হবে এবং সেই অনুসারে নির্দেশ নিতে হবে। টেলিফোন ব্যবহার কমিয়ে দিতে হবে কেননা এটি অন্যত্র গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান-প্রদানে ব্যস্ত থাকতে পারে।
ক্ষতিগ্রস্ত দালান থেকে দূরে রাখতে হবে।
ভাঙা কাচের টুকরা থেকে বাঁচার জন্য জুতা, গ্লাভস পরে নিতে হবে।
সুনামি হতে পারে; তাই সাবাধানতা অবলম্বনের জন্য জলাঞ্চল থেকে দূরে থাকতে হবে। এমনকি ভূমিকম্পের বেশ কিছু সময় ব্যবধানেও সুনামি হতে পারে।
কোনওভাবেই গুজব ছড়িয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যাবে না। এতে পরিস্থিতির অবনতি হবে।
গুরুত্বপূর্ণ সেবাদানের সুবিধার্থে পথ-ঘাট লোক সমাগম যেন কম হয়। সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। অন্যদের সাহায্য করতে হবে।
সরকারি সংস্থাগুলোকে সাহায্য করতে হবে। পুলিশ এবং দমকল বাহিনীর নির্দেশ মানতে হবে এবং তাদের কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে তবে।

অনুবাদ অপর্ণা হাওলাদার

[ড. প্রফেসর হুমায়ুন আখতার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগে কর্মরত আছেন। এটি তাঁর How safe is Bangladesh from Earthquake and Tsunami প্রবন্ধের অনুবাদ (কিছুটা সংক্ষিপ্ত রূপ)]

বাংলাদেশে ভূমিকম্প-ঝুঁকি: বাস্তবতার মুখোমুখি

তাহমীদ এম. আল-হুসাইনী /
অনুবাদ সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দার

রাজধানীর কোনো গৃহনির্মাণসংস্থা যদি দাবি করেন তাদের ভবনগুলো ৮ রিখটার স্কেল মাত্রার (Magnitude) ভূমিকম্পকেও রুখে দিতে পারবে, তাহলে মনে করতে হবে এ-ধরনের বক্তব্য বিভ্রান্তিমূলক। কারণ ব্যাপক মাত্রার ভূ-কম্পনের যে উৎস সম্পর্কে আমাদের জানা আছে তা কিন্তু ঢাকা নগরী থেকে বেশ দূরে। প্রকৃতপক্ষে কোনো একটা বিশেষ অঞ্চলে ভূমিকম্প-প্রতিরোধী নকশা তৈরির ব্যাপারটা নির্ভর করছে ঐ অঞ্চলে কী পরিমাণ ভূমি-ঝাঁকুনি (আমরা যাকে তীব্রতা বলি) তৈরি হয় তার ওপর; ভূমিকম্পের মাত্রার ওপর নয়। তাই ভূমিকম্পের শক্তি ও তার প্রভাবের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাপারটা বোঝা অতি জরুরি। ভূমিকম্পের মাত্রা (Magnitude) দ্বারা কোনো ভূমিকম্পে কী পরিমাণ শক্তি নির্গত হল তার ধারণা করা যায়। কোনো ভূমিকম্পের মাত্রা ও উৎপত্তিস্থল বিভিন্ন সিসমোগ্রাফিক স্টেশনের ভূকম্পন রেকর্ডিং হতে নিরূপণ করা যায়। ভূমিকম্পের মাত্রার বিভিন্ন স্কেল আছে, তবে সাধারণ মানুষ রিখটার (Richter) স্কেলের সাথে বেশি পরিচিত। ভূমিকম্পের মাত্রা একটি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়, যা সাধারণত ২ থেকে ১০-এর মধ্যে থাকে। ভূমিকম্পের মাত্রার এক ইউনিট (৪.৬-৫.৬) সংখ্যার পার্থক্যের জন্য মোটামুটি ৩০ গুণ শক্তির তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ ভূমিকম্প সংঘটিত হয় ভূ-গর্ভস্থ প্লেটগুলোর সীমান্ত বরাবর। সাধারণত ক্ষয়ক্ষতি শুরু হয় ৫ মাত্রাকে অতিক্রম করলে, তবে তা যদি ৭ মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায় তাহলে তা ডেকে আনে বর্ণনাতীত ধ্বংসযজ্ঞ। যেমন– ১৯৬০ সালে মরক্কোতে ৫.৮ মাত্রার অপেক্ষাকৃত মাঝারি মাপের ভূমিকম্পতে মানুষ মারা যায় ১২ হাজারের মতো, আর ১৯৯৩ সালে ভারতে ৬.৩ মাত্রার ভূমিকম্পতে মানুষ মারা যায় ৩০ হাজার ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি। ভূমিকম্পের মাত্রার উপর ভিত্তি করে এদের শ্রেণীবিন্যাস ও পৃথিবীতে বিভিন্ন মাত্রার ভূমিকম্পের বাৎসরিক গড় সংখ্যা-সংক্রান্ত একটা টেবিল লক্ষ করা যাক–

ভূমিকম্পের ধরন	মাত্রা	বাৎসরিক সংখ্যা
ভয়াবহ/ তীব্র	৮	১
ব্যাপক	৭ –৭.৯	১৭
শক্তিশালী	৬ – ৬.৯	১৩৪

মাঝারি	৫ – ৫.৯	১৩১৯
হাল্কা	৪ – ৪.৯	১৩০০০
মৃদু	৩ – ৩.৯	১৩০০০০
অতি মৃদু	২ – ২.৯	১৩০০০০

কোনো-একটা অঞ্চলে ভূমিকম্পের প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতি শুধুমাত্র এর মাত্রার ওপরই নির্ভর করে না, নির্ভর করে ঐ ভূমিকম্পের থেকে তার দূরত্ব ও সেখানকার ভূমিরূপের ওপর। তাই এর প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টা বোঝাতেই ভূমিকম্পের তীব্রতা (Earthquake Intensity) শব্দটাকে ব্যবহার করা হয়। আর এই তীব্রতা পরিমাপের অতি প্রচলিত স্কেলটির নাম Modified Mercalli Intensity (MMI) Scale যা l থেকে Xll পর্যন্ত পূর্ণসংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সাধারণভাবে কোনো স্থানে ভূমিকম্পের তীব্রতা ঠষ হলে দুর্বল ভবনের দেয়ালে ফাটল দেখা দিতে পারে। তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথে ভবনের ক্ষতির ঝুঁকি বাড়তে থাকবে। তীব্রতা ষঢ বা বেশি হলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হতে পারে।

সম্প্রতি আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ করেছি দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় কত ব্যাপক ধ্বংসাত্মক আর ভয়ংকর ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে। ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর সুমাত্রাতে সমুদ্রের তলায় ৯ মাত্রার ভূ-কম্পনের ফলে সৃষ্টি হয় সুনামি, আঘাত হানে ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, ভারত, থাইল্যান্ড, মালদ্বীপের উপকূলীয় অঞ্চলে–মারা যায় দেড় লক্ষাধিক মানুষ। এ কারণেই প্রথমেই আমাদের নিশ্চিত হওয়া দরকার ভূমিকম্পের আসল উৎস ও তার সম্ভাব্য মাত্রাটা কত। তারপর হিসেব করতে হবে ঐ ভূ-কম্পনের ক্ষতির তীব্রতা কতটুকু। কোনো-একটা জায়গায় ভূমিকম্পের ঝুঁকির বিষয়টা নির্ভর করছে ঐ অঞ্চলে ভূ-কম্পন জনিত নানা ঘটনার ওপর। ২০০৪ সালের ঐ সুনামি এতটাই শক্তিশালী ছিল যা হাজার হাজার মাইল দূরে পূর্ব-আফ্রিকাতেও আঘাত হানে। যদিও বাংলাদেশ এ যাত্রায় সৌভাগ্যবান ছিল তারপরও কিন্তু ঝুঁকিটা রয়েই গেছে। তাই এ ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তার সময় এসেছে। লেখকের মতে বিশেষত বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট শক্তিশালী ভূমিকম্প এবং ভূমিকম্পের ফলে সাগরতলের মাটি ধ্বস (Submarine landslide)-এর কারণ সুনামির সম্ভাবনা গবেষণার মাধ্যমে নির্ণয় করা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, ১৭৬২ সালে চট্টগ্রামের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের একটি শক্তিশালী ভূমিকম্পে উপকূলের উল্লেখযোগ্য ভৌগোলিক পরিবর্তন হয়েছিল।

২০০১ সালে ভারতের ভুজ শহরের ভূমিকম্পের মাত্রা (Magnitude) ৭.৭ থেকে আমাদের শিক্ষা হয়েছে– অপরিকল্পিত নির্মাণকৌশলের কারণে, এমনকি মাঝারি মাপের ভূ-কম্পন থেকেও কী ব্যাপক পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। .১১ম (ম হল অভিকর্ষীয় ত্বরণ) মানের ভূমি-ত্বরণের (Peak Ground Acceleration)-এর ফলে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র (Epicentre) থেকে ২৪০ কি.মি. দূরে আহমেদাবাদ শহরে মাঝারি থেকে উঁচু ভবনগুলোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ

বিল্ডিং কোড অনুসারে ঢাকা ও চট্রগ্রাম অঞ্চলের জন্য এই ভূকম্পনের মান ধরা হয়েছে .১৫ম এবং সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুরের জন্য এই মান .২৫ম ।

বাংলাদেশ, ভারত ও ইউরেশীয় প্লেটের সীমানার ধারে অবস্থানের ফলে ভূমিকম্প-ঝুঁকির মধ্যে অবস্থান করছে। ভারতীয় প্লেটের সাথে ইউরেশীয় প্লেটের সংঘর্ষজনিত কারণে বাংলাদেশ ও এর প্রতিবেশী অঞ্চল ভারত, নেপাল, মায়ানমার এই ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। ১৮৬৯ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই ৬১ বছরে বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে পাঁচটি ৭ মাত্রার বেশি ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১৮৯৭ সালের আসামের শিলং -এর অতি ভয়ংকর ভূমিকম্পের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ৮ মাত্রার ঐ ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল ঢাকা শহর থেকে ২৩০ কিমি দূরে। এর ফলে ঢাকাসহ দেশের অনেক জায়গায় ঘরবাড়ির মারাত্মক ক্ষতি হয়। এরপরই বলতে হবে ১৮৮৫ সালের বেঙ্গল ভূমিকম্প (৭ মাত্রা; ঢাকা থেকে ১৭০ কিমি) ও ১৯১৮ সালের শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্প (৭.৬ মাত্রা, ঢাকা থেকে ১৫০ কিমি)-এর কথা। এ দুটো ভূমিকম্পেরই উপকেন্দ্র ছিল বাংলাদেশের ভিতরে এবং এ সময়ে উপকেন্দ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে বেশ ক্ষতি হয়। তবে মনে রাখতে হবে এই অঞ্চলে প্রায় ৭৫ বছর কোনো বড় মাত্রার ভূমিকম্প হয়নি যার ফলে অদূর ভবিষ্যতে বড় ধরনের ভূমিকম্পের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ভূ-কম্পবিদ অধ্যাপক ব্রুস বোল্ট (ইঁৎপব ইড়ষঃ) আশঙ্কা করেছেন চারটি টেকটনিক উৎস থেকে বাংলাদেশ ভয়াবহ এক ভূমিকম্পের ঝুঁকির মুখে আছে।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্মের মানুষ বড় রকমের কোনো ভূমিকম্পের মুখোমুখি হয়নি। এজন্য হয়তো তারা বেশ স্বস্তিতে আছে। তবে বিগত ১০/১২ বছরে দেশের অভ্যন্তরে ও সীমানা বরাবর বেশ কয়েকটা মাঝারি মাপের ভূ-কম্পনের ঘটনায় সাধারণ মানুষ ও সরকারের টনক নড়েছে। এতে করে ক্ষয়ক্ষতি যা হয়েছে তা মূলত ঐ ভূ-কম্পন উপকেন্দ্রের আশ-পাশের গ্রাম আর শহরাঞ্চলের ভিতরেই সীমিত ছিল। তবে ৫০ থেকে ১০০ কিমি দূরেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯৭, ১৯৯৯ ও ২০০৩ সালে তিনটি ভূ-কম্পনের পরপরই লেখক চট্টগ্রামে তার সহকর্মী ড. এম.এ আনসারীকে নিয়ে পরিস্থিতি দেখতে যান। লেখক সেখানকার ক্ষয়ক্ষতির বেশ কিছু ছবি তোলেন। বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে ১৯৯৭ সালের ২১ নভেম্বর ৬ মাত্রার যে ভূমিকম্প হয় তাতে দেখা গেছে, চট্টগ্রামে নির্মাণাধীন একটি কংক্রিটের কাঠামোর ভবন ধসে গেছে, মারাও গিয়েছিল বেশ কিছু মানুষ। এটা আমাদের নির্মাণত্রুটির একটি জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। এর দূরত্ব ছিল ভূ-কম্পন উপকেন্দ্র থেকে ১০০ কিমি দূরে। এই ভূমিকম্পে বিশেষ করে বান্দরবান অঞ্চলের অনেক ভবনের দেয়ালে ফাটল দেখা যায়, একটি নির্মাণাধীন মাটির বাঁধ ধসে পড়ে। ১৯৯৯ সালের ২২ জুলাই কক্সবাজারের কাছে মহেশখালী দ্বীপে যে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয় তাতে করে গ্রামের বাড়ির মাটির দেওয়ালগুলো শোচনীয়ভাবে ধসে পড়ে। এর মাত্রা ছিল ৫.১। ইটের দেওয়ালে সৃষ্টি হয় ফাটল, খসে পড়ে প্লাস্টার। ২০০৩ সালের ২৭ জুলাই বরকল-রাঙ্গামাটিতে যে

৫.৬ মাত্রার ভূমিকম্প হয় লেখক সেখানে যান। বরকল উপজেলার কলাবুনিয়া গ্রাম সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। এ জায়গাটা রাঙ্গামাটি থেকে স্পিডবোটে দেড় ঘণ্টার পথ। কলাবুনিয়ায় যেসব ইটের স্থাপনা ছিল সেগুলো দেখা গেছে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছে। মাটির দেওয়ালগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। নদী বরাবর দেখা দিয়েছে দীর্ঘ ফাটল। চট্টগ্রাম শহরের পাবলিক লাইব্রেরিতেও দেখা গিয়েছে ফাটল, বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার গেছে নষ্ট হয়ে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে মাঝে মাঝেই মৃদু ভূ-কম্পন ঘটছে যার দরুন জনমনে তৈরি হয়েছে আতঙ্ক আর উদ্বেগ।

ঢাকা বাংলাদেশের মাঝখানে থাকার ফলে চারটি ভূ-কম্পন উৎসের যে কোনোটা থেকে আক্রান্ত হতে পারে। আরেকটা উদ্বেগের ব্যাপার হল ঢাকার খুব কাছে একটা সক্রিয় চ্যুতির (fault) অবস্থান। এটা বোঝা গেছে ২০০১ সালের ১৯ ডিসেম্বর। ৪ মাত্রার বেশি ঐ ভূমিকম্পে মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয় ব্যাপক আতঙ্ক। উঁচুতলার ভীতসন্ত্রস্ত মানুষগুলো তাড়াহুড়ো করে নামতে থাকে। আসলে ঢাকার অতি নিকটে সম্ভাব্য একটা ভূ-কম্পন উৎসের অবস্থানের জন্য ভূমিকম্পের সম্ভাব্য মাত্রা (Magnitude) সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ খতিয়ে দেখার দরকার আছে।

১৯৯৩ সালে প্রণীত বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোডে ভূমিকম্প প্রতিরোধী-নকশার একটা দিক-নির্দেশনা আছে। এতে বাংলাদেশকে তিনটি সিসমিক জোনে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমটা হল উত্তর ও উত্তর-পূর্ব জোন। সিলেট, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রংপুর এই জোনের আওতাভুক্ত। এটাকে বলা হচ্ছে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জোন। দ্বিতীয়টা হল মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় জোন যার মধ্যে পড়ে দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, ঢাকা, ফেনী, চট্টগ্রাম। এটাকে মাঝারি মানের ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। তাছাড়া তৃতীয়টি হল দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে গঠিত সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা।

উপরের এই তথ্যগুলো থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়েছে, আমরা এদেশে মাঝারী থেকে শক্তিশালী মাত্রার ভূমিকম্প-ঝুঁকির মধ্যে বাস করছি। এবং এটা যখন-তখনই ঘটতে পারে। তাই এধরনের কিছু ঘটলে ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতার বিষয়টা আমাদের চিন্তা করার সময় এসেছে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ মোকাবেলায় মানুষ শহরমুখী হওয়ার ফলে গড়ে উঠেছে বহুতল ভবন। আর এসব ভবন গড়ে ওঠার পথে থাকছে না কোনো আইনি তদারকি। ফলে মানুষের সচেতনতার অভাবের ভিতর দিয়েই অনেক ভবন ভূমিকম্পের বিবেচনা মাথায় না রেখে নির্মিত হয়ে চলেছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলে যে যে বিষয়গুলো ভূমিকম্প-ঝুঁকিকে বাড়িয়ে তুলেছে সেগুলোকে মোটামুটি আমরা এভাবে ভাগ করতে পারি–

– সচেতনতার অভাব
– অত্যধিক জনঘনত্ব এবং ভূমিকম্প-প্রতিরোধী নির্মাণ পরিকল্পনার অভাব
– বিল্ডিং কোডের আইনি তদারকির অভাব ও ভূমিকম্প বিবেচনায় নকশা প্রণয়নের অপ্রতুলতা

– নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার ও নির্মাণকৌশলের ত্রুটি
– অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা
– গ্যাস পাইপলাইন কিংবা, সর্ট-সার্কিট থেকে আগুন লাগার সম্ভাবনা ও অপর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা
– ভবনগুলোর মধ্যে এবং রাস্তায় প্রশস্ততার অভাব; ফলে উদ্ধার-তৎপরতা ও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার সুযোগ না থাকা
– জরুরি অবস্থায় সবার দ্রুত বের হওয়ার ব্যবস্থা না-থাকা
– ভূমিকম্পোত্তর নানা তৎপরতা যেমন– উদ্ধার-সরঞ্জাম, প্রশিক্ষিত উদ্ধারকর্মী, চিকিৎসকদল ও চিকিৎসাব্যবস্থা ইত্যাদির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না-থাকা
– অত্যধিক আবশ্যকীয় সার্ভিস যেমন– বিদ্যুৎ-কেন্দ্র, গ্যাস, পানি, সেতু, টেলি যোগাযোগ-কেন্দ্র ইত্যাদির ভূমিকম্প প্রতিরোধক ব্যবস্থা না-থাকা

ঢাকা শহরের ভবনগুলোকে মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। ইটের দেয়ালের তৈরি কাঠামো (un reinforced brick masonry–URM) ও কংক্রিট পিলারের কাঠামো (reinforced concrete frame–RCF)। URM কাঠামোযুক্ত ভবনগুলো ভূমিকম্পের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষ-করে এগুলো যদি চারতলা বা তার বেশি হয় এবং তা যদি ৫ ইঞ্চি দেওয়ালবিশিষ্ট হয় তাহলে এই ঝুঁকির মাত্রা আরো অনেক বাড়ে। ভূমিকম্প-প্রতিরোধী নির্মাণকৌশল না মানলে RCF ভবনগুলোও সমানভাবে ঝুঁকির মধ্যে থাকবে। এর জ্বলন্ত উদাহরণ ভারতের ভুজ ভূমিকম্প। তাছাড়া অর্থনৈতিক কারণটা এর সাথে জড়িত কারণ মান বজায় রেখে নির্মাণকাজ শেষ করা অথবা নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করার ফলে দারুণ একটা ঝুঁকি কিন্তু থেকে যাচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় ১৯৯৯-২০০০ সালে এক বিল্ডিং-সার্ভেতে দেখা যাচ্ছে (সূত্রাপুর, লালবাগ এবং ধানমন্ডিতে সার্ভে করা হয়) পুরনো ঢাকাতে URM ভবনের সংখ্যা অনেক বেশি। যেখানে পুরনো ঢাকার সূত্রাপুর এলাকাতেই প্রায় ৬৫ শতাংশ ভবন টজগ ক্যাটাগরির। অপেক্ষাকৃত নতুন এলাকা পশ্চিম ধানমন্ডিতে এই সংখ্যা ৪২ শতাংশ। লেখক গবেষণায় দেখেছেন ঠষষষ তীব্রতার ভূমিকম্পে ৫ শতাংশ ভবন সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে গুঁড়িয়ে যেতে পারে আর ১৫ শতাংশ ভবনের গুরুতর ক্ষতি হতে পারে। এখানে ঠষষষ তীব্রতার ভূমিকম্পে ঢাকা শহরে যে ভূমিত্বরণ হতে পারে তা মোটামুটি .১৫ম-এর মতো। লেখকের গবেষণায় এই মাত্রার ভূকম্পনের সম্ভাবনা আছে এটা অবশ্য একটি প্রাথমিক সার্ভে, আরো সময়সাপেক্ষ বিস্তারিত সার্ভে এবং বিশ্লেষণে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির উন্নত তথ্য পাওয়া যাবে। প্রকৃতপক্ষে পানির উপর বেলেমাটি দিয়ে ভরাট করে অথবা কোনো নরম জায়গায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলে ভূমিকম্পের ঝুঁকির মাত্রা যায় বেড়ে। এই কারণে মাটির গুণাগুণের জন্য ভূমিকম্পের তীব্রতা অনেক বেড়ে যেতে পারে এবং তা বেড়ে যদি Vlll মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তাহলে তার পরিণাম দাঁড়ায় অত্যন্ত শোচনীয়। লেখকের সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ঢাকা নগরীর কোনো কোনো অঞ্চলের

(যেমন পূর্বাঞ্চল) নরম মাটির কারণে ভূমিকম্পজনিত ত্বরণ (Acceleration) শক্ত মাটির অঞ্চলের তুলনায় ১.৫ গুণ বা আরও বেশি হতে পারে।

ভূমিকম্প মোকাবেলা

ভূমিকম্পকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় কিন্তু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এর ধ্বংসলীলাকে হ্রাস করা যায়। ঘন ঘন সাইক্লোন, টর্নেডো, বন্যা মোকাবেলা তথা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সফলতা দেখালেও ভূমিকম্প মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতিটা নেহাৎই অপ্রতুল। আমাদের এ-ব্যাপারে দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়ার আছে। তবে বিগত কয়েক বছরে কিছু আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে যা ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উভয় দিক দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারও জাতীয় ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনার গুরুত্বের উপর জোর দিচ্ছেন এবং এ-লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগ ভূমিকম্প-বিষয়ক শিক্ষা, গবেষণা এবং পরামর্শদানের সাথে যুক্ত আছে। ১৯৯৩ সালে জাতীয় বিল্ডিং কোড তৈরিতে এই বিভাগ প্রধান ভূমিকা রেখেছে যার মধ্যে আছে একটা সিসমিক জোনের ম্যাপ ও ভূমিকম্প-প্রতিরোধী নকশার নিয়মনীতি। লেখকের উদ্যোগে ২০০২ সালে এই বিভাগ বুয়েটে একটা জাতীয় ভূমিকম্প প্রকৌশল কেন্দ্র (National Centre for Earthquake Engineering) স্থাপনের প্রস্তাব দেয়। USAID-এর অর্থায়নে NCEE, বুয়েট-এর সহিত যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া টেক (Virginia Tech) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকম্প বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। যার আওতায় ভূমিকম্প বিষয়ক সার্ভে প্রশিক্ষণ, সেমিনার/ওয়ার্কশপ, কনফারেন্সে যোগদান, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি, ভূকম্পন পরিমাপক যন্ত্র (Seismograph) প্রাপ্তি, বই/জার্নাল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। ২০০২ সালে বাংলাদেশ আর্থক্যুয়েক সোসাইটি (BES) গঠনের ক্ষেত্রেও বুয়েট মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ২০০৩ সালে তাদের প্রথম সাংগঠনিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সম্ভাব্য ভূমিকম্প মোকাবেলায় মানুষকে প্রস্তুত করে তোলার উদ্দেশ্যে এটি একটি বহুমাত্রিক পেশাজীবীদের জাতীয় সংগঠন। আশা করা যায় এই সংগঠনটি বিভিন্ন পেশার মানুষের মাঝে একটা সেতুবন্ধন গড়ে তুলবে এবং ভূমিকম্পের ঝুঁকি (risk) কমানোর অভিন্ন লক্ষ্য পূরণে সরকারের সাথে একসাথে মিশে কাজ করবে। ইউঝ বিভিন্ন সংস্থার সাথে ইতোমধ্যে বেশ কিছু সেমিনারের আয়োজন করেছে। গঠিত হয়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূমিকম্প গবেষণা কেন্দ্র ও গ্রুপ। এখন দরকার এদেরকে সরকারি পর্যায়ে স্বীকৃতি প্রদান এবং ব্যক্তি ও গ্রুপগুলোর মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা। সম্প্রতি ভূমিকম্প নির্ণয়ক আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপিত হয়েছে এবং সেগুলো বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।

ভূমিকম্প মোকাবেলার জন্য পেশাজীবী ও সরকার উভয়পক্ষেরই সহায়তা দরকার। প্রকৌশলী, স্থপতি, পরিকল্পনাবিদ, ভূ-তত্ত্ববিদ, সমাজবিজ্ঞানী, বে-সরকারি

সংস্থা, গণমাধ্যমের নিকট থেকে সমাধান পাওয়া সম্ভব। পেশাজীবী গ্রুপের মধ্যে সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা মুখ্য সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করতে পারে। সম্ভাব্য ভূমি-ঝাঁকুনি নির্ণয় করতে ইঞ্জিনিয়ার ও ভূ-তত্ত্ববিদেরা একসাথে কাজ করতে পারেন। আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নির্মাতা, শিল্পপতিরা এদের দিতে পারেন সহায়তা। আর সরকারি সহায়তার মধ্যে থাকবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি, আধা-সরকারি সংস্থা যারা পেশাজীবীদের নানা পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে কাজ করতে পারে। তবে একটা বিষয় আগেই পরিষ্কার করতে হবে যে কোন সংস্থার উপর কার নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

ভূমিকম্প মোকাবেলায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে

– গণমাধ্যম, স্কুল-শিক্ষা, ট্রেনিং, প্রকাশনা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে
– সম্ভাব্য ভূমি-ঝাঁকুনি ও মাটির প্রভাব সুষ্ঠু হিসাব-নিকাশ করতে হবে
– বিভিন্ন ভবন ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহের সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতির ব্যাপারটাকে খতিয়ে দেখতে হবে
– বিল্ডিং কোডের নবায়ন করতে হবে, সাথে সাথে বাড়াতে হবে এর আইনি তদারকি
– ভূমিকম্প-প্রতিরোধী নির্মাণকাজ উৎসাহিত করতে এর বীমার প্রতি নজর দিতে হবে
– এই বিষয়ে গবেষণার জন্য গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে
– ব্যক্তিগত পর্যায়ে সবাইকে উৎসাহিত করার জন্য স্বল্প খরচে ভূকম্পন প্রতিরোধী নির্মাণকৌশল চালুর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন
– ইঞ্জিনিয়ার, নির্মাতা, স্থপতি ও নির্মাণকর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে
– ভয়াবহ ভূমিকম্পের সময় গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ যাতে আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে
– ভূমিকম্পের উদ্ধার তৎপরতা বাড়ানোর প্রক্রিয়া উন্নত করতে হবে
– ভূমিকম্পের ভয়াবহতা হ্রাসের জন্য শহরের যাতায়াত ব্যবস্থাসহ যাবতীয় পরিকল্পনা করতে হবে
– নানারকম পেশাজীবী, কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে ভূমিকম্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের এক বৃহৎ পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে

কিছু পরামর্শ

নতুন ভবন তৈরি এবং বিদ্যমান ভবনগুলোর শক্তি বৃদ্ধিকল্পে কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ – ১৯৯৩ সালে প্রণীত বাংলাদেশ বিল্ডিং কোডানুসারে একজন দক্ষ প্রকৌশলী দিয়ে নকশা করাতে হবে। এই নকশাতে নমনীয় স্টিল ব্যবহারের নির্দেশনা আছে। একেবারে কিছু ক্ষতি ছাড়া ভূমিকম্প-প্রতিরোধী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা অর্থনৈতিকভাবে অসম্ভব। ভূমিকম্পে কিছু ক্ষয়ক্ষতি মেনেই নেয়া হয়েছে তবে এটা সম্পূর্ণ ধ্বংসের থেকে জীবন ও সম্পদ বাঁচাতে পারে। উন্নতমানের স্টিল রড (Steelbar) যদি ঠিকঠাক ব্যবহার করা হয় তাহলে সম্পূর্ণ ধ্বসের থেকে বাঁচা সম্ভব।

কংক্রিট বা ইটের শিয়ার ওয়াল (Shear Wall) কংক্রিটের ফ্রেম, ব্রেসড ফ্রেম (braced frame), রিজিড ফ্লোর সিস্টেম (rigid floor system) এবং এদের মধ্যে যথাযথ সংযোগ ভূমিকম্প প্রতিরোধে বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। বিল্ডিং-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সঠিক স্টিলের ব্যবহার বেশ প্রয়োজনীয়। আমেরিকান কংক্রিট ইনস্টিটিউট (ACI) কোডে এ ধরনের ভবন নকশার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও IBC ২০০০ কোড ইত্যাদিতেও এসব পরামর্শ আছে।

যেসব বিল্ডিং অত্যন্ত অপরিকল্পিতভাবে তৈরি হয়েছে সেগুলোকে ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর আর্থকুয়েক ইঞ্জিনিয়ারিং (IAEE) ম্যানুয়েল অনুসারে ভূমিকম্প-প্রতিরোধী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

যেসব বিল্ডিং ভূমিকম্পের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে হয় সেগুলোকে একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে স্ট্রাকচারাল (Structural) অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি এগুলো সঠিক ভূমিকম্পরোধক পরিকল্পনামাফিক তৈরি না-হয়ে থাকে তাহলে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

এরকম বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং-এর উদাহরণ নিচে দেয়া হল–

- পুরোনা টজগ ভবন, ফাটলবিশিষ্ট দেওয়াল এবং কাঠের বিমের উপর ছাদ
- ৫ ইঞ্চি বিশিষ্ট দেওয়ালের টজগ ভবন
- অনিয়মিত লিনটেল (Discontinuous Lintel) বিশিষ্ট বহুতল URM ভবন
- যেসব RCF বহুতল ভবনের নীচতলায় খোলা পার্কিং ব্যবস্থা আছে
- যেসব বহুতল ভবনে বড়/ভারী ক্যানটিলিভার (Cantilever) আছে
- অনিয়মিত আকৃতির (Irregular shape) বহুতল ভবন
- ভর (Mass) ও কাঠিন্যের (Stiffnes) অসম বণ্টন (Irregular distribution) বিশিষ্ট ভবন
- ফ্ল্যাট প্লেট (Flat Plate)/ফ্ল্যাট স্লাব (Flat Slab) বিশিষ্ট ভবন
- সরু উঁচু ভবন
- যে সব ভবনের ছাদে সুইমিংপুল আছে
- যেসব ভবন ভরাট করা অপেক্ষাকৃত নরম মাটির ওপর অবস্থিত

যখন ভূমিকম্প ঘটে

ভূমিকম্পের সময় দেওয়ালের প্লাস্টার খসে, দেওয়াল পড়ে, ছাদ কিংবা ভারী নানারকম জিনিস পড়ে মানুষ আহত কিংবা নিহত হতে পারে। বিল্ডিং ধসে পড়ার জন্য এবং ব্যাপক ঝাঁকুনীর ফলে সর্ট-সার্কিট থেকে আগুন ধরে যেতে পারে। তাছাড়া গ্যাস, স্টোভ ইত্যাদি থেকেও আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে সৃষ্টি হয় ভয়ংকর আতঙ্ক ও উদ্বেগ।

ভূমিকম্পের সময় করণীয়-বর্জনীয় ঘরের ভিতর অবস্থান করলে–

এ সময় থাকতে হবে শান্ত। নীচতলায় থাকলে অতি দ্রুত (৫ থেকে ১০ সেকেন্ডের মধ্যে) খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসতে হবে। এমন জায়গায় দাঁড়াতে হবে যেখানে কোনো বিল্ডিং কিংবা বৈদ্যুতিক খুঁটি না থাকে। সাধারণত ভূমিকম্প ১ মিনিটের কম সময় দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাই যদি বেরিয়ে আসার সুযোগ-না থাকে তাহলে ঘরের ভিতর এমন জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে যেখানে অপেক্ষাকৃত শক্ত কলাম (Piller) আছে অথবা ছোট ঘর যেখানে দুদিকের দেয়াল কাছাকাছি আছে। বারান্দা, বেলকনি, বাহিরের দেয়াল, দরজা, জানালা ইত্যাদি থেকে দূরে অবস্থান নিতে হবে। পারলে কোনো শক্ত টেবিলর নীচে অবস্থান নিলে উপর থেকে কিছু পড়ে আহত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। আলমিরা, আয়না, কাচের জানালা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। ভাঙা কোনো কিছুর দিকে যাওয়া ঠিক হবে না।

ঘরের বাইরে অবস্থান করলে–

নিকটস্থ খোলা জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে। উঁচু চিমনি, ঘরবাড়ি, বেলকনি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট থেকেও দূরে থাকতে হবে কারণ এগুলো শরীরের উপর পড়তে পারে।

ভূমিকম্পের পরবর্তী সময়ে–

টিভি, ফ্রিজ, ইত্যাদি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি বন্ধ রাখতে হবে। গ্যাস বন্ধ রাখতে হবে। মোবাইল ফোন, ব্যাটারিচালিত একটা রেডিও কাছে রাখলে ভালো হয়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ভিড় জমানো ঠিক নয়। জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য রাস্তাঘাট ফাঁকা রাখা দরকার। এ সময় পানি অপচয় করা উচিত নয়। আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে, তাছাড়া মুমূর্ষু ব্যক্তিদের জন্য ডাক্তার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, এবং অসুস্থ মানুষের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। তাছাড়া ভূমিকম্পোত্তর পরিস্থিতিতে আরো ভূ-কম্পন সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে।

শেষ কথা

অর্থনীতি তথা সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ভূমিকম্প একটা মারাত্মক হুমকি। কারণ এ সময় হাজার হাজার ঘর-বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়; জীবনহানি ঘটে অগণিত মানুষের। তাই ভূমিকম্প-ঝুঁকির বিষয়টাকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নিরূপণ করতে হবে। পরে যতদূর সম্ভব এটা থেকে বাঁচার উপায় খুঁজতে হবে।

তাই কালক্ষেপণ না করে শহর ও গ্রামাঞ্চলের জন্য ব্যাপক ও সুষ্ঠু ভূমিকম্প দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। এবং তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের পথে এগোতে হবে। ভূমিকম্প প্রকৌশল গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের উপরে জোর দেওয়া দরকার, যার মাধ্যমে এই দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য দক্ষ কারিগরি সহায়তা পাওয়া সম্ভব হয়। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য

উপযুক্ত শিক্ষা/প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়টা নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিল্ডিং কোড নবায়ন ও উন্নয়ন করতে হবে। দক্ষ পেশাজীবীদের সাথে সরকার ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর যোগাযোগ নিশ্চিত করতে হবে। আর এই ধরনের কর্মকান্ডের সফলতা নির্ভর করছে কারিগরি ও রাজনৈতিক সমাধানের উপর যা সত্যিকার অর্থে অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি এড়াতে ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে। বিভিন্ন সরকারি, বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, একাডেমিক ইনস্টিটিউট, কম্যুনিটি লিডারশিপ এবং গণমাধ্যমের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে যার মাধ্যমে আমাদের সর্বোচ্চ কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন সম্ভব হয়।

অনুবাদ সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দার

[ড.পুরকৌশলী তাহমীদ এম. আল-হুসাইনী অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আর্থক্যুয়েক সোসাইটি। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় লিখে থাকেন। এটি তাঁর Earthquake Risk in Bangladesh: Facing the Reality প্রবন্ধের অনুবাদ।]

প্রধান প্রধান শহরের ভূমিকম্পের ঝুঁকি

মেহেদী আহমেদ আনসারি / অনুবাদ শওকত হোসেন

২০০৩ সালে রাঙ্গামাটিতে অনুভূত ভূমিকম্প বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্বাঞ্চলের শহর ও গ্রামগুলোর "ভূমিকম্প প্রতিরোধহীনতার" দুর্বলতা তুলে ধরেছে। ১৮৯৭ সালে ৮.০ মাত্রার ভূমিকম্প ভারতের (বাংলাদেশসহ) উত্তরপূর্ব অঞ্চলের দালানকোঠার বিপুল ক্ষতি সাধন করে, এতে প্রাণ হারায় ১৫৪২ জন মানুষ। সম্প্রতি বিলহাম প্রমুখ (২০০১) হিমালয় অঞ্চলে এই এলাকায় শক্তি সঞ্চয় এবং ঐতিহাসিক ভূমিকম্প সংঘটনের ভিত্তিতে এখানে বড় মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার বিরাট আশঙ্কার কথা বলেছেন। বর্তমানে এই অঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ১৮৯৭ সালের তুলনায় অন্তত ৫০

গুণ। ঢাকা, কাঠমান্ডু, গৌহাটির মতো শহরগুলোর জনসংখ্যা কয়েক মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। একারণে এই অঞ্চলে একটি বড় ভূমিকম্প বিপুল ক্ষতির কারণ হবে বলে আশংকা করা হয়। ইউনাইটেড নেশনস আইএনডিআর-রেডিয়াস ইনিশিয়েটিভ প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী ঢাকা ও তেহরান সর্বোচ্চ ভূমিকম্প ঝুঁকি-প্রবণ শহর বলে শনাক্ত হয়েছে (কারডোনা প্রমুখ, ১৯৯৯)। ব্যাপক ভূমিকম্প সংঘটিত হলে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোয় ব্যাপক প্রাণহানি ও সম্পদের বিনাশ ঘটতে পারে। বর্তমান গবেষণাকালে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শহরের ভূমিকম্পজনিত বিপর্যয় পর্যালোচনা করা হয় ও মাটির উপাত্ত ও ভূতত্ত্ব অনুযায়ী ক্ষুদ্র এলাকাভিত্তিক মানচিত্র গঠন করা হয়। জিআইএস ভিত্তিক এইসব মানচিত্র প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ, জরুরি দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, সরকারি কর্মকর্তা ও কোনও বিশেষ এলাকার ভূমিকম্পজনিত সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে ভাবিত ব্যক্তিবিশেষের কাজে উপযোগী।

ভূমিকম্পের ক্ষতি ঐতিহাসিক ক্ষতি,

সারণি-১

মাত্রা, প্রাবল্য ও মূলকেন্দ্র থেকে দূরত্বসহ কয়েকটি ঐতিহাসিক ভূমিকম্প তুলে ধরেছে। মাত্রা, প্রাবল্য ও মূলকেন্দ্র থেকে দূরত্বসহ কয়েকটি ঐতিহাসিক ভূমিকম্প

ভূমিকম্পের নাম	সম্ভাব্য উৎসস্থল	মাত্রা	ঢাকায় অনুভূত প্রাবল্য	দূরত্ব (কিমি)
১৮৬৯ কাছার	ত্রিপুরা	৭.৫	৫	২৫০
১৮৮৫ বেঙ্গল	বগুড়া	৭.০	৭	১৭০
১৮৯৭ গ্রেট ইন্ডিয়ান	ডাউকি	৮,১	৮+	২৩০
১৯১৮ শ্রীমঙ্গল	উপ-ডাউকি	৭.৬	৬	১৫০
১৯৩০ ধুবরি	ধুবরি	৭.১	৫+	২৫০

সাম্প্রতিক ক্ষয়ক্ষতি

সারণি-২

মাত্রা, ফোকাল গভীরতা ও মূলকেন্দ্রের সর্বোচ্চ প্রাবল্যসহ কয়েকটি সাম্প্রতিকভূমিকম্প দেখাচ্ছে।

মাত্রা, ফোকাল গভীরতা ও মূলকেন্দ্রে সর্বোচ্চ প্রাবল্যসহ কয়েকটি প্রধান ভূমিকম্প।

ভূমিকম্পের নাম	মাত্রা (তলতরঙ্গ)	ফোকাল গভীরতা	মূলকেন্দ্রের (কিমি) সর্বোচ্চ প্রাবল্য
১৯৯৭ জৈন্তাপুর কাছার	৫.৬	৩৪	৭

১৯৯৭ বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত	৫.৭	৩০	৭
১৯৯৯ মহেশখালী	৪.৪	১০	৭
২০০৩ রাঙ্গামাটি	৫.৫	৩	৭
২০০৮ ময়মনসিংহ	৪.৮	১০	৭

ভূমিকম্পের বিপর্যয়

আনসারি ও শরফুদ্দীন (২০০২)-এর মতে বাংলাদেশের ৪২টি এলাকায় ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির অনুমান করার ক্ষেত্রে দুগ্গাল প্রস্তাবিত পলিমাটির ক্ষয়বিধি প্রয়োগ করা হয়েছে। কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় ভূমিকম্পজনিত বিপর্যয়ের বিবর্তন কেবল সেই বিশেষ এলাকায় (২০০ কিমি ব্যাসার্ধ) ভূমিকম্পের সংখ্যা ১০-এর বেশি ও তল-তরঙ্গ মাত্রা ৪.০-এর সমান বা বেশি হলেই সংঘটিত হয়ে থাকে। ভূমিকম্পজনিত ক্ষয়ক্ষতির মানচিত্রসমূহ ৫০, ১০০, ২০০ বছরের প্রত্যাবর্তন কাল এবং ৫০ বছরের জীবনকালে ১০% বৃদ্ধির সম্ভাবনার ভিত্তিতে আনুভূমিক পিক গ্রাউন্ড অ্যাক্সালেরাশন (পিজিএ) কনটোর ম্যাপ-এ তুলে ধরা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে একটি নতুন জোনিং ম্যাপ প্রস্তাব করা হয়েছে।

নূর প্রমুখ (২০০৫) অনুযায়ী সাতটি এলাকা উৎস নিয়ে বাংলাদেশের জন্যে ০.৩ ডিগ্রি গ্রিড বিরতিসহ বিভিন্ন অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের বিপর্যয় লেখচিত্র গঠন করা হয়েছে। বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে ভূমিকম্পের উৎসস্থল শনাক্ত করার জন্যে সমান বা বৃহত্তর মাত্রার ভূমিকম্পকে বিবেচনা করা হয়েছে। সমান সম্ভাবনা প্রত্যেকটি অঞ্চলে প্রয়োগ করা হয়েছে এই বিবেচনায় যে কোনও উৎস এলাকার যেকোনও অবস্থানে ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার সমান সম্ভাবনা রয়েছে। উৎসসমূহকে উপাদানের সীমাবদ্ধ সংখ্যায় ভাগ করা হয়েছে।

ক্ষয়বিধি ও জোরালো গতিত্বরণ লেখচিত্র

বিপর্যয় বিশ্লেষণের জন্যে প্রাবল্য ও পিজিএ মূল্যভিত্তিক আঞ্চলিক ক্ষয়বিধি আবশ্যক। সাবরি (২০০২) বাংলাদেশ ও আশপাশের এলাকার জন্যে ২৫ টি ভূমিকম্প ও ৯৩ জোড়া উপাত্তভিত্তিক প্রাবল্যভিত্তিক ক্ষয়বিধির প্রস্তাব করেছেন (সমীকরণ ১)।

ও=৬.৭০২+১.২৫৪(গং)- ০.০০১৪ (জ)- ৩.৯৬৬ (ষড়মজ)+/- ০.৯২চ

যেখানে জ কিমি-তে হাইপোসেন্ট্রাল দূরত্ব, গং তলতরঙ্গ মাত্রা এবং ও হচ্ছে প্রাবল্য। ২০০৩ সাল পর্যন্ত ভূমিকম্প পরিমাপের জন্যে বাংলাদেশের কোনও স্ট্রং মোশন অ্যক্সোলেরোগ্রাফ বা অ্যাক্সালেরোমিটার ছিল না।। যমুনা বহুমুখি সেতু কর্তৃপক্ষ (জেএমবিএ) দেশে প্রথমবারের মতো সাতটি ফিল্ড সাইট ও সেতুপৃষ্ঠে অ্যাক্সালেরোমিটার স্থাপন করে। বুয়েটও বর্তমান লেখকের নেতৃত্বে ২০০৬ সালে সারা দেশে পিডব্লুডির অফিসমূহে ৩৫টি স্ট্রং মোশন অ্যাক্সালেরোগ্রাফ (এসএমএ) স্থাপন করেছিল।

সারণি-৩

এই পদ্ধতিতে ধারণকৃত ভূমিকম্পের সারাংশ তুলে ধরেছে। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উপাত্ত সংগ্রহের পর বাংলাদেশের জন্যে পিজিএ-ভিত্তিক ক্ষয়বিধি উদ্ভাবন করা হবে।

সারণি-৩

ভূমিকম্পের ত্বরণ/ সে. ধারণকৃত উপাত্ত	তারিখ নাম	অক্ষাংশ (ডিগ্রি)	দ্রাঘিমাংশ (ডিগ্রি)	মাত্রা (ডিগ্রি)	গভীরতা (সেমি)
বঙ্গোপসাগর আগ্রাবাদ,রাঙ্গামাটি (১) এবং কক্সবাজার	৩০.৫.০৬	২০.৬০ উ	৯১.৯৪ পূ	৪.৭	২৯ ১৬.০
যশোর মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা	৫.৮.০৬	২৩.১০ উ	৮৯.২০পূ	৪-০	১৫ ২৪.০
মিয়ানমার- রহমতগঞ্জ, ভারত কক্সবাজার, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামটি	৩.১১.০৬	২২ উ	৯৩.৩০ পূ	৫.২	৩৩ ৩৪.০
বাংলাদেশ- ভারত (আসাম) সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ	১০.১১.০৬	২৪.৬০ উ	৯২.২০ পূ	৫.০	৩৩ ৩৪.০

ভারত- ২৮.৭.০৭ ২২.৮০ উ ৯২.৬০ পূ ৪.৮ ১৫ ৩২.০
রহমতগঞ্জ,
মিয়ানমার
বান্দরবান,
খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি

কেইস স্টাডি

১৯৯৯ সাথে থেকে ২০০৭ সালের ভেতর বাংলাদেশে যথাক্রমে ঢাকা, সিলেট, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, রংপুর, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার, এই সাতটি শহরের মাইক্রোজোনেশন ম্যাপ গড়ে তোলা হয় ।

সারণি-৪

এইসব ম্যাপ গড়ে তোলার জন্যে ব্যবহৃত উপাত্তসমূহের সারাংশ তুলে ধরেছে ।

সারণি-৪
সাতটি শহরের সারাংশ

শহর	ওয়ার্ডের সংখ্যা	ব্যবহৃত বোরহোল উপাত্তের সংখ্যা	অন্যান্য উপাত্ত	ভূমিকম্প ম্যাপ
ঢাকা	৯০	মোট ২৫৩ ও ৩০ মি. পর্যন্ত ২০	প্রাপ্য স্থানীয় ভৌগোলিক ম্যাপ ও মাইক্রোমিটার ডেটা ভিত্তিক	১৮৯৭ গ্রেট ইন্ডিয়ান লিকুয়েফ্যাকশন
সিলেট	২৭	মোট ১৮৭ ও ৩০ মি. পর্যন্ত ৯	–	১৯১৮ শ্রীমঙ্গল ও লিকুয়েফ্যাকশন ভিত্তিক
রাজশাহী	৩০	মোট ৫০ ও ৩০ মি. পর্যন্ত ৬	–	১৮৯৭ গ্রেট ইন্ডিয়ান লিকুয়েফ্যাকশন ভিত্তিক
ময়মনসিংহ	২১	মোট ৮৭ ও ৩০ মি. পর্যন্ত ১০	–	১৮৯৭ গ্রেট ইন্ডিয়ান লিকুয়েফ্যোকশন ভিত্তিক
রংপুর	১৫	মোট ৭০ ও ৩০ মি. পর্যন্ত ১৮	–	১৮৯৭ গ্রেট ইন্ডিয়ান লিকুয়েফ্যাকশন ভিত্তিক

চট্টগ্রাম ৪১	মোট ১১৫ ও ৩০ মি.	প্রাপ্য স্থানীয়		১৯১২
অ্যাপ্লিকেশন, ল্যান্ডস্লাইড ও				
পর্যন্ত ২৮	ভৌগোলিক ম্যাপ	মান্দালয়	লিকুয়েফ্যাকশন ভিত্তিক	

কক্সবাজার ৫	মোট ৩০ ও	প্রাপ্য স্থানীয়		স্থানীয়
অ্যাপ্লিকেশন ও সবকটাই ৩০ মি. পর্যন্ত		ভৌগোলিক ম্যাপ লিকুয়েফ্যাকশন ভিত্তিক		

উপসংহার

এই গবেষণা বাংলাদেশের কয়েকটি এলাকার সিজমিক মাইক্রোজোনেশন তুলে ধরেছে যেখানে ভূমিকম্পনের প্রতিফলন, ভূমি সম্প্রসারণ, লিকুইফ্যাকশন ও ভূমিধসের গৌণ বিষয়সমূহ প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন বিপর্যয়কে সমন্বিত করার পদ্ধতিটি ওয়েইটেড এভারেজ কৌশলভিত্তিক। জিআইএস-ভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ, জরুরি কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ব্যক্তি, সরকারি কর্মকর্তা ও কোনও বিশেষ এলাকার সিসমিক ক্রিয়ার সম্ভাব্য পরিণামের সাথে সংশ্লিষ্ট যেকোনও ব্যক্তির জন্য উপকারী। কোনও আঞ্চলিক সিজমিক বিপর্যয়ের ফলাফল ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ সাধারণভাবে মাইক্রোজোন ম্যাপ আকারে তুলে ধরা হয় যা উপাত্তসমূহকে বৈজ্ঞানিক মহল থেকে বিপর্যয় ও ঝুঁকি দূরীকরণে সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের পেশাজীবী মহলে স্থানান্তরের কার্যকর পন্থা হিসাবে কাজ করে।

রেফারেন্স

১. আনসারি, এম.এ. ও শরফুদ্দীন, এম. (২০০২) "প্রপোজাল ফর আ নিউ সিজমিক জোনিং ম্যাপ ফর বাংলাদেশে," জার্নাল অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, আইইবি, খ ৩০(২), পৃষ্ঠা

২. বিলহাম, আর., ভি.কে. গৌর ও পি. মোলনার (২০০১), "হিমালয়ান সিজমিক হ্যাযার্ড", সায়েন্স, ২৯৩।

৩. কারদোনা, সি., আর. ডেভিডসন ও সি. ভিলাসিস (১৯৯৯), "আন্ডারস্ট্যান্ডিং আরবান সিজমিক রিস্ক অ্যারাউন্ড দ্য ওঅর্ল্ড," সামারি রিপোর্ট অন দ্য কম্প্যারাটিভ স্টাডি অফ দ্য ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারন্যাশনাল ডেকেড ফর ন্যাচারাল ডিজাস্টার রিডাকশন, রেডিয়াস উদ্যোগ।

৪. দুগ্গাল, আর. (১৯৮৯), "এস্টিমেশন অভ সিজমিক রিস্ক অ্যান্ড ড্যামেজ, অ্যান্ড দেয়ার ইউটিলাইযেশন অ্যাজ ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া," এম. ইঞ্জিনিয়ারিং থিসিস, ইউনিভার্সিটি অফ টোকিও, জাপান ।

৫. নূর, এম.এ., ইয়সিন, এম. ও আনসারি, এম. এ. (২০০৫), সিজমিক হ্যাযার্ড অ্যানালিসিস অফ বাংলাদেশ," বিবরণী, প্রথম বাংলাদেশ ভূমিকম্প সিম্পোজিয়াম, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৪–১৫

৬. রহমান, এম. এস. ও আনসারি, এম. এ. (২০০৭), "স্ট্রং মোশন সিজমিক মনিটরিং সিস্টেম ইন বাংলাদেশ," আইইএসইবি-২-এর বিবরণী, ঢাকা, বাংলাদেশ (অনুষ্ঠেয়) ।

৭. সাবরি, এস. এ., (২০০২), "আর্থকোয়াক ইন্টেন্সিটি-অ্যাটেনিউশন রিলেশনশিপ ফর বাংলাদেশ অ্যান্ড ইটস সারাউন্ডিং রিজিয়ন," এম. ইঞ্জিনিয়ারিং থিসিস, বুয়েট, ঢাকা, বাংলাদেশ ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

লেখক সিএএসআর, বুয়েট, বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ইউএসএআইডি, বাংলাদেশ, খাদ্য ও বিপর্যয় মন্ত্রণালয় ও কেয়ার বাংলাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইউএনওপিএস-এর আর্থিক সহযোগিতার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে ।

অনুবাদ শওকত হোসেন

[ড.মেহেদী আহমেদ আনসারি । প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অভ সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট । লেখক ও গবেষক । বাংলাদেশ আর্থকোয়াক সোসাইটির (বিইএস) প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি জেনারেল, বর্তমান সহ-সভাপতি এবং বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক অফিস ফর আরবান সেফটি (বিএনইউএস)-এর প্রকল্প পরিচালক । এটি তাঁর Seismic Risk for mejor cities of Bangladesh প্রবন্ধের অনুবাদ ।]

ভূমিকম্প গবেষকদের ভাষা তাদের ব্যক্তিগত উন্নয়নের

আ বু ল বা র কা ত

[আজ ৬ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখ। বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতা'র পক্ষ থেকে আমরা মুখোমুখি হয়েছি দেশের অন্যতম প্রগতিবাদী চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব, গবেষক, অর্থনীতিবিদ ডক্টর প্রফেসর আবুল বারকাতের। হালখাতা'র এবারের বিষয় 'বাংলাদেশে ভূমিকম্প'। আজ জনাব বারকাতের কাছ থেকে 'বাংলাদেশে ভূমিকম্প' বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব জানতে চাইব। তিনি জিওলজিস্ট বা পুরকৌশলী (সিভিল ইঞ্জিনিয়র) নন তবু 'ভূমিকম্প' বিষয়ে একটি সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম আমাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। দেখা যাক নানা প্রশ্নের জবাবে তিনি কিভাবে 'বাংলাদেশে ভূমিকম্প' বিষয়ে তার নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করেন। তিনি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে কর্মরত আছেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক।]

হালখাতা

আপনি অর্থনীতির মানুষ, তারপরও 'বাংলাদেশে ভূমিকম্প' বিষয়ে 'হালখাতা'র একটি সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য আপনি আমাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন, এতে বোঝা যায় ভূমিকম্প নিয়ে আপনার এক ধরনের বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। আপনি বলবেন কি 'বাংলাদেশে ভূমিকম্প' বিষয়টি নিয়ে আপনার এই আগ্রহের কারণটা আসলে কী?

আবুল বারকাত

অনেকদিন ধরেই ভূমিকম্প বিষয়টি আমার কাছে একটি অন্যতম দুশ্চিন্তার বিষয়। ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই দুর্যোগ কখন হতে পারে বা এর সম্ভাবনা কতটুকু তা বিজ্ঞানীরা দু'ভাবে জানতে পারেন বলে আমি জানি। একটা হল বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ভূমিকম্পপ্রবণ দেশকে ভূমিকম্পের মাত্রা অনুযায়ী বিভাজন করে থাকেন। এক্ষেত্রে তারা বলেন যে অত্যন্ত ভূমিকম্পপ্রবণ দেশে প্রতি ২/৪ বছর পরপর ভূমিকম্প

হয় এবং তুলনামূলকভাবে কম ভূমিকম্পপ্রবণ দেশে প্রতি পঞ্চাশ বছর পরপর ভূমিকম্প হতে পারে। তবে আমি যতদূর জানি, বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা বাংলাদেশে ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে, এমনকি অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা যারা বাংলাদেশসহ অন্যান্য ভূমিকম্প নিয়ে কাজ করেন তারা প্রতি একশ বা দেড়শত বছর পরপর ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলে থাকেন। তবে এর সাথে আরো একটি বিষয় সম্পর্কিত সেটা হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবে মাটির নিচের কোনো-একটি প্লেট আমাদের দেশের মধ্যে পড়েছে। যেমন উত্তরবঙ্গে আছে, আসামে আছে। আমরা প্রায়ই আমাদের দেশের ভূমিকম্পের কথা শুনে থাকি বা উপলব্ধিও করে থাকি। তবে রিখটার স্কেলে যে পরিমাণ বা যে জায়গায় গেলে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হবে সে জায়গা পর্যন্ত আমরা যাই না। তবে এটা সত্য যে প্রতি একশত বা দেড়শত বছর পর আমাদের দেশে বড় মাপের ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনার কথা বিজ্ঞানীরা বলছেন সেটা বিশ্বাসযোগ্য। তারা যে হিসাবপত্র দিয়ে বলছেন সে হিসাবপত্র অনুযায়ী আগামী পাঁচ, দশ, বা বিশ বছরে পাঁচ বা ছয় রিক্টার স্কেলে বড় মাপের ভূমিকম্প হয়ে যেতে পারে।

হালখাতা

বাংলাদেশের মতো স্থানে রিখটার স্কেলে ৮.০০ এর অধিক পরিমাপের ভূমিকম্প হলে তাতে এখানকার মানুষের কী ধরনের শারীরিক ক্ষয়-ক্ষতি পারে বলে আপনি মনে করেন?

আবুল বারকাত

এই ভূমিকম্প যদি গ্রামাঞ্চলে হয়; হাওড়-বাওড় এলাকায় হয় তাহলে এসব জায়গায় মনুষ্য ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানি বা পঙ্গুত্ব শহরের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম হতে পারে। কেননা গ্রামের কোনো কোনো এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব কোথাও কম আবার কোথাও বেশি। যেখানে পারস্কয়ার কিলোমিটারে মানুষ কম বসবাস করে সেখানের ক্ষতিটা যেখানে পারস্কয়ার কিলোমিটারে মানুষ বেশি বাস করে তার চেয়ে কম হবে। আর মানুষের সংখ্যায় বড় ধরনের প্রাণহানি বা পঙ্গুত্ব ঘটবে ঢাকা বা ঢাকার মতো বড় বড় শহরগুলোতে যেখানে হাইরাইজ বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছে; যেখানে বিল্ডিং-কোড মানা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই ভূমিকম্প থেকে বিল্ডিং রক্ষা করার জন্য যে আইনগত বিধান আছে সেসব না মেনেই বিল্ডিং তৈরি করা হচ্ছে। ধরা যাক ঢাকা শহরে যদি পাঁচ থেকে ছয় রিখটার স্কেলে ভূমিকম্প হয় তাহলে প্রথম কাজই হবে যারা মারা যাবেন তাদেরকে সরানো, যারা পঙ্গুত্ব বরণ করবেন বা মারাত্মকভাবে আহত হবেন তাদেরকে অতি দ্রুত চিকিৎসাসেবা দেয়ার জন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা। এক্ষেত্রে ঢাকা মেডিকেল কলেজ, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বা পিজি হাসপাতালের মতো আরও নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে গবেষণা-সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, পিজি হসপিটাল যে জায়গাটায় অবস্থিত সে জায়গাটি ঐতিহাসিকভাবেই ঘোষিত একটি ভূমিকম্পপ্রবণ জায়গা। কাজেই ভূমিকম্পে এই হাসপাতালের অবস্থা কী হবে তা সহজেই অনুমেয়।

আবার ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালের বিল্ডিংগুলো বহু পুরাতন। এই বিল্ডিংগুলো ছোট-খাট ভূমিকম্পেই ভেঙে যাবে। কাজেই স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার মত প্রতিষ্ঠানগুলোই তখন আর থাকবে না। এছাড়া মতিঝিল, মালিবাগ বা মুগদাপাড়ার মতো এলাকাগুলো থেকে মানুষ বের করে আনার জন্য দমকল বাহিনী যে ঢুকবে সেরকম কোনো রাস্তাও নেই। কাজেই ভূমিকম্প বা বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মাথায় রেখে নগর পরিকল্পনা কিন্তু কখনই করা হয়নি।

হালখাতা

এতে মানুষের সম্ভাব্য শারীরিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণকে নিশ্চয়ই কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা যেতে পারে; এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারিভাবে আমাদের মধ্যে সেই প্রস্তুতি প্রয়োজন অনুসারে কতটা আছে বলে আপনি মনে করেন?

আবুল বারকাত

ভূমিকম্পে যারা মারা যাবেন তারা তো মারাই যাবেন; আর যারা জীবিত থাকবেন তাদের অবস্থা হবে দু'রকম; যেমন– এক রকম হবে বাড়িঘর ভেঙে পড়ে তারা কেউ পঙ্গুত্ববরণ করবেন; আরেক রকম থাকবে যারা মারা যাবেন না বা পঙ্গুও হবেন না, এদের আপনজন বা নিকট-আত্মীয় মারা যাবেন বা পঙ্গু হবেন। এখন পঙ্গু হলে প্রয়োজন দ্রুত চিকিৎসা দেয়া, দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। আবার যারা মারা যাবে তাদের দাফন করা, চিতায় দেয়া ইত্যাদি। কিন্তু বলা হয়ে থাকে পঙ্গু হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য বা মারা গেলে দাফন করার জন্য যে সময়সুযোগ বা পরিস্থিতির প্রয়োজন সেটাও থাকবে না। ধরা যাক ঢাকায় দেড় কোটি মানুষ; এখন ঢাকায় যদি বড় মাপের ভূমিকম্প হয় তাহলে তা কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশি এফেক্ট করবে, কোন এলাকায় কত জন মানুষ মৃত্যুবরণ করবে বা কত জন মানুষ পঙ্গুত্ববরণ করবে এই ধরনের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে বিজ্ঞান অনেক এগিয়েছে, এগুলো সম্পর্কে আগে থেকেই একটা ধারণা করা যেতে পারে। আমি ধরেই নিলাম যে ভূমিকম্পে বিশ লক্ষ মানুষ মারা যাবে। এখন এই বিশ লক্ষ মানুষ কোথায় মারা যাবে? একজন দু'জন না বিশ লক্ষ মানুষ; এদের দাফন-কাফন করতে হবে; চিতায় দিতে হবে; এসব করতে হলে তো সেই মৃত মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে। তাদের পর্যন্ত যদি পৌঁছতেই না পারা যায় তাহলে দাফন করবেন কিভাবে? তার মানে তখন এটা একটা মৃত্যু-পুরীতে পরিণত হবে। সেক্ষেত্রে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতার মতো একটা জিনিস এখানে দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

হালখাতা

একটা বৃহৎ সংখ্যক মানুষ মারা যাওয়া ও পঙ্গুত্ববরণ করার পর এই মহাবিপর্যয়ের মধ্যে আমাদের যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হবে, সেই পরিস্থিতি তো আমরা মোকাবেলা করতে নিশ্চিতভাবে ব্যর্থ হব, সেক্ষেত্রে আপনার প্রতিক্রিয়া বা পরামর্শ কী?

আবুল বারকাত

এখন কথা হচ্ছে, এই মহাবিপর্যয়ে যারা মারা যাবেন তাদের জন্য মৃত্যু-পরবর্তী যে ব্যবস্থা নেয়া দরকার, সে ক্ষেত্রে আমাদের যা অবস্থা তাতে বড় রকমের হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা আছে বরং হোচট না খাওয়ার সম্ভাবনা যে নেই সেটাও কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। কাজেই এটা যদি সত্য হয় তাহলে জাতীয়ভাবে বা সরকারিভাবে বা এটা নিয়ে যারা চিন্তা ভাবনা করেন তাদের আরো এক্টিভ হওয়া দরকার; তাদের সক্রিয় ভূমিকা নেয়া দরকার। দ্বিতীয়ত যারা পঙ্গুত্ববরণ করবেন তাদের কত দ্রুত চিকিৎসাব্যবস্থার কাছাকাছি পৌঁছে দিবেন তার ওপরে নির্ভর করছে তার পঙ্গুত্বটা পরবর্তী জীবনে কতটুকু থাকবে এবং কীরকম প্রভাব ফেলবে। এটাকে 'ডিজএ্যাবেলিটি এ্যাডজ্যাস্টেট লাইফ ইয়ার' বলা হয়। ডিজএ্যাবেলিটি কিন্তু কমিয়ে আনা সম্ভব। যেমন ধরুন ভূমিকম্পে যারা পঙ্গু হবেন তাদেরকে যদি হাসপাতালে নিতে দেরি হয় বা সময়মতো যথাযথ চিকিৎসা না-দেয়া যায় তাহলে এদের অনেকেই কিন্তু চিরজীবনের জন্যই পঙ্গু হয়ে যাবেন কিন্তু তাদেরকে যদি আধা ঘণ্টার মধ্যে নিতে পারেন তাহলে মৃত্যুর হার তো কমবেই, এমনকি তাদের পঙ্গুত্ব ওয়ান থার্ড, ওয়ান ফোর্থ, ওয়ান ফিফ্থ স্টেজে নামিয়ে আনা সম্ভব। কাজেই এরকম ব্যবস্থা নেয়ার জন্য যে প্রস্তুতি একটি ভূমিকম্পপ্রবণ রাষ্ট্রের থাকা দরকার তা কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রে নেই।

হালখাতা

সরকার বা এনজিও তো দূরের কথা, ব্যক্তিগতভাবেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না যিনি বা যারা সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে নিজের আগ্রহ থেকে বিশেষ করে বাংলাভাষায় গবেষণা বা অন্য কোনোভাবে ভূমিকম্প নিয়ে কাজ করছেন। বিষয়টি নিয়ে যদি কিছু বলেন...

আবুল বারকাত

সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে এটা নিয়ে যে ভাবনাটা করা দরকার সেটা কিন্তু আমিও কারোর মধ্যে দেখি না। বাংলাদেশে এমন কোনো জিনিস নেই যা নিয়ে কোনো নীতিমালা নেই। এমন কোনো বিষয়ের নাম বলতে পারবেন না যে তা নিয়ে কোনো নীতিমালা নেই; সব কিছুরই নীতিমালা আছে। এমনকি এই ভূমিকম্প নিয়েও হয়তো কোনো নীতিমালা আছে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখবেন আমি এতক্ষণ ধরে যে কথাগুলো বলেছি– সেই নীতিমালায় এই কথাগুলো নেই; অন্য কিছু আছে, কোনো ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নীতিমালা আছে। অর্থাৎ ভূমিকম্প নিয়ে জনভাবনা অর্থাৎ মানুষকেন্দ্রিক যে ভাবনা তা এই নীতিমালায় আপনি খুঁজে পাবেন না।

হালখাতা

আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন, এমন কোনো একটি ভূমিকম্পের উদাহরণ এবং সেক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতার কথা কি আমাদের খানিকটা বলবেন?

আবুল বারকাত

যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগেই কিন্তু ধনী-গরিব নির্বিশেষে ক্ষতি হয়। ভূমিকম্পও সেরকম একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এখানে ব্যাপক মনুষ্যসম্পদের ক্ষতি হবে। এমনকি ফিজিক্যাল এসেট যা মানুষ বংশপরম্পরায় সর্বস্ব দিয়ে বাড়িঘর বানিয়ে আসছে, তারও কোনো চিহ্ন থাকবে না। এমনকি ঐ জায়গাও থাকবে না। উদাহরণস্বরূপ আমি মধ্য এশিয়ার কথা বলতে পারি; এটা খুবই ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। তো এই মধ্য এশিয়ার তাসখন্দের ভূমিকম্প আমি দেখেছি যা বর্ণনাতীত। কিন্তু এখন তাসখন্দে রিখটার স্কেলের ৬ পরিমাণ ভূমিকম্প হলেও তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় না। কেননা একটু ব্যয়বহুল হলেও বাড়ি-ঘরগুলো সেরকমভাবেই ভূমিকম্প-প্রটেক্টেড করে গড়ে তোলা হয়েছে।

হালখাতা

বাংলাদেশে এনজিও সেক্টর নানা বিষয় নিয়ে কাজ করছে, অনেক বিতর্ক হয়তো তাদের কাজ নিয়ে আছে; কিন্তু ভূমিকম্পের মতো এতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এনজিও সেক্টরকেও এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না। এর কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?

আবুল বারকাত

যেমন আমাদের দেশে এইচ.আই.ভি. কিন্তু কোনো মেজর প্রবলেম না। এইচ.আই.ভি. আফ্রিকায় একটি মেজর প্রবলেম। কিন্তু এইচ.আই.ভি.–এর কথা যখনই ওঠে তখনই বলা হয় যে ভারতে যেহেতু এই রোগের রোগির সমস্যা বেশি, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ হিসেবে আমাদের যাওয়া-আসা বেশি সেহেতু এইচ.আই.ভি. আমাদের হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। কাজেই এই এইচ.আই.ভি. নিয়ে দুশ্চিন্তা করা দরকার। এর একটা কারণ হতে পারে যে এইচ.আই.ভি. নিয়ে যে পরিমাণ অর্থ পৃথিবীতে বিলিবণ্ট হচ্ছে সেই অর্থ আমাদের দেশেও এসে পৌছাচ্ছে। বিভিন্ন এনজিও থেকে শুরু করে জাতিসংঘের বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা, বিভিন্ন স্বার্থ সংস্থা– এরা সবাই মিলেই এইচ.আই.ভি. এর কথা বলছে। আমার ধারণা ভূমিকম্প নিয়ে ওর চাইতে কমপক্ষে ঐ পরিমাপের ঐ মানের কথাবার্তা হওয়ার জন্য যে এনভায়ারনমেন্ট তৈরি হওয়ার কথা ছিল তা হচ্ছে না।

হালখাতা

উপরের মহলে যারা বসে আছেন তারা ভূমিকম্প নিয়ে অর্থ বিলিবণ্টনের কথা ভাবছেন না। এর পেছনের কারণ কী?

আবুল বারকাত

আমি এর কারণ সম্পর্কে খুব শক্ত করে জোর দিয়ে বলতে পারব না। তবে যেটা বুঝি এর পেছনে একটা বড় ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিও কাজ করছে। এইচ. আই. ভি. যদি আফ্রিকায় প্রকট হয় তাহলে আমেরিকার তাতে কী? ইউরোপেরই বা কী? আমি কিন্তু এটা বুঝি না। আর এসবের ডোনাররাও থাকে আমেরিকা ইউরোপে। এটাও হতে পারে যে এইচ. আই. ভি. রোগের ভেক্সিন আবিষ্কার হচ্ছে এবং এটা একটা বড় আকারে বিক্রি হবে এবং তার চেয়েও বড় আকারে প্রফিট হবে। অতএব পরে কোনো প্রফিট পাওয়ার জন্য আগেই ইনভেস্ট হচ্ছে। এটা হতে পারে। পক্ষান্তরে ভূমিকম্প নিয়ে সেরকম কোনো ব্যবসায়িক ফায়দা নেয়ার সুযোগ হয়তো এখনো হয়নি, সেকারণে ভূমিকম্প নিয়ে হৈ-চৈটাও কম।

হালখাতা

বাংলাদেশের মানুষ, আমরা যারা জীবিত অবস্থায় আছি, আমাদের জীবদ্দশায় বড় ধরনের ভূমিকম্প আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। ফলে এদেশে যে বড় ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে, বিষয়টি এখানকার সাধারণ মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতার মধ্যেই আসছে না। অথচ বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে-কোনো সময় এখানে বড় ধরনের ভূমিকম্প হওয়ার একশ ভাগ সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি বলবেন কি, বিষয়টিকে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতার মধ্যে আনার জন্য কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে?

আবুল বারকাত

আমাদের দেশে সরকারি হিসেবে ৪০% এবং আমার হিসেবে ৮০% মানুষ দরিদ্র। তারা ঠিকমতো দু'বেলা খাবার পাবে এটা নিশ্চিত। ভূমিকম্প বিষয়ে তাদের সচেতন করা কঠিন। কেননা তারা তাদের দাদার বা বাবার আমলে ভূমিকম্প দেখেনি বা শোনেনি। কবে ভূমিকম্প হবে এটা তাদের বিশ্বাস করানো সহজ নয়। তবে মিডিয়া পারে সাধারণ মানুষকে ভূমিকম্প বিষয়ে সচেতন করে তুলতে। এই ভূমিকম্প একটা রিয়েলিটি। এই মহাবিপর্যয় বাংলাদেশে কিন্তু হবেই। কিন্তু হলে আমি কী করব? আমার পরিকল্পনাটা কী? এবং সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আমার বাস্তবতাটা আসলে কী হওয়া দরকার, সেটা নেই। ভূমিকম্পে যারা মারা যাবেন তাদের কথা বাদ দিলাম কিন্তু যারা বেঁচে থাকবেন তাদের অবস্থা কী হবে। এমনকি বাচ্চাদের একাডেমিক বইগুলোতে বন্যা নিয়ে যে সব সচেতনতামূলক লেখা থাকে আমার মনে হয় না ভূমিকম্প নিয়ে সেরকম কোনো সচেতনতামূলক লেখা আছে। আমরা যে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় বসবাস করি সেজন্য একটি বাচ্চা থেকে শুরু করে একজন প্রবীণের জন্য অবশ্য করণীয় কী সেটা কিন্তু নেই। একটি বাচ্চা যা করবে একজন যুবক তা করবে না; আবার একজন প্রবীনের আত্মরক্ষাও ভিন্ন রকম হবে। কাজেই ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার সময় তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যেক বয়সের জন্য অবশ্য করণীয়

ও পালনীয় বিষয় অবশ্যই পাঠ্যপুস্তকে থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা বাচ্চা যখন পড়ছে মা তখন হয়তো পড়াচ্ছে কাজেই বিষয়টি মা-ও জানতে পারছে। পাশে নানী-দাদী থাকলে সে-ও শুনে জানতে পারছে। এভাবে করে একটি পরিবারের সবাই-ই ভূমিকম্প কী তা জানতে পারবে এবং আত্মরক্ষামূলক সচেতনতা অবলম্বন করতে পারবে।

হালখাতা

আপনি কিছুক্ষণ আগে এক জায়গায় বলেছেন যে পি.জি হাসপাতাল যে জায়গাটায় নির্মিত হয়েছে সে জায়গাটা ঐতিহাসিকভাবেই একটি ভূমিকম্পপ্রবণ জায়গা। আবার ঢাকা মেডিকেল হাসপাতাল একটি মাঝারি মানের ভূমিকম্পেই ধ্বংস হয়ে যাবে। – এই যদি হয় দেশের বৃহৎ হাসপাতালগুলোর অবস্থা যা কিনা গণ-মানুষের চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার তা যদি সেই মাহাবিপর্যয়ের মুহূর্তে টিকে না থাকে তাহলে এর বিকল্প কী ব্যবস্থা আছে বলে আপনি মনে করেন?

আবুল বারকাত

আমি এ বিষয়ে ভূমিকম্প গবেষণা সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেছি; তারা বলেছেন ঢাকা মেডিকেলের মতো পুরনো বিল্ডিংকেও আর্থকোয়েক প্রুফড করা সম্ভব। যে কোনো বিল্ডিং যা আর্থকোয়েক প্রুফড নয়, তাকেও কিন্তু আর্থকোয়েক প্রুফড্ করা সম্ভব। হয়তো এতে খরচ একটু বেশি হবে। কিন্তু ধ্বংসের ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে খরচের বিষয়টাকে বিবেচনা করা দরকার। এখন ধরুন বিজ্ঞানীরা যদি বলেন যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এবং ভূমিকম্পের সম্ভাবনা এলাকা হচ্ছে মতিঝিল কমার্শিয়াল এলাকা। এখন এই মতিঝিল এলাকার চারদিকে চারটা কর্নার আছে এবং চারপাশে নিশ্চয়ই হাসপাতালও আছে। এই হাসপাতালগুলোকে নির্দিষ্ট করে অবশ্যই আর্থকোয়েক প্রুফড করা প্রয়োজন। যদি এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেই যায় তাহলে মানুষজন কীভাবে হাসপাতালে যাবে, কোন্ কোন্ হাসপাতালে যাবে, কোন পথ দিয়ে বের হয়ে আসবে অর্থাৎ বের হয়ে আসার পথ বন্ধ যদি হয়ে যায় তাহলে বিকল্প পথ করে দিতে হবে। এসব প্রস্তুতিমূলক এবং সতর্কমূলক ব্যবস্থা নেয়া দরকার। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, প্লেন আকাশে ওড়ার আগে আকাশ পথে দুর্ঘটনা ঘটলে যাত্রীদের কী কী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া দরকার, কীভাবে আত্মরক্ষা করতে হবে বলে দেয়া হয়। প্রথমেই কিন্তু বলে দেয়া হয় ফ্লাইট-ইন ডোর কোথায়, বেল্ট কীভাবে বাঁধতে হয় ইত্যাদি। প্লেনের যাত্রীদের প্রতিবারই কিন্তু এটা দেখিয়ে দেয়া হয়। ঠিক তেমনি করে ভূমিকম্পের সময় কী কী পদক্ষেপ নেবে তা সাধারণ মানুষকেও প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। তবে এখানে ইনভেস্ট করতে হবে অনেক। এখন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যদি এটা বলা হয় যে এতে ইনভেস্টমেন্ট খুব বেশি হবে; হয়তো এটাও বলা হবে যে ইনভেস্ট করার মতো গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য জায়গাও তো আমাদের আছে; আমি কেন এই জায়গায় এত ইনভেস্ট করব?

হালখাতা

'ভূমিকম্প' বিষয়ে তাহলে আমাদের করণীয়টা কী? যেহেতু আগাম কোনো বার্তা দিয়ে সে আসে না, কিংবা প্রতিকার বা প্রতিরোধেরও কোনো ব্যবস্থা নেই, ফলে আমরা এক্ষেত্রে কী-ই বা করতে পারি?

আবুল বারকাত

প্রথমত ভূমিকম্প তো কালই হচ্ছে না; বিজ্ঞানীরা হয়তো সময়ের একটা রেঞ্জ বলতে পারবেন। তারা হয়তো বলতে পারবেন যে আগামী বিশ থেকে ত্রিশ বছরের পর ভূমিকম্প হবে; তাহলে দেখা যাবে যে, হাতে দশ বা বিশ বছর সময় পাওয়া যাবে। সেই বিশ বছরের মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোথায় কোন কাজটা করতে হবে সেটা পরিকল্পনা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইনভেস্ট করতে হবে। দ্বিতীয়ত যারা পঙ্গুত্ববরণ করবেন বা গুরুতরভাবে আহত হবেন তাদেরকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে পৌছানো এবং দ্রুত চিকিৎসার মাধ্যমে পঙ্গুত্বকে যতটা সম্ভব কমিয়ে আনার দরকারী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। তৃতীয়ত সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হবে বাড়ি-ঘর, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, ব্যাংক, হাসপাতাল এবং শিল্পকারখানা ইত্যাদির। ধরি ঢাকায় বর্তমানে এক কোটি বিশ লক্ষ মানুষ বাস করে; এদের মধ্যে বিশ লক্ষ মানুষ যদি পঙ্গুত্ববরণ করেন তাহলে বাকি থাকে এক কোটি মানুষ। এদের মধ্যকার একটা বড় অংশের বাড়ি-ঘর ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন এদের তাঁবুতে বসবাস করতে হবে। সেক্ষেত্রে তাঁবুতে বসবাস করাটাও কিন্তু শিখতে হবে। কেননা ভূমিকম্প যে কোনো ঋতুতেই হতে পারে। আমাদের দেশে প্রতিটা সিজনেই কিন্তু ভূমিকম্প হয়ে গেছে। সুতরাং শীতকালে তাঁবুতে কীভাবে বসবাস করতে হয় তা শিখতে হবে। গ্রীষ্মকালে কীভাবে বসবাস করতে হয় তা শিখতে হবে। বর্ষাকালে কীভাবে বসবাস করতে হয় তা শিখতে হবে বা জানা থাকতে হবে। একইসঙ্গে যারা বেঁচে থাকবেন তাদের জন্য এই দুর্যোগ-পরবর্তীকালীন ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে। কারণ আমরা যতই শিক্ষিত হই আমরা কিন্তু এসব বিষয়ে কিছুই জানি না। আমরা প্রচলিত অর্থে যে শিক্ষা গ্রহণ করি সেখানে কিন্তু এগুলো নেই। আবার এটা কিন্তু এককভাবে কোনো শিক্ষিত লোকেরও ব্যাপার না। যে শিক্ষিত তাকে তার মতো করে জানাতে হবে; যে নিরক্ষর তাকে তার মতো করে জানাতে হবে। আমাদের দেশের এসব বিষয় জানানোর মতো ব্যবস্থার কিন্তু অভাব নেই। বাংলাদেশে এনজিও'র সংখ্যা পৃথিবীতে যত এনজিও আছে তা যোগ করলে যা হবে তার চেয়ে কিন্তু কম না। এছাড়াও বাংলাদেশের লোকাল গভর্নমেন্ট আছে, প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া আছে। আমি মনে করি এসব মিলিয়ে একটা কমপ্রিহেনসিভ পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। এটা সোস্যাল, ইকোনোমিক্যাল ও কালচারালি দেখা দরকার। অনেকে এটাও মনে করতে পারেন যে ভূমিকম্প যেহেতু একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যাপার সেহেতু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে যারা কাজ করছেন এটা তাদেরই ব্যাপার। বিষয়টা কিন্তু আসলে তা নয়। বিষয়টা আসলে মানুষ নিয়ে যিনি বা যারা

ড্রিল করছেন তারা, সেটা যে সেক্টরে থেকেই করেন-না কেন, যেভাবেই করেন-না কেন, আমার মনে হয় বাংলাদেশে এভাবে বিষয়টিকে নিয়ে কোনোদিন ভাবা হয়নি, দেখাও হয়নি। আমি মনে করি, এটাকে বাজেট-সংশ্লিষ্ট করে সামনে আনা দরকার।

হালখাতা

এই যে 'ভূমিকম্প' বিষয়টিকে বাজেট-সংশ্লিষ্ট করে সামনে নিয়ে আসার কথা বললেন, তো এই সামনে নিয়ে আসার উপায়টা কী?

আবুল বারকাত

আমি মনে করি এটা জাতীয়, রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণী বিষয়। এটা আমি-আপনি কথা বলব, পত্রিকায় লেখালেখি করব, বিষয়টা কিন্তু এরকম না। রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণী জায়গা থেকে যারা পলিসি মেইক করেন তারা কনসার্ন, কমিটেড, কমপিটেন্ট কিনা এটাই তো আমরা পরিষ্কার না। আমি যতটুকু জানি তারা কনসার্ন না। তারা কমিটেড বা কমপিটেন্টও না। তাদের মধ্যে কোনো জনভাবনাও নেই। তো এই যে জনভাবনার অভাব এটাকে ওনারা স্বীকার করতে চাইছেন না। এবং এটা যে থাকা উচিত না এটা মানেন না। এটা মানলে না তারা কনসার্ন হবেন, কমিটেড হবেন। কাজেই যারা পলিসি মেইক করেন, নীতি নির্ধারণ করেন, কোনো সিদ্ধান্ত নেন তাদেরকে অবশ্যই কনসার্ন হতে হবে। কেননা একশো বছরে বন্যা, সিডর বা আর্সেনিক ইত্যাদির মতো যত দুর্যোগ হয়েছে সব মিলে যা ক্ষতি হবে একমাত্র ভূমিকম্প তারচেয়ে অনেক অনেক বেশি ক্ষতি হবে। এখন আমাদের দায়িত্ব হতে পারে যারা নীতিনির্ধারণীর জায়গায় আছেন পত্রপত্রিকায় লেখেন তাদেরকে কনসার্ন করা। তবে তারা কনসার্ন হলেই যে ধরে নিতে হবে তারা জনভাবনার কারণে কনসার্ন হয়েছেন তা নয়। কেননা পৃথিবীতে এমন অনেক অর্গানাইজেশন আছে যারা এ ধরনের বিষয় নিয়ে যেসব দেশ কনসার্ন তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। তো আমাদের নীতিনির্ধারণীরা কনসার্ন হয়ে যাবেন যদি দেখেন যে অনেক টাকা পয়সা পাওয়া যাবে তাহলেই। যেমন এইচ.আই.ভি নিয়ে ওনারা যে এত কনসার্ন এটা কি রাম শাম যদু মধু সখিনার এ-রোগ হবে এজন্য ওনারা কনসার্ন তা তো নয় বলেই আমার ধারণা। আমার ধারণা, বড় বড় বাড়ি, বড় বড় গাড়ি, বড় বড় প্লেনে যাওয়া-আসার টিকিট, সেমিনার, ওয়ার্কশপে যাওয়া এসব বিষয়ে কনসার্ন। ওনারা যদি দেখেন ভূমিকম্প নিয়ে কনসার্ন হলে বড় বড় ফান্ড পাওয়া যাবে তখনই তারা কনসার্ন হবেন। তবে আমি মনে করি সেকারণেও যদি তারা কনসার্ন হন তাও ভালো। তার কারণ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জনগণের জানা দরকার।

হালখাতা

কিন্তু কাজ করতে হলে তো ফান্ড দরকারও আছে, সেবা ফান্ড কোথা থেকে আসবে?

আবুল বারকাত

যাকাতের বাইরেও আপনার যে সম্পদ তার আড়াই পার্সেন্ট রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা ব্যুরোয় জমা দিতে পারেন। আমি হিসেব করে দেখেছি বাংলাদেশে যে পরিমাণ সম্পদ মানুষের কাছে আছে, এক্ষেত্রে অন্তত যারা কালো টাকার মালিক তাদের কাছ থেকে আড়াই পার্সেন্ট হারে যদি অর্থ নেয়া হয় তাহলে যে পরিমাণ টাকা পাওয়া যাবে তা দিয়ে কিন্তু অনেক কিছু করা সম্ভব। সেই টাকার কিছু অংশ দিয়ে করণীয় বিষয় যদি হয় ভূমিকম্প-সংক্রান্ত কাজ, আমি বলব তাহলে অনেক কিছুই করা সম্ভব।

হালখাতা

বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত ভূমিকম্প বিষয়ক কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল না। এর কারণ কী বলে আপনি মনে করেন? প্রতিটি মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত ভূমিকম্পের মতো এতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এই উদাসীনতার দায় কি শেষপর্যন্ত সরকারের ওপর বর্তায় না?

আবুল বারকাত

খোঁজ নিয়ে দেখেন এত দিনে সেটা নিশ্চয়ই হয়েছে। বাংলাদেশে হেন বিষয় নেই যা নিয়ে প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়নি। সমস্যা অন্য জায়গায়; সেটা হল, খোঁজ নিলে নিশ্চয়ই জানা যাবে যে, ঐ প্রতিষ্ঠানে চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি আর দু-একজন মানুষ ছাড়া আর কেউ নেই; বড়জোর দু-চারটা টেবিল-চেয়ার থাকতে পারে। এটা শুধু ভূমিকম্প নিয়ে যে, তা নয়, এই অবস্থা গোটা দেশের। আর যে দেশে বলা যায় সরকারই নেই সে দেশে কা'র ওপর কী বর্তায়, সে আলাপ তুলেই বা লাভ কী! সরকার তো আসমানী কোনো বিষয় নয়, আপনার-আমার মতো রক্ত-মাংসের মানুষ দিয়েই সরকার; আমাদের যা চরিত্র, সরকার তো সেরকমেরই হবে!

হালখাতা

বাংলাদেশে যারা ভূমিকম্প নিয়ে গবেষণা করছেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশ গবেষকই গবেষণাপত্র ইংরেজিতে লিখছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব (জিওলজি) বিভাগ এবং বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং) বিভাগের কয়েকজন সম্মানিত শিক্ষাবিদ নিজেরাই স্বীকার করলেন, উনারা বাংলায় লিখতে পারেন না দুটি কারণে; প্রথমত উনারা মনে করেন, অনেক টার্ম আছে যেগুলোর ইংরেজি থেকে বাংলা করা সম্ভব নয়, দ্বিতীয়ত উনারা উচ্চতর ডিগ্রি-সংক্রান্ত যাবতীয় পড়াশুনা করেছেন ইংরেজিতে, তাছাড়া বিশ্বখ্যাত জার্নালগুলোতেও ইংরেজিতেই লিখতে হয়– ফলে ইংরেজিতে যেভাবে উনারা অভ্যস্ত বাংলাতে সেদিক থেকে একেবারেই লিখতে অভ্যস্ত নন। সে-কারণে অনেক বিষয়ের মতো ভূমিকম্প নিয়েও বাংলায় লেখা রচনা খুব একটা পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন হল, এদেশের অধিকাংশ মানুষ বাংলায় কথা বলে, এমনকি শিক্ষিত শ্রেণীর অধিকাংশও বাংলাতেই অভ্যস্ত– সেখনে ইংরেজিতে গবেষণা কাদের স্বার্থে করা হচ্ছে?

আবুল বারকাত

বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে এটা যে একটি জনভাবনার বিষয় কাগজ-কলমে তা কখনই উঠে আসেনি; অন্তত আমি উঠে আসতে দেখিনি। যেমন সামনে ঈদ থাকলে লঞ্চডুবি হবে। –এটা এখন একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়তো লঞ্চের ধারণক্ষমতা তিনশ জনের কিন্তু যাত্রী উঠানো হবে পাঁচশ। আবার কোনো কোনো লঞ্চের হয়তো ফিটনেসই নেই। এতে করে প্রায় প্রতি বছরই লঞ্চডুবির কারণে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটছে। আমাদের দেশে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর হৈচৈ শুরু হয়; পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হয়; মিটিং হয়, এডিটরিয়াল লেখা হয়, বোর্ড বসে ইত্যাদি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আমাদের সরকার বা যারা এ নিয়ে গবেষণা করছেন তারা এর আগাম কোনো প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। আর অন্যদশটা বিষয়ের মতোই ভূমিকম্প নিয়ে যারাই উচ্চতর গবেষণা করছেন, সেই গবেষকরা যে ভাষায় লেখেন তা জনগণের ভাষা না; সেই ভাষা তাদের ব্যক্তিগত উন্নয়নের ভাষা।

হালখাতা

আপনাকে যদি এ-বিষয়ক মন্ত্রী বা প্রধান নির্বাহী করা হয় তাহলে ভূমিকম্প বিষয়ে আপনার করণীয় কী থাকবে?

আবুল বারকাত

প্রথমত আমি এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ নই। এ ধরনের মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী পদে যাওয়ার কোনো ইচ্ছাও আমার নেই। তবুও তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে আমি প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। আমি ইতোমধ্যে যে কথাগুলো বলেছি তা আরেকবার ভালো করে ভাবব। এবং যে কথাগুলো বলেছি তা আবারও আরেকবার ভালো করে ভাবব এবং এ অনুযায়ী কাজ করা যায় কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব। প্রথমেই আমি যে কাজটি করব সেটা হল এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যারা দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে কাজ করেন তাদের সকলকে নিয়ে বসব। তাদের নিয়ে বসার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইতোমধ্যে যেসব জায়গায় বড় বড় ভূমিকম্প হয়ে গেছে সেসব জায়গায় কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, কী কী ঘটনা ঘটেছে ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের জন্য একটা মডেল তৈরি করব। এবং এই মডেল অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদে নানা স্তরবিশিষ্ট কাজ শুরু করে দেব।

হালখাতা

আমরা জানি জাতীয় নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে 'দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি'র রোধকল্পে নানা কর্মকৌশল নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে আপনাকে থাকতে হচ্ছে। এই ব্যস্ততার মধ্যেও হালখাতাকে সময় দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

আবুল বারকাত

হালখাতাকেও ধন্যবাদ। হালখাতার চেষ্টা অব্যাহত গতিতে চলুক, সেই কামনাই করি।

প্র ব ন্ধ

প্রসঙ্গ ভূমিকম্প: ভবনের উচ্চতা ও সঠিক প্রযুক্তি

মো. আ ব্দু ল আ উ য়া ল

বাসস্থান প্রতিটি মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে একটি। তবে বাসস্থান কেবল ইট, সিমেন্ট, বালির একটি কাঠামো নয়, এর সাথে জড়িয়ে থাকে একটি পরিবারের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার অসংখ্য স্মৃতি। একটি সুন্দর ও নিরাপদ বাসস্থান প্রত্যেক মানুষেরই আকাঙ্ক্ষা। তবে নগরায়ণের তীব্র স্রোতে খোলামেলা জমিতে নিজের একটা বাড়ি এমন একটি স্বপ্ন হয়তো ঢাকার মতো দ্রুত বর্ধনশীল শহরে একটু বেশিই হয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে বর্তমান ঢাকার এ্যাপার্টমেন্ট সংস্কৃতিতে রাস্তার জন্য জায়গা না ছেড়ে গায়ে-গা ঘেঁষে গড়ে-ওঠা বহুতল ইমারতের যে দমবন্ধ-করা চিত্র দেখা যায় তা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এ কেবল অপরিকল্পিত নগরায়ণেরই প্রতিচ্ছবি।

বেশ কয়েক বছর হল ঢাকা শহর একটি মেগাসিটিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে দুঃখজনক হলও সত্য যে, টোকিও বা নিউইয়র্ক মেগাসিটির মতো পরিকল্পিতভাবে এই শহরটি গড়ে ওঠেনি। অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে উদ্ভূত বহুমূখী সমস্যায় জর্জরিত আজ সমস্ত ঢাকা শহর। অপর্যাপ্ত আবাসন, ক্রমনিম্নগামী ভূগর্ভস্থ পানির স্তর, বিপর্যস্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, ব্যাপক দূষণ এবং দুঃসহ ট্রাফিক জ্যাম– দীর্ঘদিন এসবের ভিতর

থেকে ঢাকাবাসী যেন নগরায়ণের স্বাভাবিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধাগুলো ভুলতে বসেছে।

অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে গড়ে-ওঠা ইমারত একদিকে যেমন ঢাকাকে কংক্রিটের বস্তিতে পরিণত করেছে এবং এতে বসবাসকারীদের আলো, বাতাসবিহীন এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকতে বাধ্য করছে তেমনি অপ্রশস্ত রাস্তাঘাট পুরো শহরকে এক ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। এসব অপ্রশস্ত রাস্তাঘাট কোথাও কোথাও এতটাই সরু যে গাড়ি তো দূরের কথা রিক্সা চলাচলের উপযোগীও নয়। ভূমিকম্প বা অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনা ঘটলে এ্যাম্বুলেন্স বা ফায়ার সার্ভিস-এর গাড়ি এসব রাস্তায় প্রবেশের জন্য একেবারেই অনুপযোগী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অপরদিকে দুর্ঘটনাজনিত কারণে ধ্বসে-পড়া কোনো ইমারত-এর ধ্বংসাবশেষ সরানো এবং উদ্ধার তৎপরতায় আমাদের দেশের সংশ্লিষ্ট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের কারিগরি জ্ঞান, প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কতটা পুরাতন এবং অপ্রতুল তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি স্পেকট্রা গার্মেন্টস ও ফিনিক্স ভবন ধ্বসেপড়া-পরবর্তী উদ্ধার তৎপরতার সময়। এমনকি সেনাবাহিনীকে সম্পৃক্ত করা সত্ত্বেও উদ্ধারকাজ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক ধীর এবং অকার্যকর। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মাঝে বহুতল ইমারতের ক্ষেত্রে ভূমিকম্পজনিত একটা ভীতি কাজ করে। কিন্তু বহুতল ভবনে ভূমিকম্পজনিত নিরাপত্তা যদি নিশ্চিত করা না যেত তবে চীন, জাপান, হংকংসহ পশ্চিমের যেসব দেশ তীব্র ভূমিকম্প অথবা সাইক্লোন এলাকার অন্তর্গত সেইসব দেশে ৭০/৮০ তলা বা তার চাইতেও উঁচু ভবন গড়ে উঠত না। গত কয়েক বছর যাবৎ ভূমিকম্প নিয়ে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণা এবং লেখালেখি হচেছ। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে বাংলাদেশ আর্থকোয়েক সোসাইটি। এছাড়াও বুয়েট এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ভূমিকম্প-বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার পাশাপাশি সেমিনার আয়োজন করছে। একজন পুরকৌশলী এবং স্ট্রাকচারাল ডিজাইনার হিসাবে আমার ৩১ বছরের নির্মাণশিল্পে অভিজ্ঞতার আলোকে আমি যা বুঝেছি তা হল যথাযথ কম্পিউটার সফ্টওয়্যার-এর সাহায্যে লোড এনালাইসিস, স্ট্রাকচারাল ডিজাইন, ভূমিকম্প সম্পর্কিত রিইনফোর্সমেন্ট ডিটেইলিং এবং সর্বোপরি দক্ষ ও যোগ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত নির্মাণকাজ একটি ভবনের ভূমিকম্পজনিত নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। উল্লেখিত বিষয়গুলোর যে কোনো একটিতে ত্রুটি সমগ্র ভবনের জন্য বিপদজনক হতে পারে। তাই বিল্ডিং-এর উচ্চতা নিয়ে অমূলক ভয় না পেয়ে বরং কিভাবে বিল্ডিং-এর ডিজাইন এবং নির্মাণকাজ সঠিক মানসম্পন্ন করা যায় সেদিকে প্রকৌশলীসহ নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি দেয়া উচিত। মনে রাখা দরকার বহুতল ইমারত এখন সময়ের চাহিদা।

সঠিকভাবে এনালাইসিসের পর প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ডিজাইন এবং তার ডিটেইলিং হওয়া দরকার। ডিজাইন এবং ডিটেইলিং-এর মূল লক্ষ্য হবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি যতটুকু সম্ভব অর্থের সাশ্রয়। ভবনের মালিক বা অর্থ

যোগানদাতার খরচ বাঁচানোর অনুরোধে যেন একজন ডিজাইনার প্রয়োজনের চেয়ে কম সাইজের কলাম বা বিম অথবা অপর্যাপ্ত পরিমাণ রিইনফোর্সমেন্ট ব্যবহার না করেন, সে দিকটা খেয়াল রাখতে হবে। যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং কারিগরি জ্ঞান-এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে যতটা সম্ভব সাশ্রয়ী ডিজাইন করা উচিত। এক্ষেত্রে ডিজাইনজনিত নিরাপত্তাও অনেকটা নিশ্চিত হতে পারে। আমরা যারা ভবন-এর মালিক তাদেরও মানসিকতা পরিবর্তন হওয়া দরকার। অনেকেই প্রয়োজনের তুলনায় কম রড ব্যবহার করাসহ ঢালাইয়ের কাজে কম সিমেন্ট দিয়ে খরচ কমিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন অথবা ছোট সাইজের কলাম দেয়ার পক্ষপাতী। অথচ অপরদিকে তারা বিল্ডিং-এর ফিনিসিং ম্যাটেরিয়াল যেমন টাইলস, কমোড, বেসিন, বাথরুম ফিটিংস ইত্যাদিতে খরচ করতে কোনো কার্পণ্য করেন না এমনকি ইটালি, ফ্রান্স বা স্পেন-এর বেশি মূল্যের ফিনিসিং ম্যাটেরিয়াল লাগিয়ে ব্যক্তিগত তুষ্টি ও তথাকথিত সামাজিক মর্যাদা অর্জন করার চেষ্টা করেন। ১৫ তলা একটি ভবনের মূল কাঠামো (ঝঃৎঁপঃঁৎধষ চধৎঃ) যার ওপর বিল্ডিং এবং এতে বসবাসকারীদের নিরাপত্তা নির্ভরশীল সেই অংশের নির্মাণব্যয় পুরো ভবনের নির্মাণব্যয়ের সর্বোচ্চ ৪০-৪২ শতাংশ। আরো উল্লেখ্য, যে রড কম দেয়ার জন্য এত চেষ্টা সমগ্র কাঠামো নির্মাণে সেই রড-এর বিপরীতে খরচ হয় মোট খরচের মাত্র ১৬ শতাংশ। আবার ডিটেইলিং করার সময় ডিজাইনার-এর কনস্ট্রাকশন মেথড-এর ওপর পর্যাপ্ত বাস্তব জ্ঞান থাকাও অতি জরুরি। নির্ভুল এনালাইসিস এবং ডিজাইন সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় ডিটেইলিং-এর অভাবে নির্মাণ কাজ বাধাগ্রস্ত হয় এবং রড বাঁধায় ক্ষেত্রবিশেষে এমন ভুল থেকে যেতে পারে যা ভবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে। ভূমিকম্পের বিরুদ্ধে নিরাপদ বহুতল ভবন নির্মাণে অবশ্যই নির্দিষ্টভাবে ভূমিকম্পের জন্যই প্রযোজ্য ডিটেইলিং অনুসরণ করতে হবে। এজন্য বিম কলাম জয়েন্টকে অধিকতর মজবুত করা দরকার। এবং তা করতে বিম কলাম জয়েন্টে এবং এর নিকটবর্তী অংশে অধিক ঘন ঘন করে টাই বা রিং দেয়া দরকার। এই টাই বা রিং-এর দুই প্রান্ত অবশ্যই ১৩৫° কোণে বাঁকিয়ে দিতে হবে; যা ভূমিকম্পে টাই বা রিং খুলে না যাওয়া নিশ্চিত করবে। এখনও বহু নির্মাণকাজে এই টাই বা রিং-এর প্রান্ত ৯০° কোণে রেখে দেয়া হয় যা খুব বিপদজনক। বীম-কলাম জয়েন্টে আরেকটি ব্যাপার খেয়াল রাখতে হয় তা হল, এখানে সাধারণত রড খুব ঘন ঘন হওয়ায় কংক্রিট ঠিকমতো কমপেকশন করা কষ্টসাধ্য। তাই ডিটেইলিং করার সময় জয়েন্টে যতদূর সম্ভব রডের আধিক্য পরিহার করতে হবে। এখানে বলে রাখা ভালো একটি বিল্ডিং-এর কাঠামোগত ডিজাইন যিনি করছেন তার শিক্ষাগত এবং পেশাগত যোগ্যতা এবং সেই সাথে নির্মাণকাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর পাশাপাশি একজন ডিজাইনারকে হতে হবে নীতিগতভাবে দৃঢ়চেতা একজন ব্যক্তিত্ব যিনি কোনো প্রলোভন বা ভয়-এর কারণে পেশার সাথে আপোষ করে বিল্ডিং-এ বসবাসকারীদের অমূল্য জীবন হুমকির মধ্যে ঠেলে দিবেন না। সম্প্রতি বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডে ডিজাইনারকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনা হয়েছে এবং ডিজাইনজনিত ত্রুটির কারণে কোনো বিল্ডিং ধ্বসে পড়লে ডিজাইনারকে সর্বোচ্চ ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

লোড এনালাইসিস, ডিজাইন ও ডিটেইলিং-এর পর যা বাকি থাকে তা হল নির্মাণকাজ। একমাত্র মানসম্পন্ন নির্মাণই পারে একটি সঠিকভাবে ডিজাইন করা ইমারত-কে নিরাপদ আবাস হিসাবে গড়ে তুলতে। এজন্য প্রয়োজন দক্ষ প্রকৌশলী, কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ এবং নিখুঁত তদারকি। তবে উপরের সবকটি উপাদান উপস্থিত থাকার পরও মানসম্পন্ন নির্মাণ সম্ভব না-ও হতে পারে যদি দক্ষ ও পর্যাপ্ত কর্মীবাহিনী না থাকে। জাপানী ম্যানেজমেন্টের ভাষায় একজন মানসম্পন্ন কর্মীই পারে মানসম্পন্ন কাজ করতে। সহজভাবে জাপানী ম্যানেজমেন্টের মূলমন্ত্র হল অপারেশন লেভেলে যারা কাজ করে অর্থাৎ নির্মাণ সাইটের ক্ষেত্রে যারা লেবার তারা যদি শ্রমের পাশাপাশি তাদের মেধার যথোপযুক্ত ব্যবহার করার সুযোগ পায় তবে তারা নিজ কাজের মর্যাদা উপলব্ধি করে নিজ দায়িত্বে মানসম্পন্ন কাজ উপহার দিতে পারে। তাতে তদারকি বা সুপারভিশন হয়ে ওঠে সহজ এবং সেই পণ্যের ক্রেতাও হয় পরিতুষ্ট। নির্মাণকাজে প্রচলিতভাবে যেসকল ভুলগুলো হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হল কলাম ঢালাইয়ে যথেষ্ট গুরুত্বের অভাব। সাধারণত দেখা যায় ছাদ ঢালাইয়ের আগে এবং ঢালাই চলাকালীন ব্যাপক তদারকি হয়, দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার উপস্থিত থেকে ছাদ ঢালাই পরিচালনা করেন। কিন্তু কলাম ঢালাই হয় অত্যন্ত উপেক্ষিতভাবে। হয়তো পুরো কাজটিই ফোরম্যান ও মিস্ত্রির তত্ত্বাবধানে হয়ে যায়। অথচ কলাম হল একটি বহুতল ইমারতে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর কারণ হল একটি কলাম তার উপরের সকল তলার লোড বহন করে যা বিম বা স্ল্যাব-এর ক্ষেত্রে ভিন্ন। বিম বা স্ল্যাব কেবল সেই তলার নির্দিষ্ট এরিয়ার লোড বহন করে। একটি বিল্ডিং-এর যেকোনো একটি কলামের একটি দুর্বল অংশ একটি সমগ্র ইমারতের ধ্বসে পরার কারণ হিসাবে যথেষ্ট। আর তাই বিল্ডিং-এর কলাম ঢালাই কোনোভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ তো নয়ই বরং এটাই সর্বোচ্চ গুরুত্ব বহন করে। কংক্রিটের ভেতরের লোহার খাঁচাকে মানবদেহের কঙ্কালের সাথে যদি তুলনা করা হয় তবে বলা যায়, কঙ্কাল যেমন মাংসপেশির সাহায্য ছাড়া নিজে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না তেমনি দুর্বল কংক্রিটের ভেতরে থাকা লোহার খাঁচাও অর্থহীন।

তাছাড়া কলাম ঢালাইয়ে আরো যেসব ব্যাপার খুব গুরুত্বের সাথে খেয়াল রাখতে হয় তা হল কলামকে পুরোপুরি খাড়া রাখা, কংক্রিট মিক্সিং-এ প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বা বালি ব্যবহার না করা, এবং কোনো অবস্থাতেই হ্যান্ড মিক্সড কংক্রিট ব্যবহার না করা। কোনো কারণে বৃষ্টি চলাকালীন সময়ে যদি ঢালাই করতেই হয় তবে পলিথিন দিয়ে ঢেকে নেয়া উচিত। যথাযথভাবে ডিজাইন ও নির্মাণ করা বহুতল ভবন ভূমিকম্পের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নয়। তাই বহুতল ভবন নির্মাণ উৎসাহিত করা দরকার। এর প্রধান কারণ মেগাসিটি ঢাকায় আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য বহুতল ইমারত নির্মাণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। 'মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা' ২০০৮ বাস্তবায়ন জাতীয় ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক যা ভবিষ্যতে ঢাকার আবাসন ব্যবস্থাকে একটি পরিবেশবান্ধব রূপ দিতে সক্ষম হবে। এই নতুন বিধিমালা বহুতল ইমারত নির্মাণ উৎসাহিত করবে। আর সম্প্রতি বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড আইনি প্রয়োগের

আওতায় আসায় ভূমিকম্পরোধী বহুতল ইমারত নির্মাণ নিশ্চিত করা অনেক সহজ হবে।

বাংলাদেশ ভূমিকম্পের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ একটি দেশ। অতি সম্প্রতি বেশ কয়েকটি ছোট ও মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প দেশের বিভিন্ন স্থানে আঘাত হেনেছে। বিশেষ করে ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে সংঘটিত ভূমিকম্পের ফলে বার্মা হয়ে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে আড়াআড়ি যে ফাটল দেখা দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে এতে বিশেষজ্ঞমহল বেশ শংকিত এই ভেবে যে বড় ধরনের যেকোনো ভূমিকম্প বাংলাদেশে অত্যাসন্ন। এই লেখার শুরুতে যা বলেছিলাম তা দিয়েই শেষ করছি। বড় ভূমিকম্পের ফলে যদি ঢাকার শতকরা ২০ ভাগ ভবনও ধ্বসে পড়ে তবে সবকিছু বাদ দিলেও কেবল সরু/রাস্তাঘাট-এর কারণেই উদ্ধারকাজ কতটা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি বলি ভূমিকম্প হলে যারা মারা যাবেন তারাই বরং বেঁচে যাবেন। যারা বেঁচে থাকবেন তারাই পড়বেন চরম বিপদে। কারণ তাদের উদ্ধার করার কোনো উপায়ই কারো থাকবে না। ফলে দিনের পর দিন না খেয়ে থেকে মরা মানুষের পাশে পচা দুর্গন্ধে তাদের ধুঁকে ধুঁকে মরা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। অনেকে বলে থাকেন কবে কোন আমলে ঢাকায় ভূমিকম্প হয়েছে সেটা কে দেখেছে? আমাদের আমলে তো নয়ই এমনকি বাপদাদার আমলেও কোনো ভূমিকম্প হয়নি। অতএব ভূমিকম্প হবেই এমন কথা বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে আমি বলব ভূমিকম্প হোক সেটা আমরা নিশ্চই কামনা করি না। তবে যদি হয়ে যায় তাহলে কী হবে? আমাদের ধর্মে মৃত্যু, কবর, হাসর, মিজান, পুলসেরাত, দোযখ, বেহেস্ত সম্পর্কে যেসব কথা বলা আছে তা যদি সবই মিথ্যা হয়ে যায় তাহলে তো কারোরই কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু যদি তা সত্য হয়ে পড়ে তাহলে কী হবে? তাছাড়া নিকট ভবিষ্যতে আমাদের দেশে ভূমিকম্প না হলেও আসামে যদি হয় তাহলে তার প্রতিক্রিয়া যে ঢাকাতে বা অন্যান্য শহরে ভয়াবহ হবে না সেই নিশ্চয়তা কোথায়? ভূমিকম্পের তো পাসপোর্ট বা ভিসার প্রয়োজন নেই দেশের সীমানা অতিক্রমের জন্য। এ ধরনের ভুল ধারণা যদি বিশেষত কোনো রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারদের মধ্যে থেকে থাকে তবে তা খুবই চিন্তার বিষয়।

অতএব ভূমিকম্প হবে কি হবে না, হলে কবে হবে সেই বিতর্কে না গিয়ে বরং হলে কী হবে সেটা ভাবাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। আর তাই মধুবাজার, সেন্ট্রাল রোড-এর মতো কোনো কোনো এলাকাবাসী ইদানীং নিজ এলাকার রাস্তা প্রশস্ত করতে সীমানা দেয়াল সরিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু ইলেক্ট্রিক পোলগুলো সরাতে সরকারের সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের গড়িমসির জন্য হয়তো রাস্তার প্রশস্ততা কার্যকর হল না। তাই জনগণের পাশাপাশি সরকারকেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

পরিশেষে ভূমিকম্প চলাকালীন সময়ে করণীয় সম্পর্কে কিছু পরামর্শ দিয়ে আমার লেখা শেষ করব।

ভূমিকম্প বিষয়ক সাবধানতা

ভূমিকম্প সময়কালীন করণীয়

- ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ছোটাছুটি না করে যতটা সম্ভব মাথা ঠাণ্ডা রাখা ।
- এ্যাপার্টমেন্টের নীচতলায় সকল গ্যাসলাইনের সুইচ এবং ইলেকট্রিসিটির মেইন সুইচ বন্ধ করা । লিফ্টে কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে লিফটের সুইচ বন্ধ করা । এ সকল কাজের জন্য এ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর কেয়ারটেকার, দারোয়ান এবং গাড়ির ড্রাইভারসহ যারা এ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর নীচতলায় অধিকাংশ সময় অবস্থান করে তাদের হাতে-কলমে কার্যকর প্রশিক্ষণ দেওয়া ।
- প্রত্যেক ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের নিজ নিজ ফ্ল্যাটের গ্যাসের চুলা এবং ইলেকট্রিসিটির মেইন সুইচ বন্ধ করা । মেইন সুইচ ফ্ল্যাটের ভিতর না থাকলে সকল ইলেক্ট্রিক্যাল সরঞ্জাম যেমন টিভি, ফ্রিজ বন্ধ করা ।
- মাথার উপর বালিশ চাপা দিয়ে অতিদ্রুত ডাইনিং টেবিলের নীচে আশ্রয় নেওয়া । ভূমিকম্পের প্রাথমিক ধাক্কা কাটানোর পরেই সকলে ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে সিঁড়িঘরে জমায়েত হওয়া । তা সম্ভব না হলে টেবিলের নীচেই অবস্থান করা । মনে রাখতে হবে ভূমিকম্পের পরে দ্বিতীয় ধাক্কা (আফটার শক্) আরো সঠিক জোরালো হয় ।
- প্রত্যেকের নিজ নিজ মোবাইল ফোন সঙ্গে রাখা । সঙ্গত কারণেই ফোনে পর্যাপ্ত চার্জ থাকা জরুরি । সেই সাথে চার্জ আছে এমন টর্চলাইট হাতে রাখা ।
- বিল্ডিং-এর নীচের ফ্লোরে অবস্থানরত বাসিন্দারা যারা ৫-১০ সেকেন্ডের মধ্যে বিল্ডিং-এর বাইরে যেতে পারবেন তাদের খোলা জায়গায় বা মাঠে বের হয়ে বিদ্যুতের খুঁটি থেকে দূরে অবস্থান নেওয়া । বের হওয়া সম্ভব না হলে বিল্ডিং -এর সেই সব মজবুত জায়গা, যেমন মজবুত কলাম এবং কাছাকাছি অবস্থানরত কংক্রিটের দেয়ালের আশেপাশে থাকার চেষ্টা করা । দরজা, জানালা, বারান্দা এবং ভেন্টিলিটার থেকে দূরে থাকা । তাছাড়া ফ্রিজ, এসি ইত্যাদি থেকেও দূরে থাকা ।
- উপরের দিকের ফ্লোরগুলোর বাসিন্দারা নীচে নামা সম্ভব না হলে ছাদে আশ্রয় নেওয়া । পরবর্তীতে উদ্ধারকর্মীরা যেন তাদেরকে সেখান থেকে সহজে উদ্ধার করতে পারে ।
- কোনোক্রমেই লিফট ব্যবহার না করা । ভাঙা বা জরাজীর্ণ দরজা বা জনাকীর্ণ সিঁড়িঘর থেকে দুরে থাকা ।
- সম্ভব হলে দ্রুত জুতা পরে নেওয়া যেন পা আঘাত থেকে রক্ষা পেতে পারে ।

ভূমিকম্প পরক্ষণে করণীয়

জরুরি সাহায্যের জন্য পথ রাখা

পানি নষ্ট না করা

ফার্স্ট এইড ব্যবহার করা
পরবর্তী ভূমিকম্প এবং শক-এর জন্য প্রস্তুত থাকা

ভূমিকম্প পূর্ববর্তী সাবধানতা

প্রয়োজনে অতিদ্রুত যাতে সাহায্য পাওয়া যায় সেজন্য প্রত্যেক বাসার ভেতরে একটি Fire Extinguisher (অগ্নিনির্বাপক) রাখা।

Fire Extinguisher (অগ্নিনির্বাপক) গুলোতে নিয়মিত জবভরষষ করে রাখা এবং এগুলোর ব্যবহার বিল্ডিং-এর ছোট-বড় সকলেই এমনকি কাজের লোকেরও জানা থাকা। এজন্য Fire drill (অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ)-এর আয়োজন করা খুব কার্যকর।

জেনারেটরের জন্য দরকারী ডিজেল প্রয়োজনের অতিরিক্ত মজুত না করা।

এই ডিজেল দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। তাছাড়া ডিজেলের কারণে সৃষ্ট আগুন নেভানোর জন্য কয়েক বালতি বালি সু-শৃঙ্খলভাবে নীচতলায় জেনারেটর রুম-এর নিকটবর্তী স্থানে রাখা।

[মো. আব্দুল আউয়াল একজন পুরকৌশলী (সিভিল ইঞ্জিনিয়র)। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লি.। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, রিহ্যাব। ইস্যুভিত্তিক প্রবন্ধ/ নিবন্ধ লিখে থাকেন।]

ভূমিকম্প ও ভবন নির্মাণ: যা হবার কথা নয়

শি কা ন্দা র হা য়া ত সি দ্দি কী

কতকাল কতযুগ ধরে মানুষ ভূমিকম্প নিয়ে ভাবছে। ভূমিকম্প মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষের ধারণা ভূমিকম্প মানে ধ্বংস, কেননা এটা প্রাকৃতিক এক বিপর্যয়। আমরা নিশ্চয় বুলেট-প্রুফ জ্যাকেট (Bullet Proof Jacket)-এর কথা জানি এবং তার কার্যকারিতা সম্পর্কেও আমরা জানি অর্থাৎ আমি মূলত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথাটি বোঝাতে চাচ্ছি। ঠিক তেমনি ভূমিকম্প-প্রতিরোধক (Earthquake proof) স্থাপনা নির্মাণ করা সম্ভব, যা মানবসভ্যতাকে রক্ষা করবে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে সেটা কী

করে সম্ভব। প্রশ্ন উঠতে পারে বাংলাদেশে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও কেন এতকাল ভূমিকম্প-প্রতিরোধক ভবন নির্মাণ করা হয়নি? কিছু সংখ্যক ভবন ছাড়া, বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়েছে? আরও একটি প্রশ্ন, ভবন নির্মাতারা কেনই-বা এতটা উদাসীন এক্ষেত্রে? কারা এর জন্য দায়ী? আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, বাংলাদেশের বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এ্যাক্ট ১৯৫২ (Building Construction Act 1952) নন-আর্থকোয়েক প্রুফড ভবন বা অন্যান্য ত্রুটিপূর্ণ স্থাপনা নির্মাণের জন্য পুরোপুরি দায়ী, যা দেশটিকে এখন ধ্বংসের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে; যেটা পারমাণবিক যুদ্ধের চেয়েও বেশি বাড়িয়ে তুলবে মানুষের ভোগান্তি। কারণ এতে ভূমিকম্প সেফটি সংক্রান্ত কোনো নির্মাণ বিধিমালা নেই। এমনকি কোনো সতর্কবাণীও নেই। ১৯৩৫ সালে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (Geological Survey of India) সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করার জন্য আর্থকোয়েক জোনেশন ম্যাপ (earthquake zonation map) প্রণয়ন করে।

পরবর্তীকালে ১৯৫২ এ্যাক্ট-কে অনুসরণ করে অন্যান্য বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে ঢাকা মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৭-এ ভূমিকম্প ব্যাপারে সতর্কবাণী রয়েছে, তবে বিস্তারিতভাবে কিছু লেখা না থাকাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটি বোঝা একদম মুশকিল। সাধারণ মানুষেকে এ ব্যাপারটা সহজভাবে বোঝাতে না পারলে তাদের মধ্যে সঠিকভাবে আর্থকোয়েক পাবলিক এ্যাওয়ারনেস (earthquake pubic awareness) গড়ে উঠবে না। সে কারণে আর্থকোয়েক প্রুফ বিল্ডিং (earthquake proof building) নির্মাণের প্রবণতা শূন্যের ঘরে থাকছে। এই বিধিমালাতে জনসাধারণের অবগতির জন্য বলা হয়নি যে

১. ওপেন গ্রাউন্ড ফ্লোর কার পার্কিং স্পেইস রেখে বা অন্য কোনো তলাতে এই ধরনের ওপেন ফ্লোর স্পেইস (open floor space) রেখে ভবন নির্মাণ করা যাবে না, যাকে বলা হয় সফ্‌ট স্টেরি কন্ডিশন (soft story condition); এ জাতীয় ভবনগুলোর ক্ষেত্রে ভূমিকম্পের সময় খুব ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ সিসমিক ইনারসিয়াল এস্ট্রাকচারাল ফেইলইউর (seismic inertial structural failure) হবে।

২. বিধিমালাতে জনসাধারণের অবগতির জন্য উল্লেখ নেই যে ভবনটি সিমেট্রিকাল (symmetrical) হতে হবে লংগ (long) এবং সর্ট এ্যক্সিস (short axis) বরাবর; যাতে করে ভবনটি ভূমিকম্পের সময় ঘুরে না যায় যাকে বলা হয় টরশনাল ফেইলেউর (torsional failure)। এটা এড়াতে হলে ভবনের কলাম গ্রিড (column grid)-কে প্রথমে সিমেট্রিকাল (symmetrical) করে সাজাতে হবে তারপর আরকিটেকচারাল প্লান (architectural plan) করতে হবে। কিন্তু বর্তমানে প্রথম করা হচ্ছে আরকিটেকচারাল প্লান (architectural plan) তারপর করা হচ্ছে কলাম গ্রিড প্লান (column grid) যা ভবনটিকে করে ফেলবে সম্পূর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ।

৩. ২০০৭-এর ইমারত বিধিমালাতে জনসাধারণকে এটাও বলা হয়নি যে গতানুগতিক ৯০ ডিগ্রি স্টিরাপ হুক (stirrup hook)-এর পরিবর্তে ৪৫ ডিগ্রি স্টিরাপ হুক (stirrup

hook) ব্যবহার করতে হবে কলাম এবং বিমে, যা ভিতরের কংক্রিটকে সহজভাবে ধরে রাখতে পারবে।

৪. এই বিধিমালাতে জনসাধারণকে এটাও বলা হয়নি আর্থকোয়েক প্রতিরোধক ভবনে শিয়ার ওয়াল (Shear wall) এর প্রয়োজন কেন; এবং ঝুঁকিপূর্ণ ভূমিকম্পের সময় ভবনটিকে মারাত্মক ক্ষতির হাত থেকে কীভাবে এটাকে ব্যবহার করতে হবে ।

আমি এখানে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি উপরে বর্ণিত (১-৪) সিসমিক টেকনিক্যাল ইনফরমেশন (seismic technical information) গুলো সাধারণ জ্ঞানেরই (মবহবৎধষ শহড়ষিবফমব) মধ্যে পরে যা বাধ্যতামূলক হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং এটা আর্থকোয়েক পাবলিক এ্যাওয়ারনেস (earthquake pubic awareness) সৃষ্টি করবে। বর্তমানে সাধারণ মানুষ উপরিউক্ত বিষয়গুলো মোটেই জানে না। এমনকি অনেক স্ট্রাক্চারাল ইঞ্জিনিয়ার (structural engineer) এবং আর্কিটেক্টও (architect) এই বিষয়গুলো বোঝে না। বর্তমানে ননসিস্মিক রেজিস্টিভ (non seismic resistive) ভবন নির্মাণের এটাই একমাত্র কারণ। বর্তমানে ডিপ্লোমা এবং গ্রাজুয়েট লেভেলের পাঠ্যপুস্তকে উপরিউক্ত বিষয়গুলো সংযোজন করতে হবে। তাহলেই বাংলাদেশ ভূমিকম্প প্রতিরোধক ভবন নির্মাণের দিকে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

এবার আসা যাক একটি মৌলিক বিষয়ের দিকে; বর্তমানে সিসমিক হেল্‌থ কন্ডিশন অফ বাংলাদেশ (seismic health condition of Bangladesh) খুব খারাপ এবং অবনতির দিকে যাচ্ছে; এর মূল কারণ ভারত মহাসাগরে সুমাত্রার নিকট ২৬ ডিসেম্বর, ২০০৪ সালে ৯.৩ মাত্রার অতিকায় বড় ধরনের ভূমিকম্প হয় যার কারণে বিশাল আকারের সুনামির সৃষ্টি হয়েছিল। যা পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর সমগ্র মহাসাগরে ছড়িয়ে পড়ে। এই ভূমিকম্পের স্থায়িত্বকাল ছিল দশ মিনিট যা লণ্ডভণ্ড করে দেয় এই অঞ্চলের সিসমিক ইকুয়েলিব্রিয়াম কন্ডিশন (seismic equilibrium condition) এবং এর প্রভাব বাংলাদেশের ওপরেও এসে পড়ে। বাংলাদেশে এই ভূমিকম্পের প্রভাবে অনেক ডরমেন্ট ফল্ট লাইন (dormant fault line) সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর মানে হচ্ছে যেখানে রেকর্ডেড ইতিহাসে ভূমিকম্পের এপিসেন্টার ছিল না এখন সেখানে সেটা অবস্থান করছে। আবার এটাও ঠিক যে কিছু কিছু রেগুলার ফল্টলাইন আরও বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ মধুপুর ফল্টলাইন, চট্টগ্রামের অনেক ফল্টলাইন ইত্যাদির কথা বলা যায়। অন্যদিকে ডাউকি ফল্ট লাইন (Dauki fault line) ধীরে ধীরে সেগমেন্টটেড (segmented) হয়ে যাচ্ছে ভেরিএ্যবেল (variable) নর্থ-ইস্ট গতির জন্য ফল্টলাইন বরাবর। হয়তো এটা ডরমেন্ট হয়ে যাবে। অত্রএব এখন আসল কথাতে আসা যাক, সেটা হচ্ছে ভূমিকম্পের প্রকৃতি বর্তমানে ভিন্নরূপ ধারণ করেছে বাংলাদেশের মধ্যে। যার কারণে বাংলাদেশের মধ্যে সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু অপ্রত্যাশিত ভূমিকম্প হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ যশোর শহর (৫ আগস্ট, ২০০৬), রাজশাহী শহর (৫ জুলাই, ২০০৮), ময়মনসিংহ

শহরের নিকট পরপর দুটি ভূমিকম্প (২৬ জুলাই, ২০০৮) এবং মধুপুর ফল্টলাইনে সেপ্টেম্বর, ২০০৮ সালে বিকেল ৫-১৫ মিনিট থেকে রাত্র ১২টা পর্যন্ত ৮-১০ বার ভূমিকম্প হয়েছে। দিনাজপুরের ভূমিকম্প (২০ মে, ২০০৮) এবং কুমিল্লার দক্ষিণে চৌদ্দগ্রামের ভূমিকম্প যা ৩ কি. মি. ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে। আবার রাখাইন ফল্টলাইনের কারণে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল এবং খুলনার সিস্‌মিক হেজারড অনেক বেড়ে গিয়েছে। রাখাইন ফল্টলাইনে ৭.৫ থেকে ৮.৫ রিখটার স্কেলের ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যেটা ১৭৬২ সালের মতো সুনামি সৃষ্টি করতে পারে। তাই এপিসেন্টার থেকে দূরত্বভেদে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল এবং খুলনা অঞ্চলে ভূমিকম্পের তীব্রতা হতে পারে ৯ থেকে ৭ মাত্রা এম.এম.আই. স্কেলে। তাহলে ভূমিকম্প প্রতিরোধক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে পিজিএ-এর মান একদম পাল্টে যাচ্ছে। যার সঙ্গে বিএনবিসি ৯৩ এবং সিস্‌মিক জোনেশন ম্যাপের কোনো মিল নাই। তাহলে কী করতে হবে এখন? মধুপুর ফল্টলাইন প্রায় ১০০ কি. মি. লম্বা এখানে ৬.৫ থেকে ৭.৫ রিখটার স্কেলের ভূমিকম্প হতে পারে যা ১৫০ কি. মি. রেডিআস-এর মধ্যে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে পারে। ঢাকা শহরের আধুনিক ভবনগুলো নির্মাণ করা হয়েছে ৭ এমএমআই স্কেল ধরে বিএনবিসি ৯৩ কোড অনুসরণ করে। বলে রাখা ভালো যে জেওমেট্রিক করোলারি অনুযায়ী একটিভ বা ডরমেন্ট ফল্টলাইন যেগুলো যশোর, রাজশাহী, মধুপুর এবং চট্টগ্রাম ফল্টলাইনসমূহের সঙ্গে সমান্তরাল রয়েছে তা এখন পুরোপুরিভাবে এ্যাকটিভ অবস্থাতে আছে। যা বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে বড় ধরনের ভূমিকম্প ঘটাতে পারে, যা বিএনবিসি ৯৩ কোডের সিস্‌মিক চেপ্টারের সঙ্গে মোটেই মিলছে না। এই সমস্ত অপ্রত্যাশিত ভূমিকম্পগুলোকে কোয়েক মাইন (য়ঁধশব সরহব) হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে যা অনেকটা ল্যান্ডমাইনের মতো; যেগুলো সিস্‌মিক ইকোলিবেরিয়াম কন্ডিশন নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর সিস্‌মিক এক্সটার্নাল ফোর্স বা এস্ট্রেস ট্রান্সফার এর কারণে এক্সপ্লোড করতে পারে যার বহিঃপ্রকাশ লোকাল বা রিজিওনাল ভূমিকম্প। বাংলাদেশে যেহেতু এখানে-সেখানে অবস্থিত কোয়েকমাইন এবং রেগুলার ফল্টলাইনের ওপর এদেশ বসে আছে, ফলে যে কোনো সময়ে যে কোনো মাত্রায় সক্রিয় হতে পারে। সেকারণে ফাউন্ডেশনের সয়েল কন্ডিশনের ওপর নির্ভরশীল ভূমিকম্পের ইনটেনসিটি ধরে ডিজাইন করতে হবে। এ ব্যপারে আমি বলব যেহেতু আর্থকোয়েক ফিজিক্স প্রোব্যবেলেস্টিক সেহেতু মাটির বেয়ারিং ক্যাপাসিটি অনুযায়ী অপ্রত্যাশিত মেক্সিমাম ইনটেনসিটি ধরতে হবে যার মাত্রা হচ্ছে ভরাট জমি বা যেখানে আল্টিমেট বেয়ারিং ক্যাপাসিটি চার টন অর্থাৎ চার হাজার কেজি প্রতি বর্গফুট– সেখানে ভূমিকম্পের সর্বোচ্চ ইনটেনসিটি এমএমআই স্কেলে ৯ এবং চারের অধিক ছয় টন থেকে আল্টিমেট বেয়ারিং ক্যাপাসিটি অর্থাৎ ছয় হাজার কেজি প্রতি বর্গফুট সেখানে ভূমিকম্পের সর্বোচ্চ ইনটেনসিটি এমএমআই স্কেলে ৮ ধরে ভূমিকম্প প্রতিরোধক ভবন নির্মাণ করতে হবে। পরিশেষে আমি বলব এই সমস্ত কারণের জন্য বিএমবিসি ৯৩ কোডে বর্ণিত সিসমিক পিজিএ মান এবং জোনেশন ম্যাপ বাতিল বলে ঘোষণা করতে হবে। বর্তমানের স্থাপনাগুলো যুগযুগ ধরে টিকে থাকবে, যেমনটা রয়েছে চীনের

মহাপ্রাচীর, মিশরের পিরামিড এবং আগ্রার তাজমহল। এটা করলে বাংলাদেশের নতুন ভবনগুলো সম্ভাব্য সব ধরনের ভূমিকম্প প্রতিরোধ করতে পারবে এবং যে ভবনগুলো ভূমিকম্প প্রতিরোধক হিসাবে নির্মাণ করা হয়নি তা রেটরোফিট করতে হবে যার ফলে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে দেশ, সম্পদ, জান এবং মাল।

[শিকান্দার হায়াত সিদ্দিকী একজন পুরকৌশলী (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার)। কো-অর্ডিনেটর, সিস্‌মিক টেকনিক্যাল আর্থকোয়েক এন্ড সুনামি সেফটি ম্যানেজমেন্ট। ভূমিকম্প ও সুনামি বিষয়ক নিবেদিত গবেষক। এ সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি নানা রকম তথ্য দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।]

ভূমিকম্পের আশু বিপদ ও পরিবেশসম্মত বসবাস

মু শ ফি কু র র হ মা ন

দেশের একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট সরকারের কাছে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি রোধে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করার বিষয়ে রুলজারি করেছে। একই সাথে উক্ত সরঞ্জামসমূহের তালিকা হাইকোর্ট সমীপে পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছে। আবেদনের বিষয়টি কেউ কেউ অভিনব ভাবতে পারেন; তবে এটাও তো সত্যি, সম্প্রতি দেশে সংঘটিত বেশ কটি ভূমিকম্প মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। তদুপরি পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে নিকট অতীতে বেশকটি ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। তাতে জীবন ও সম্পদের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আধুনিক যোগাযোগ ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তির কারণে বিশ্বের যে কোনো স্থানে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ও ধ্বংসাত্মক ঘটনাবলী ঘটলে দ্রুতই তা সবার নজরে আসছে। তাছাড়া আমাদের দেশে অতীতে বড় মাপের বেশ কিছু ভূমিকম্প হয়েছে। বিভিন্ন আলোচনা / লেখালেখিতে মানুষ জানতে পারছে অতীতের বিপর্যয়কর বিভিন্ন ভূমিকম্প ও তার প্রভাবসম্পর্কিত বিশ্লেষণ। ভূমিকম্প নিয়ে আলোচনা, লেখালেখিতে ভূতত্ত্ববিদ, প্রকৌশলীসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত অনেক বিশেষজ্ঞ ও ব্যবস্থাপকগণ নিয়মিতই আমাদের দেশে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির বড়মাপের ভূমিকম্পের জন্য সময় হয়ে

গেছে বলে আশংকা প্রকাশ করছেন। মহানগরী ঢাকাসহ দেশের ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাগুলোতে মাঝারী মাপের ভূমিকম্প সংঘটিত হলে কী ভয়াবহ পরিণত হতে পারে তা নিয়ে বিভিন্ন প্রাক্কলন ও দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের অপ্রস্তুত অবস্থা নিয়ে আশংকা প্রবল। এসাথে দেশে ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ-সম্পর্কিত বিধিবিধান ও বিল্ডিং কোড মেনে না চলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার বেহাল দশা মানুষকে আরও বেশি ভাবিত করেছে।

ইতোমধ্যে রাজধানী ঢাকার কয়েকটি বহুতল ভবনের অকস্মাৎ ধ্বসে পড়া বা হেলে যাওয়া, ভবনের ভিতরে আটকে পড়া মানুষের করুণ ও মর্মান্তিক অপমৃত্যু, স্বজনদের আহাজারির জবাবে উদ্ধার সরঞ্জাম ও উদ্ধার তৎপরতার অপ্রতুলতা ও সমন্বয়হীন অসহায়ত্ব মানুষের শংকাকে আরও বাড়িয়েছে। সংগতভাবেই মানুষ জিজ্ঞাসা করে একটি ভবন ভেঙে পড়লেই যদি আমাদের এত ধকল ও অসামর্থ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাহলে দৈব দুর্বিপাকে মাঝারী বা প্রবল কোনো ভূমিকম্প সংঘটিত হলে আমাদের কী হবে?

অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার, বাসস্থান, বাণিজ্যিক স্থাপনা ও শিল্প কারখানা নির্মাণে আমাদের কার্যকর কোনো উন্নয়ন কৌশল নেই। ফলে কোনো শিল্প কারখানায় আগুন লাগলে অসহায়ভাবে দগ্ধ হয় ঐ কারখানা ও তার সন্নিহিত বাসাবাড়ির মানুষ। আবার শিল্প ও বাণিজ্যিক ভবনের বর্জ্য অনায়াসে দূষিত করে আমাদের স্কুল, হাসপাতাল, আবাসস্থলের পরিবেশ। রাস্তাঘাট এমনিতেই আমাদের শহরগুলোতে সীমিত; এরই মধ্যে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সংযোগ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার জোড়াতালি দিয়ে নগরজীবন কোনোরকমে চলছে। রাস্তায় পথ চলতে চলতে তাই হঠাৎ দেখা যায় রাস্তার নীচে অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত বা ত্রুটিপূর্ণ সুয়েজ লাইন ভেঙে অচলাবস্থা তৈরি হয় প্রায় নিয়মিত। হঠাৎ কোনো গ্যাস পাইপলাইন ফুটো হয়ে প্রধান সড়কে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে আগুন। বিদ্যুতের খুঁটিতে ঝুলন্ত ট্রান্সফরমারে কাক বা বাদুর বসে বিকট শব্দে নিয়মিত বিস্ফোরণ ঘটায়, যার পরিণতিতে সন্নিহিত এলাকা দীর্ঘ সময় ধরে অন্ধকার হয়ে পড়ে। মহানগরীর মাত্র কয়েকটি ফ্লাইওভার, ওভারব্রিজ রাস্তায় গাড়ির চাপ কমানোর বদলে প্রায়শ শহরে বিরক্তিকর যানজট লাগিয়ে রাখে। এ রকম শহর বা জনপদের বাসিন্দারা ভূমিকম্পের আঘাতে দেশে কী অচলাবস্থা দেখবে তা নিয়ে আতংকিত বোধ করলে তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এ কথা সত্যি, আমাদের সম্পদ সীমিত এবং তার চেয়েও সীমিত যৌক্তিক ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে সীমিত সম্পদ ব্যবহারের সামর্থ্য ও সংস্কৃতি। প্রচুর সম্পদশালী দেশগুলোই ভূমিকম্পের মতো ধ্বংসাত্মক প্রাকৃকিত দুর্যোগের প্রস্তুতির জন্য ব্যাপক সম্পদ বরাদ্দ রাখতে পারে না। তদুপরি আমাদের সাধারণ প্রবণতার কারণেই সামান্য সম্পদ নিয়ে এক ধরনের কাড়াকাড়ি লেগেই থাকে। ফলে ভূমিকম্পের মতো অনির্দিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বা ভূমিকম্পের আঘাত এলে তা থেকে উদ্ধারের আয়োজন প্রায়শই তাই আলোচনার মধ্যেই সীমিত থাকে।

সাধারণভাবে বলা হয়, ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য 'স্ট্রাকচারাল ও নন-স্ট্রাকচারাল' প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর মধ্যে স্ট্রাকচারাল প্রশমন ব্যবস্থা বলতে প্রধানত নির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকির মুখে যা কিছু ভৌতিক স্থাপনা রয়েছে সেগুলোর উন্নয়ন, সুনির্দিষ্ট আইন ও কোড মেনে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেখানে আশ্রয়স্থল নির্মাণ, পূর্তবিভাগসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের মাঝে ভূমিকম্প ঝুঁকি ও তা প্রশমন বা ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করবার জন্য করণীয় সম্পর্কে সচেতনা, স্পষ্টতা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে নির্মাণ-সংক্রান্ত কাজকর্মে সমন্বয় সাধন ও সামর্থ্য সৃষ্টি করা প্রয়োজনীয়।

অপর দিকে নন-স্ট্রাকচারাল প্রশমন ব্যবস্থার অধীনে ভূমিকম্প সম্পর্কে সচেনতা সৃষ্টি, প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন ও কমিউনিটিকে সাথে নিয়ে ব্যবস্থাপনা, সংশ্লিষ্ট নীতি ও কর্মকৌশলকে বোঝানো হয়।

ভূমিকম্পের পূর্ণাঙ্গ ও আগাম নির্ভুল পূর্বাভাস দেবার মতো প্রস্তুতি এখনো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের দেয়নি। তবে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় ভৌতিক নির্মাণকাজ সমন্বিতভাবে করা, সুনির্দিষ্ট বিল্ডিং কোড মেনে চলা ও গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায় দুর্ঘটনা প্রশমন ও দ্রুত দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের সামর্থ্য গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ।

ভূমিকম্পের ফলে কেবল ভবন, সেতু, বিদ্যুতের খুঁটিই ভেঙে পড়ে না, গ্যাস পাইপলাইন ফেটে যায়, পানিপ্রবাহ অচল হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, আগুন লাগে এবং উদ্ধার তৎপরতা শুরু করবার সুযোগ ও সীমিত সামর্থ্যগুলোকেও সংকুচিত করে। তাছাড়া প্রশিক্ষণ ও সমন্বিত উদ্ধার ও ক্ষয়ক্ষতি ব্যবস্থাপনার ভৌতিক কাঠামোগত সীমাবদ্ধতায় ভূমিকম্প মারাত্মক মানসিক আঘাত (শক্) সৃষ্টি করে। মানুষ প্রচণ্ডভাবে হতবিহবল হয়ে পড়ায় মানুষের যে সীমিত সামর্থ্য আছে তারও সুষম ও যৌক্তিক ব্যবহার অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ কারণে মানুষের সচেতনতা সৃষ্টি ও পরস্পরের জন্য বিপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবার সংস্কৃতিকে বিকশিত ও কার্যকর করা খুবই প্রয়োজন।

ইতোমধ্যে আমাদের দেশে সাইক্লোন ও বন্যার মতো দুর্যোগ মোকাবেলার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অভিজ্ঞতা ও ব্যবস্থাপনা সামর্থ্যের অগ্রগতি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কমিউনিটি সম্পৃক্ততা বেশ কার্যকর ও সময়োপযোগী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তাছাড়া ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে সচেতনতা সৃষ্টি, নির্মাণ কর্মকাণ্ডে সুনিদিষ্ট নির্মাণ কোড মেনে চলার বাধ্যবাধকতা ভূমিকম্পের ধ্বংসযজ্ঞ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বিশেষজ্ঞগণ দাবি করেন যে, ইতোমধ্যে প্রণীত 'জাতীয় বিল্ডিং কোড' মেনে ভৌতিক নির্মাণকাজ করা গেলে ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে আনা সম্ভব। এজন্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি,

প্রকৌশলী, স্থপতি, মিস্ত্রিসহ বিশাল প্রশিক্ষিত ও সচেতন কর্মীবাহিনীকে সমন্বিতভাবে কাজ করা প্রয়োজন।

ইতোমধ্যে যে স্থাপনা, ভবন নির্মিত হয়েছে সেগুলোর দৃঢ়তা, দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা কীভাবে বাড়ানো যায় তা নিয়েও বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীগণ বিভিন্ন পরামর্শ দিকনির্দেশনা তৈরি করেছেন। এগুলো পর্যায়ক্রমে হলেও বাস্তবায়ন শুরু করতে হবে।

জাতীয় ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন ও অনতিবিলম্বে কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে হবে। এতে অন্তত আবাসিক এলাকায় শিল্প ও বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মাণ ও পরিচালনার যথেচ্ছাচার অনেকটুকু রোধ বা সীমিত করা যাবে। তাছাড়া গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, যোগাযোগ অবকাঠামোর যৌক্তিক সামর্থ্য গড়া ও তার সর্বোত্তম নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার। দুর্যোগকালে এ সকল সার্ভিস সুবিধা বঞ্চিত হওয়ার ভয়াবহ পরিণাম অবশ্যই ভালো নয়। অন্তত দুর্ঘটনায় প্রধান গ্যাসলাইন দ্রুত স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ করার ব্যবস্থা তো করা যায়। ভূমিকম্প আমরা হয়তো প্রতিরোধ করতে পারি না, কিন্তু এর ক্ষয়ক্ষতিকে সীমিত করবার চেষ্টা তো করতেই পারি।

আমাদের জল নিষ্কাশনের প্রাকৃতিক পথগুলোতে যদি ঘরবাড়ি বানানো হয়; ভবন স্থাপনা নির্মাণের সময় ভূতাত্ত্বিকদের পরামর্শ না নিয়ে প্রাকৃতিক ফাটলের ওপর স্থাপনা গড়া হয়, তাতে কেবল জলাবদ্ধতার আশু বিপদ নয়, ভূমিকম্পের মারাত্মক টার্গেট হওয়াটাও অবধারিত হয়।

এখানেই সমন্বিত পদক্ষেপ ও বিদ্যমান জ্ঞান-ভাণ্ডারকে কাজে লাগানোর কৌশল ও সংস্কৃতির বিষয়টি সামনে চলে আসে। আমরা যদি আমাদের দখলী সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার সাহস অর্জন করতে পারি তাহলে ভূমিকম্পের মত দুর্যোগও আমাদের অনেকটুকুই ছাড় দিতে বাধ্য হবে।

পরিবেশসম্মত বসবাসের শিক্ষা তাই কেবল বিশুদ্ধ বাতাস, প্রাকৃতিক উন্মুক্ত স্থান, পরিচ্ছন্ন জলের আধার, দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ার তাগিদে নয়, বরং পরিবেশসম্মত বসবাসের বিষয়টির সাথে ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগে ধ্বংসযজ্ঞ থেকে দ্রুত বেরুবার পথ নির্মাণও সম্পর্কিত।

[ড. মুশফিকুর রহমান। প্রাবন্ধিক, পরিবেশ বিষয়ক লেখক।]

মহাবিপর্যয়ের মুখোমুখি বাংলাদেশ

আ সি ফ

১৯৭৬ সালে চীনের শিল্পনগরী তাংশাংয়ে ঘটেছিল প্রচণ্ড ভূমিকম্প। মারা গিয়েছিল প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ। ক্ষতি হয়েছিল কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। গত কয়েক বছর আগে মেক্সিকো নগরীর ভূকম্পন তো ইতিহাসের এক ভয়ঙ্কর ক্ষত। ১৯৭৫ সালে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হিমালয়ের ব্যাপক এলাকা জুড়ে ঘটে ভয়াবহ ভূকম্পন। সেটা জানুয়ারির গোড়ায়। তার কয়েকদিন পর ১৯ জানুয়ারি ভারত-তিব্বত সীমান্তে হিমাচল প্রদেশের কিন্নর জেলা এবং তার আশপাশের কয়েকটি অঞ্চলে ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেখে ভূ-বিজ্ঞানীরা বিচলিত হয়ে ওঠেন। দু'টি কারণে এক. হিমালয়ের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন প্রলংয়কর ভূকম্পনের নজির এই প্রথম। দুই. যদি এই ভূকম্পন বিশেষ একটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকত, সে ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয়তো কিছুটা লঘু করে দেখা যেত; কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। প্রথমে হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, কয়েকদিন পর ভারতের উত্তরে হিমাচলে, দুটি ঘটনার মধ্যেই যথেষ্ট মিল। অতর্কিতে পাহাড় কেঁপে উঠেছে; মুহূর্তে বড় বড় ফাটলের সৃষ্টি। ফাটল থেকে বিচ্ছিন্ন পাথরের স্তূপ প্রচণ্ড গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর। দেখেশুনে ভূ-বিজ্ঞানীরা তখন মন্তব্য করেছিলেন, পাকিস্তান এবং ভারতের ঘটনা দুটি কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। দীর্ঘকাল সাম্য অবস্থায় থাকার পর হিমালয়ের গভীরে অবস্থানরত প্রস্তরীভূত অঞ্চল হয়তো তার ভারসাম্য হারাতে শুরু করেছে। আর সেটাই যদি সত্যি হয়, এখানেই তার শেষ নয়। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর বৃহত্তম এই পর্বতমালার অন্য অঞ্চলও অস্থির হয়ে উঠবে এবং তার প্রভাব গিয়ে পড়বে হিমালয়ের নিকটবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায়। স্বাভাবিকভাবে তারমধ্যে বাংলাদেশও থাকবে।

কেন ভূমিকম্প হয়

ভূমিকম্প এমনই ঘটনা, একমাত্র ঘটে যাওয়ার পরই বোঝা যায় যার স্বরূপ। এ ব্যাপারে আগাম আভাস জেনে নিয়ে জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষা করা যায় কি না তার চেষ্টা করে যাচ্ছেন সিসমোলজিস্ট বা ভূকম্পন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু নিশ্চিত সাফল্য বলতে যা বোঝায় সেটা পাওয়া এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। ভূপৃষ্ঠে ভূমিকম্পের কারণ বিশ্লেষণে বহুকাল ধরে বিশেষজ্ঞরা নানা মতামত ব্যক্ত করেছেন। বর্তমানে সেসব মতামতের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তাতে

এর উৎসের নির্ভরযোগ্য তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এ তত্ত্বের নাম ইলাস্টিক রিবাউন্ড মেকানিজম। ডক্টর রিখটার এই তত্ত্ব ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ পাশাপাশি অবস্থিত শিলার স্তর কোনো সময়ে যদি অস্বাভাবিক চাপের মুখে পড়ে তখন সেই শিলাগুলোর কোনো দুর্বল অংশ দিয়ে তা ছিঁড়ে যেতে বাধ্য হয়। ফলে পার্শ্ববর্তী স্তরের তুলনায় অপর অংশের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে।' অর্থাৎ শিলাস্তরের স্থানচ্যুতি এর মাধ্যমে সংঘটিত হয় এবং স্থিতাবস্থায় পরিবর্তন আসে। এই আকস্মিক স্থানচ্যুতি এবং শিলাস্তরের পতন অভ্যন্তরীণ অন্যান্য স্তরের ভেতর দিয়ে শক্তি বিচ্ছুরিত করে এবং তা প্রসারিত হয়ে ভূকম্পনের সৃষ্টি করে।

প্রাকৃতিক কারণে ভূকম্পন হওয়ার আগে, শিলার স্তরে চাপ প্রধানত এসে থাকে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার ফলে। বিজ্ঞানী হাউসনারের মতানুসারে এই চাপ সৃষ্টি হয় পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উষ্ণ অর্ধতরল পদার্থের নানা পরিবর্তনের ফলে। এসব পদার্থের নানা ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অনেক সময় ঘনফল এবং আয়তন বাড়িয়ে দেয় এবং তা শিলার স্ত রের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে চায়। এবং শেষ পর্যন্ত স্তরের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। হিসাব করে দেখা গেছে, ভূকম্পনের সময় পৃথিবীর শিলার স্তর থেকে যে শক্তি নির্গত হয়, তার পরিমাপ পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ অর্ধতরল পদার্থের পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত শক্তির প্রায়
সমান।

ভূ-কম্পন হওয়ার পূর্বাভাস

বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন, কোনো অঞ্চলে ভূমিকম্প হওয়ার আগে পাখিরা দলবদ্ধভাবে সেখানকার আকাশে চক্রাকারে উড়তে থাকে। শুরু হয় কুকুরের ডাক; সাপ বা অন্যান্য সরীসৃপ গর্ত থেকে বেরিয়ে ইতস্তত ছোটাছুটি করে। কুয়োর জলের গভীরতা পর্যায়ক্রমে বাড়ে এবং কমে। বৃদ্ধি এবং হ্রাস পেতে থাকে প্রস্তরীভূত ভূ-স্তরের বৈদ্যুতিক রোধ বা রেজিস্ট্যান্স। ১৯৬৬ সালে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা অবশ্য অভিনব একটি ঘটনা লক্ষ করেছিলেন। উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে সেবার ভয়াবহ এক ভূমিকম্পে ভীষণ ক্ষতি হয়। ভূমিকম্পের আগে শহরটির আকাশে দেখা গিয়েছিল অদ্ভুত এক আলোকরশ্মি। কতকটা টর্চের আলোর মতো। নাটকীয় এ ঘটনা নিয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানীমহলে নানারকম জল্পনা শুরু হয়। বুঝতে অসুবিধা হয়নি তড়িৎ চৌম্বক ঘটনা থেকে সৃষ্ট হয়েছিল এই আলোকরশ্মি। অনেকের মনে এমন প্রশ্ন জাগে, এই বিকিরণ শুধু দৃশ্যমান রশ্মির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, নাকি ভূমিকম্পের সময় অদৃশ্য রশ্মিও সৃষ্টি হয়? কৃত্রিম উপগ্রহ ইনটার কসমস-১৯-এর সাহায্যে এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে চমকপ্রদ একটি ঘটনা আবিষ্কার করেন রুশ বিজ্ঞানীরা। দেখা গেছে, ভূমিকম্পের ঠিক আগে ভূপৃষ্ঠ থেকে ঝলকে ঝলকে বিকীর্ণ হয় স্বল্প কম্পাংকের বিকিরণ। ভূমিকম্পের পর সেই বিকিরণ সমানে চলতে থাকে। পরে ওরিয়েল-৩ নামক আর একটি কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে অনুরূপ ঘটনার প্রমাণ পাওয়া গেছে। পৃথিবী বেষ্টন পরিক্রমণের সময় হঠাৎ এক মুহূর্তে তার সংবেদনশীল

যন্ত্রে ধরা পড়ে ঝলকে ঝলকে বিকিরণ। উপগ্রহটি তখন কোনো -একটি স্থানের তিন ডিগ্রি পশ্চিমে একটি পরিক্রমণ পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল। এ ঘটনার চার ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট পর ওই স্থানটিতে ভূকম্পন ঘটে।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে শেষ ভূ-কম্পনটি হয় গত ২০ সেপ্টেম্বর শনিবার। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছয় দফার হালকা মাত্রার এই ভূকম্পন সংঘটিত হয়। ভূ-কম্পনের উৎপত্তিস্থল নিয়ে দু'ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের আর্থ অবজারভেটরি জানিয়েছে, ভূকম্পনের উৎপত্তিস্থল ঢাকার ৬৫ থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের কাছাকাছি মধুপুর ফল্টে। আর আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, উৎপত্তিস্থল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। তবে ভূকম্পনে দেশের কোথাও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায় নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত আর্থ অবজাভেটরি থেকে জানা যায়, প্রথম ভূকম্পনটি হয় বিকেল ৫টা ১৬ মিনিট ৩৬ সেকেন্ডে, সন্ধ্যা ৬ টা ১ মিনিট ২ সেকেন্ডে, ৬ টা ২১ মিনিট ৪১ সেকেন্ডে। এবং রাত ১০টা ২ মিনিটে আরো পাঁচবার ভূ-কম্পন অনুভূত হয়। এগুলোর মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৩.৬, ৩, ৪.৪। ৩.৫, ২.৭ ও ২.২। আবহাওয়া দফতর সবমিলিয়ে ৪টি ভূকম্পনের তথ্য দেয়। আবহাওয়া অধিদফতর থেকে জানা যায় যে, ৫টা ১৬ মিনিট ২৩.১২ সেকেন্ডে ঢাকা থেকে পূর্বদিকে ৭৬.১ কিলোমিটার দূরে ৪.৮ মাত্রার প্রথম ভূকম্পনটি রেকর্ড করা হয়েছে। এরপর ৫টা ৪২ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডে ৭০ কিলোমিটার দূরে ৩.৩, ৬ টা ৫২ সেকেন্ডে ৭০ কিলোমিটার দূরে ৪.৮ এবং ৬ টা ২১ মিনিট ৪৮ সেকেন্ডে ৭৩.৪ কিলোমিটার দূরে ৪.৩ মাত্রার ভূ-কম্পন রেকর্ড করা হয়। রাত ১০টা ১৬ মিনিটে ২.২ মাত্রার ভূকম্পনটি অনুভূত হয়, টাঙ্গাইল ও এর আশেপাশের এলাকায়। এগুলো ছিল খুবই স্বল্পমাত্রার।

এর একমাস আগে শনিবার ১ আগস্টেও মধ্যরাতে ঢাকাসহ দেশের অনেক স্থানে ভূমিকম্পন হয়েছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল সেপ্টেম্বরের চেয়ে বেশি, প্রায় ৫.৬। রাত ১২টা ৫২ থেকে ১২ টা ৫৫ মিনিটের দিকে পর পর দুবার মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের কম্পনে কেঁপে ওঠে ঢাকা শহর। একই সময় সিলেট, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, নরসিংদী, বগুড়া, নীলফামারী, নেত্রকোণা, রংপুর, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ভৈরব, শেরপুর, জামালপুরসহ দেশের বিভিনস্থানে ভূকম্পন হয়। আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয় ভূকম্পনের উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা থেকে ২৩৮ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে সিলেট এলাকায়। ভূকম্পনটি বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য বৃহস্পতিবারে মিয়ানমারে একটি ভূমিকম্পন হয়েছে। তবে ভূমিকম্পে বড় ধরনের ক্ষতির কথা জানা যায়নি। বেশ কয়েকটি জায়গার ভবনে ফাটল ধরেছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য এর দুদিন আগে গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর অদূরেই একটি মৃদু ভূমিকম্প হয়েছিল। মাঝারি ভূমিকম্পের আগে এ ধরনের ভূমিকম্পকে 'বিফোর শক' বলে আখ্যায়িত করেন বিশেষজ্ঞরা।

এগুলো আরও ছোটখাট ভূমিকম্পের শঙ্কা জাগায়। তারই ফলশ্রুতিতে শনিবার ১ আগস্ট ২০০৮ এ ভূমিকম্পনটি হয়। ভূমিকম্পের মাত্রাগুলো ছিল হালকা, মাঝারি এবং মাঝারি থেকে তীব্র। মূলত, মাত্র ২৫ ঘণ্টার মধ্যে ৩ দফায় কেঁপে ওঠে বাংলাদেশ।

ওই ভূমিকম্পের সময় নগরীর ঘুমন্ত মানুষ আতংকিত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসে। ভূমিকম্পের স্থায়িত্বকাল ছিল ৫ থেকে ৮ সেকেন্ড। ভূকম্পনের সময় অজানা ভীতি, উৎকণ্ঠা ও আতংক ভর করে শহর ও নগরে। গ্রামের মানুষজন ঘরবাড়ি থেকে বের হয়ে আসে, দিকবিদিক ছোটাছুটি শুরু করে। পুরনো ঢাকার জরাজীর্ণ ভবনগুলোয় বেশ কয়েকটিতে ফাটল ধরে যায়, জরাজীর্ণ ভবনগুলো ধ্বসে পড়ার ভয়ে কেউ কেউ দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে বাঁচার চেষ্টা করেছেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। অনেক পাড়া মহল্লায় মধ্যরাতে নীরবতা ভেঙে মসজিদ, মাদ্রাসা থেকে আজানধ্বনি হয়, মন্দিরে শঙ্খ ধ্বনি বেজে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে জানা গেছে নদ-নদী, পুকুর, জলাশয়ে কয়েক ফুট উঁচু জলাশয়ে কয়েকফুট উচু ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়।

বড় ভূমিকম্প আরো কিছু ভূমিকম্পের জন্ম দিতে পারে

মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা সাংবাদিকদের জানান, যে কোনো ধরনের বড় ভূমিকম্প আরো কিছু ভূমিকম্পের জন্ম দিতে পারে এবং এটা বেশি ঘটে সাগরে। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্ব জাপানের নানকাই ট্রাফে ১৯৪৪ সালে টোনাকাই এবং ১৯৪৬ সালে নানকায়দো ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এগুলো আরো ৮টি অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। এটা ২০০৪ সালে সুন্দ্রা ট্রেঞ্চ এলাকায় সংঘটিত সুনামির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। নানকাই ট্রাফ সিসমোজেনিক জোন এক্সপেরিমেন্টের প্রাপ্ত ফলাফল, এরপর তুলে ধরা হয় ইউরোপিয়ান জিও সায়েন্স ইউনিয়নের (উএট) বার্ষিক সভায়। জাপানের নতুন গবেষণা কেন্দ্র ভেসসাল চিকিউ গত বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে নানকাই ট্রাফ ভালোভাবে লক্ষ্য করে এখানে বিভিন্ন স্থানে ৮টি ভিন্ন ভিন্ন গর্ত দেখতে পায়। জাপানে মাটির নিচে ত্রিমাত্রিক স্ক্যানার বসানো হয়েছে, যা বিভিন্ন গর্ত দেখাতে সাহায্য করছে। জাপানের মেরিন আর্থ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (জামসটেক) সহ-প্রধান বিজ্ঞানী মাসাটাকা কিনোসিতা জানান, এটা কিছুটা মানবশরীরে স্ক্যান করার মতোই। এ প্রজেক্টটি চলছে 'ইন্টারন্যাশনাল ইন্টেগরেটেড ওশেন ড্রিলিং, প্রোগ্রামের; আওতায় (আইওডিপি)। এটার কাজ থ্রি-ডি ইমেজের মতো। বিশেষজ্ঞরা এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে মানচিত্রের। সুনামির গতি জানার জন্য বিজ্ঞানীরা এখানে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছেন। ডক্টর টবিন জানান, তাদের আরো অগভীর গর্ত করা উচিত। ২০১০ থেকে ২০১২ সালে তারা প্রায় ৬ কিলোমিটার গভীরে পাথরে যন্ত্র স্থাপন করবেন বলে জানান তিনি। এখান থেকে কোনো মূল্যবান তথ্য পেয়ে যেতে পারেন বলে তিনি ধারণা করছেন। এ প্রজেক্টের সহ-প্রধান বিজ্ঞানী হ্যারল্ড ট্রিবিউন জানান, ২০০৪ সালের সুনামির পর এ প্রকল্পটিতে তারা আরো উৎসাহ বোধ করেন। এ ক্ষেত্রে সুমাত্রার ভূমিকম্প ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জাপান সরকার সাগরের তল থেকে তার নিয়ে নানকাই ট্রাফ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। এছাড়াও টিন্টমিটারস ও

অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে প্রকৃত সময় বের করতে চেষ্টা করবেন তারা। এটা ভবিষ্যতে ভূমিকম্প ও সুনামির জন্য ভালো একটি হাতিয়ারও হতে পারে।

এদিকে গত তিনমাসে বাংলাদেশ ও আশপাশের অঞ্চলে ৯ দফায় ভূকম্পন রেকর্ড করা হয়েছে। এসব ভূকম্পনের উৎপত্তিস্থল নিকটস্থ মায়ানমার, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও আন্দামান সাগর এলাকায়। ভূতত্ত্ববিদেরা বারবার সতর্ক করেছেন বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম সক্রিয় ভূকম্পন বলয়ে অবস্থিত। ইন্দোবার্মা হিমালয়ান টেকটোনিক প্লেটের প্রতিনিয়ত সঞ্চালন এ অঞ্চলের ভূকম্পনকে অনিবার্য করে তুলেছে। তাছাড়া ভূগর্ভস্থ জ্বালানী উত্তোলন ও পরমাণু বিস্ফোরণ এবং তার বিকিরণের চাপ, ভূপৃষ্ঠের পাহাড় টিলা বেপরোয়া ধ্বংস, প্রভৃতির পরিণতিতে ভূকম্পনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতীতে বাংলাদেশ সংলগ্ন নিকটস্থ অঞ্চলে রিখটার স্কেলে ৮.৭ মাত্রার প্রচণ্ড ভূকম্পন সংঘটিত হয়েছিল। গত ১৫০ বছরের ইতিহাসে আসাম থেকে সিলেট-চট্টগ্রাম ও রাজধানী ঢাকা পর্যন্ত রিখটার স্কেলে ৭ মাত্রার প্রচণ্ড ভূকম্পের সাতবারের রেকর্ড পাওয়া যায়। এসব ভূমিকম্পের প্রভাবে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ, সুরমা অববাহিকা, বুড়িগঙ্গা, মেঘনা মোহনা, সন্দ্বীপ হাতিয়া উপকূল এবং কক্সবাজারের কুতুবদিয়া মহেশখালী চ্যানেলে ব্যপক পরিবর্তন ঘটে।

অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলছেন, বঙ্গেয় ব-দ্বীপে প্রচুর শক্তি সঞ্চয় হচ্ছে। এই শক্তি এক সময় নির্গত হবে। ২০ মার্চ, ২৭ জুলাই, ১ আগস্ট ও সর্বশেষ এই ভূকম্পন সেই শক্তি নির্গমনের একটি উদাহরণ মাত্র। তিনি জানান, যমুনা থেকে মেঘনা পর্যন্ত এই এলাকা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষত ঢাকা অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। অনেকদিন পরে এটি আবার সক্রিয় হয়েছে। ঢাকা থেকে ৫০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে মানিকগঞ্জে যে চ্যুতি রয়েছে, তার সঙ্গে মধুপুর চ্যুতিরও সংযোগ আছে। ভূ-কম্পন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেহেদী আহমেদ আনসারী বলেন, হিমালয় ভূ-কম্পন বলয়ে হিমালয়ের উত্থান-প্রক্রিয়া এখনো সক্রিয় থাকায় বাংলাদেশ ভূ-কম্পন এলাকা হিসেবে গণ্য। ঢাকা মহানগর ও আশপাশ এলাকার ভূমির গঠন অস্থিতিশীল এবং ভূ-আলোড়নজনিত। মহানগরের পাশেই রয়েছে বেশ কয়েকটি অস্থিতিশীল ভূ-তাত্ত্বিক অঞ্চল। উত্তরে সিলেট অববাহিকা বেশ দ্রুত ভূ-অভ্যন্তরে ঢুকে যাচ্ছে। কয়েক দশকে ওই অঞ্চলটি ১১ মিলিমিটারের মতো দেবে গেছে। পশ্চিমে যমুনা উপত্যকা অঞ্চলটি ক্রমাগত ধাক্কা দিচ্ছে। দক্ষিণে বৃহত্তর ঢাকা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ১.৮২ মিলিলিটার হারে দেবে যাচ্ছে। এসব অস্থিতিশীল ভূতাত্ত্বিক অঞ্চলের প্রভাব মহানগরের ওপর গিয়ে পড়বে।

বাংলাদেশ এখন সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। এ ব্যাপারে গণমাধ্যমগুলো গত ২৫ বছর ধরে বারবার প্রচার করে আসছে। উল্লেখ্য কয়েক বছর আগে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় সমুদ্রের নিচে একটি ভূকম্পন হয়। ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের শীর্ষে ভারত মহাসাগরের তলদেশে দুটি ভূতাত্ত্বিক প্লেটের সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট রিখটার স্কেলের ৯ মাত্রার ভূকম্পন পুরো গ্রহটাকে নাড়িয়ে দেয়, সৃষ্টি হয় জলোচ্ছাসের, ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞে ২ লাখ ৫০ হাজারের বেশি লোক মারা যায়, উদ্বাস্তু

হয়ে যায় ১০ লাখের বেশি মানুষ। যেটি সুনামি নামে পরিচিত। মূল ভূকম্পন সৃষ্টির দেড় হাজার কিলোমিটার দূরে থাকার পরও বাংলাদেশের মানুষেরা যে দৃশ্য দেখেছে তা অতিপ্রাকৃত, অবিশ্বাস্য লাগলেও এটাই বাস্তব। কিছুদিন আগেও সিডরের আগমন এত ভয়াবহ হতে পারে আমরা ভাবিনি। আমাদের রক্ষাব্যূহ সুন্দরবনকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। দুদিনের মধ্যে বিদ্যুৎ ও পানির অভাবে আমাদের ঢাকা শহরের অবকাঠামো লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল প্রায়। তারপরও আমরা সতর্ক হই না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক ও ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ ড. এসএম মাকসুদ কামাল তার এক গবেষণায় জানিয়েছেন, নগরীর পশ্চিম পাশে যেসব আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছে, সেখানে মাটির পুরুত্ব ২৫ ফুটের বেশি নয়। আবার নগরীর পানির স্তর অস্বাভাবিকভাবে নেমে যাওয়ার ফলে ভূমিধ্বসের আশংকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ উপরের অংশে দিন দিন ওজন বাড়ছে। মাটির উপরের স্তর থেকে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের মাঝামাঝি অংশ প্রায় ৫ থেকে ৭শ' ফুটের মধ্যে কোনো পানির অস্তিত্ব নেই। বিশাল এ এলাকা ফাঁপা হয়ে আছে। এ খালি জায়গা পূরণ করতে গিয়েই মাটি নিচের দিকে নেমে যাবে। যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক আফতাব আলম খান এ মতের সঙ্গে পুরোপুরি একমত নন। তবে তার মতে, যে হারে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন হচ্ছে, নগরায়ণ হচ্ছে, তাতে করে ঢাকা শহর একদিন ধ্বসে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। তিনি জানান, ঢাকা শহর মধুপুর ক্লে বা লাল মাটির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ মাটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল এর চাপ ধারণ ক্ষমতা বেশি।

স্বাভাবিকের চেয়েও একটু বেশি মাত্রায়। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর এ স্তরের নিচে অবস্থিত। ঢাকা শহরের পানি চাহিদার সিংহভাগ এ স্তরের নিচে থেকে উত্তোলন করা হয়। ধূসর মাটির স্তরের নিচ থেকে উত্তোলন করা হয় না। সুতরাং ঢাকার যে ভূতাত্ত্বিক অবস্থা তার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, ঢাকা শহর ধ্বসে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নিকট ভবিষ্যতে নেই। তবে ভূমিকম্প হলে ভিন্ন কথা। রিখটার স্কেলে ৫.৫ মাত্রার ওপরে ভূমিকম্প হলে ঢাকা ও তার আশপাশের ব্যাপক এলাকা ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।

দশকের পর দশক রাজধানী শহর ঢাকায় খালবিল, জলাশয় বন্ধ করা হয়েছে, আশপাশের অঞ্চলের নদীগুলো গতিকে ব্যাহত ও ভরাট করা হয়েছে। আর অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং ভূমিকম্পন প্রতিরোধহীন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে তাতে নিকট অতীতে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পেই লাখ লাখ মানুষ মারা যেতে পারত, ধ্বসে যেতে পারত শত শত ভবন। প্রতিবছর বর্ষায় ঢাকা শহর ও ডিএনডি বাঁধের ভিতরের এলাকা মুহূর্তে বৃষ্টির পানি জমে কৃত্রিম বন্যা এখন আমাদের কাছে স্বাভাবিক। সমস্ত খালবিল, ডোবানালা ভরাট করে অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট তৈরি, অবাধ মাল্টিস্টোরেজ বিল্ডিং নির্মাণ এবং তথাকথিত বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নামে কংক্রিটের কারাগার তৈরির মাধ্যমে কোটি মানুষের কফিন তৈরি করা হয়েছে। আমরা হলাম নব্য কর্পোরেট কালচারে অভ্যস্ত স্বার্থপর, বিজ্ঞানবোধহীন

বিস্মৃতিপ্রবণ এক জাতি। যারা তাদের বাচ্চার খেলার মাঠের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না অথচ খেলা নিয়ে রীতিমতো জীবন দিয়ে দেয়। একটু খোলা জায়গা বা মাঠ পেলে তাতে ভবন নির্মাণের টালবাহানা শুরু করে। ঢাকা শহরের এই কংক্রিটায়নে মাটিকে রীতিমতো আড়াল করার ফলে বৃষ্টির বা বন্যার পানিকে না পারা যাচ্ছে জমিয়ে রাখতে, না যাচ্ছে শোধন করতে। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রক্রিয়াগুলো বন্ধ। কিন্তু মাটির নিচ থেকে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন অব্যাহত আছে। যার ফলে ভূত্বকের নিচে একটি স্তর ফাঁকা হয়ে গেছে ও যাচ্ছে। উপরের স্তর ডেবে সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে যেকোনো সময়। এগুলো ভূকম্পনকেই শুধু বাড়িয়ে তুলছে না, সেইসঙ্গে বাড়ি-ঘর ছেড়ে খোলা জায়গায় বাঁচার জন্য আশ্রয় নেওয়ার উপায়ও মানুষ রাখেনি। অর্থাৎ একদিকে ভূমিকম্পের ভয়াবহতা আরেকদিকে আমরা এক ভয়ংকর ভূমিধ্বসেরও দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। প্রায়ই পাহাড় ধ্বসা, রাস্তা ধ্বসা, ভবন ধ্বসা বা কাত হয়ে যাওয়ার উদাহরণ এখন আমাদের সামনে এসে হাজির হয়। ফলে মৃদু ভূমিকম্পেই যেকোনো দিন সকালে উঠে বেঁচে-থাকা মানুষ সুনামির মতো জলোচ্ছ্বাস বা পানি ফুলে নামা-ওঠার দৃশ্যই দেখবে না, দেখবে ধ্বসে পড়া লাখ লাখ মৃত মানুষের এক নগরীকে।

* ডিসকাশন প্রজেক্ট গ্রন্থাগার-এর কাছে কৃতজ্ঞ

[আসিফ, বিজ্ঞানবক্তা ও লেখক।]

ভূমিকম্প পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয়

ধরিত্রী সরকার সবুজ

২০০৮ সালের ২৬ জুলাই মধ্যরাতের ভূমিকম্পে ঢাকা, সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহীসহ দেশের মধ্য ও উত্তরাঞ্চল কেঁপে উঠেছিল। রিখটার স্কেলে ৪.৯ মাত্রার এ ভূমিকম্পই সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকায় অনুভূত হওয়া শক্তিশালী ভূমিকম্প, যদিও পরিমাপের দিক থেকে এটি ছিল মাঝারি মানের চেয়ে নিম্ন মাত্রার। তবে এ ভূমিকম্প উক্ত এলাকাসমূহে যতটা ঝাঁকুনি দিয়েছে তার চেয়ে বরং কিছুটা বেশিই ঝাঁকুনি দিতে পেরেছে মানুষের মনে। ভূমিকম্পের পর ঢাকাবাসী কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে যে,

আমরা বড় একটা ঝুঁকির মধ্যে আছি। মাঝারি মাত্রার ভুমিকম্পে আমরা যতটা আতঙ্কিত হয়েছি, তাতে বড় ধরনের ভূমিকম্প সৃষ্টি হলে ঢাকার বিপর্যয়ের পরিমাণ কতটা হবে তা নিয়ে অনেকেই আতঙ্কিত হয়েছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত সে ধরনের বিপর্যয় মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তুতি নগন্য, জনসচেতনতাও প্রায় নেই। কিন্তু একথা সত্য, বাংলাদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় রয়েছে এবং যে কোনো সময় বড় ধরনের ভূমিকম্পে বাংলাদেশের কোনো অঞ্চল বিধ্বস্ত হতে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসেব অনুযায়ী, সাধারণত রিখটার স্কেলে ৫ থেকে ৫.৯৯ মাত্রার ভূমিককম্পকে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প বলা হয়। ৬ থেকে ৬.৯৯ মাত্রাকে তীব্র, ৭ থেকে ৭.৯৯ মাত্রাকে ভয়াবহ এবং এর ওপরের মাত্রাকে অতি ভয়াবহ ভূমিকম্প বলা হয়। সে হিসেবে ঢাকা মহানগরীতে একটি বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটানোর জন্য মাঝারি ধরনের ভূমিকম্পই যথেষ্ট। কারণ এযাবৎ রাজউক থেকে যে সব বাড়ির নকশা অনুমোদন নেয়া হয়েছে তার প্রায় সবই রিখটার স্কেলে ৫ মাত্রার কিছু বেশি ভূকম্পন সহ্য করতে পারে। উপরন্তু কোনো কোনো বাড়ির মালিক নির্ধারিত মাত্রার ভূকম্পন প্রতিরোধক বাড়ির নকশা পাশ করিয়ে বাড়ি নির্মাণের সময় তা আর মানেননি। ৭ মাত্রার রিখটার স্কেল বজায় রাখা হয়েছে এমন নমুনা খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের দেশও ভূকম্পন পরিমাপক যন্ত্রপাতিতে কিছুটা সমৃদ্ধ হয়েছে। ফলশ্রুতিতে দেশের কোথাও কোনো ছোটখাট ভূকম্পন হলেও আমরা সেটা জানতে পারছি। তারপরও বিভিন্ন সংস্থার পরিমাপলব্ধ তথ্যের মধ্যে এখনও কিছুটা গরমিল বা বিভেদ রয়েই যাচ্ছে। গত ২৬ জুলাই মধ্যরাতের ভূমিকম্প সম্পর্কে ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণকারী মার্কিন সংস্থা ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সোসাইটি (টঝএঝ)-এর পর্যবেক্ষণ মতে, ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল রিখটার স্কেলে ৪.৯। আবার ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট (ওগউ) এর মতে ৪.৮ মাত্রার। দুটো সংস্থাই উৎপত্তিস্থল হিসেবে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট এলাকাকে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু আমাদের আবহাওয়া অধিদপ্তরের মতে, ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৫.৬ এবং এর কেন্দ্র ছিল সিলেট। এ-ধরনের তথ্যগত বিভেদ পূর্বপ্রস্তুতি নেয়ার জন্য কিছুটা অসুবিধাজনক তো বটেই।

বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় ভূমিকম্পটি হয়েছিল ১৮৯৭ সালে। বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল ও আসাম এলাকায় সংঘটিত এ ভূমিকম্পের রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল ৮.১। সে ভূমিকম্পে ময়মনসিংহ, রংপুর, ঢাকাসহ অনেক এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ঢাকায় সে সময়কার ইটের তৈরি প্রায় সব ভবনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন, এ-ধরনের বড় ভূমিকম্প ১০০ থেকে ১৩০ বছরে একই এলাকায় আবার আঘাত হানতে পারে। সে হিসেবে, নিকট-ভবিষ্যতে ঢাকায় একটি বিপর্যকর ভূমিকম্পের আশংকা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

এ অঞ্চলে ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্পসমূহ

১৫৪৮ সর্বপ্রথম রেকর্ড হওয়া ভূমিকম্পটি বেশ জোরালো ছিল। সিলেট এবং চট্টগ্রামে এটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেয়। অনেক স্থানে মাটি ফেটে পানি বের হয়ে আসে।

১৬৪২ সিলেট জেলায় আরো বেশি ক্ষতি হয়। বিভিন্ন বিল্ডিং-এ ফাটল দেখা দেয়, কিন্তু কোনো প্রাণহানি হয়নি।

১৭৬২ ১৭৬২ সালের ২ এপ্রিলে সংঘটিত এ ভূমিকম্পে চট্টগ্রামের নিকটবর্তী ১৫৫.৪০ বর্গকিলোমিটার এলাকা স্থায়ীভাবে পানিতে ডুবে যায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে। ঢাকায় প্রচণ্ড কম্পন হয়। ৫০০ মানুষ মারা যায়। নদীনালা, ঝিলের পানি আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং শান্ত হওয়ার পর নদীর ওপরে অনেক মৃত মাছ দেখা যায়। চট্টগ্রাম ও সীতাকুণ্ডতে ভূমিকম্পের প্রচণ্ড তীব্রতা অনুভূত হয়। ১৭৭৫ ১০ এপ্রিল-এর এ ভূমিকম্পটিও বিপজ্জনক ছিল। তবে কোনো প্রাণহানি হয়নি।

১৮১২ ১১ মে আঘাত হানা বড় ধরনের এ ভূমিকম্প বাংলাদেশের অনেক স্থানে অনুভূত হয়। সিলেটে এর উদ্দামতা ছিল অনেক বেশি।

১৮৬৫ ১৮৬৫ সালের শীতকালে সংঘটিত এ ভূমিকম্পে ভয়ংকর ঝাঁকুনি অনুভূত হয়। তবে তেমন বেশি ক্ষতি সংঘটিত হয়নি।

১৮৬৯ কাছার ভূমিকম্প নামে পরিচিত। সিলেটে সাংঘাতিকভাবে অনুভূত হয়। তবে কোনো প্রাণহানি হয়নি। চার্চের চূড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কোর্ট বিল্ডিং এবং সার্কিট হাউসের দেয়ালে ফাটল দেখা যায়।

১৮৮৫ বেঙ্গল ভূমিকম্প নামে পরিচিত। ১৮ জুলাই সংঘটিত এ ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭.০।

১৮৮৯ ৭.৫ মাত্রার এ ভূমিকম্পনটি হয়েছিল ১০ জানুয়ারি। সিলেট শহর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাতে আঘাত হানে।

১৮৯৭ ১২ জুন বিকাল ৫:১৫ মিনিটে সংঘটিত হওয়া গ্রেট ইন্ডিয়ান ভূমিকম্প নামের এ ভূমিকম্পনটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প। সিলেট শহরের অনেক বিল্ডিং ধ্বসে পড়ে এবং ৫৪৫ জনের মৃত্যু হয়। ময়মনসিংহে অনেক সরকারি ভবন ভেঙে পড়ে। জমিদারদের দোতলা ভবনের প্রায় সবই ভেঙে পড়ে। ঢাকা মানিকগঞ্জ রেলওয়ের অনেক ব্রিজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পক্ষকালের জন্য চলাচল বন্ধ রাখতে হয়। ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে জলপথের যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভূমিকম্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জীবনের ক্ষতি তেমন বেশি না হলেও সম্পদের ক্ষতি হয়েছিল প্রায় ৫ মিলিয়ন রুপির। রাজশাহীতে বিশেষ করে পূর্ব অংশে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি অনুভূত হয় এবং ১৫ জন মারা যায়। ঢাকাতে সম্পদের ক্ষতি হয়েছিল অনেক বেশি। ইটের তৈরি ভবন প্রায় সবগুলোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

১৯১৮ শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্প নামে পরিচিত। ১৮ জুলাই সংঘটিত এ ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭.৬। শ্রীমঙ্গলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তবে ঢাকায় স্বল্প ক্ষতিকর প্রভাব

পড়েছিল।

১৯৩০ ডুবরি ভূমিকম্প হিসেবে পরিচিত। ৩ জুলাই সংঘটিত এ ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭.১। এ ভূমিকম্পে রংপুর জেলার পূর্বাংশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

১৯৩৪ বিহার-নেপাল ভূমিকম্প নামে পরিচিত। ১৫ জানুয়ারি সংঘটিত ৮.৩ মাত্রার ভূমিকম্পে বিহার, নেপাল এবং উত্তর প্রদেশে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে, কিন্তু বাংলাদেশের কোনো অংশে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেনি। একই বছরের ৩ জুলাই ৭.১ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্প হয় যা রংপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য ক্ষতিসাধন করে।

১৯৫০ আসাম ভূমিকম্প নামে পরিচিত। ১৫ আগস্ট সংঘটিত এ ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৮.৪। বাংলাদেশের সর্বত্র এ কম্পন অনুভূত হয়। তবে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

১৯৯৭ ২২ নভেম্বর ৬.০ মাত্রার এ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এর ফলে চট্টগ্রাম শহরে অল্প ক্ষতি সাধিত হয়।

১৯৯৯ ২২ জুলাই মহেশখালী দ্বীপে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এর মাত্রা ছিল ৫.২। মহেশখালী দ্বীপ এবং এর সংলগ্ন সাগরে তীব্রভাবে অনুভূত হয়। অনেক বাড়িঘরে ফাটল দেখা দেয় এবং ভেঙে পড়ে।

২০০৩ রাঙামাটি জেলার বরকল উপজেলার কলাবুনিয়া ইউনিয়নে এ ভূমিকম্পনটি হয়। ২৭ জুলাই ভোর ৫:১৭ মিনিটে সংঘটিত এ ভূকম্পনের মাত্রা ছিল ৫.১।

ভুমিকম্প সৃষ্টির উৎসের দিকে তাকালে আমরা দেখাতে পাবো, গঠনগত দিক থেকে ভূপৃষ্ঠ কতকগুলো প্লেটের সমষ্টি। এর মধ্যে কিছু প্লেট রয়েছে যেগুলো খুব বড় আকৃতির। তাদেরকে বলা হয় মহাদেশীয় প্লেট। এসব মহাদেশীয় প্লেটের মধ্যে রয়েছে ছোট ছোট টুকরার মতো অনেকগুলো প্লেট, যাদেরকে বলা হয় স্থানীয় প্লেট। এসব প্লেট সবসময়ই স্থান পরিবর্তন করছে। স্থান পরিবর্তন করতে করতে যখন কোনো দু'টি প্লেটের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে তখনই সেখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর শক্তির সৃষ্টি হয় এবং

সে শক্তির ফলশ্রুতিতেই ভূপৃষ্ঠে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের তিন পাশ ঘিরে চারটি টেকটনিক উৎস অঞ্চল রয়েছে, যা থেকে আমাদের দেশে বড় ধরনের ভূমিকম্প সৃষ্টি হতে পারে। দেশের অভ্যন্তরে ছোট ছোট প্লেটের অবস্থান অনুসারে দেশের ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং এদেরকে ফল্ট নামে অভিহিত করা হচ্ছে। অর্থাৎ কোনো একটি ফল্ট সিস্টেম বা ভূমিকম্প ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা থেকে ভূকম্পনের উৎপত্তি হয়ে সেটি তীব্রতার ওপর ভিত্তি করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে বা আঘাত হানে।

অতীতে সংঘটিত ভূমিকম্পগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, ১৮৯৭ সালের ৮.১ মাত্রার ভূমিকম্পটি ঘটেছিল ঢাকা, ময়মনসিংহ, রংপুরসহ দেশের অনেক অঞ্চলে যার উৎপত্তি হয়েছিল সিলেটের ডাউকি ফল্ট থেকে। ১৯১৮ সালে সিলেটের

শাহজিবাজার ফল্ট সিস্টেম থেকে ৭.৬ মাত্রার একটি ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়ে আঘাত হেনেছিল শাহজিবাজারসহ সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আরো কিছু ঝুঁকিপ্রবনণ ভূমিকম্প উৎপত্তি এলাকা বা ফল্ট সিস্টেম সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরিপে দেখা গেছে, দেশের ছয়টি এলাকায় মাটির নিচে বড় ধরনের ফাটল বা চ্যুতি রয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এলাকার ডাউকি নদীর পাশে সিলেট ও মেঘালয় এলাকার মাটির নিচের ফাটলটি সবচেয়ে বড়। প্রায় ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই ফাটলের কারণে রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, মৌলভীবাজার এলাকা ঝুঁকির মধ্যে আছে। টাঙ্গাইলের মধুপুর এলাকায় একটি ফাটল বা ফল্ট সিস্টেম রয়েছে যার কারণে ঢাকা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া চট্টগ্রাম ফল্ট সিস্টেম, টেকনাফ ফল্ট সিস্টেম, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট ফল্ট সিস্টেম এবং রাজশাহীর তানোর ফল্ট সিস্টেম থেকে যে কোনো সময় মাঝারি বা বড় আকারের ভূমিকম্প উৎপত্তি হওয়ার ঝুঁকি থাকেই। উৎপত্তিস্থলের কাছাকাছি ক্ষতির আশংকা সবসময়ই বেশি হলেও সেটি কতদূর ছড়াবে তা কম্পনের তীব্রতা এবং মাটির গঠনের ওপর নির্ভর করবে।

বাংলাদেশ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সংঘটিত ভূমিকম্পের মধ্যে প্রায় ২৫০ বছর পূর্ব থেকে সংঘটিত ভূকম্পনসমূহের তথ্য পাওয়া যায়। ১৯০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১০০ টি মাঝারি থেকে তীব্র ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে যার মধ্যে ৬৫ টি ঘটেছে ১৯৬০ সালের পরে। তাতে মনে করা যায়, বিগত ৩০ বছরে ভূমিকম্পের সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে। তবে এটাও সত্য যে, পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় ভূমিকম্প পরিমাপের কারিগরি জ্ঞান ও যন্ত্রপাতি যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি সে তথ্য ছড়িয়ে দেয়ার জন্য গণমাধ্যমের পরিধিও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেকারণে আগে অনেক ছোট মাত্রার ভূমিকম্প মানুষের গোচরে না এলেও এখন একেবারে মৃদু মাত্রার ভুকম্পনও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না বা আমাদের আবহাওয়া বিভাগ পরিমাপ করতে পারে।

বড় ভূমিকম্পনসমূহ যেগুলো ঢাকা শহরকে আঘাত করেছিল

তারিখ	নাম	মাত্রা	ঢাকা থেকে এর দূরত্ব (এপিসেন্টার কি.মি.)
জানুয়ারি ১০, ১৯৬৯	কাছার ভূমিকম্প	৭.৫	২৫০
জুলাই ১৪, ১৮৮৫	যমুনা ফল্ট বেঙ্গল ভূমিকম্প	৭.০	১৭০
জুলাই ১২, ১৮৯৭	গ্রেট ইন্ডিয়ান ভূমিকম্প	৮.৭	২৩০
জুলাই ০৮, ১৯১৮	শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্প	৭.১	১৫০
জুলাই ০২, ১৯৩০	ডুবরি ভূমিকম্প	৭.১	২৫০
জানুয়ারি ১৫, ১৯৩৪	বিহার-নেপাল ভূমিকম্প	৮.৩	৫১০

একটি এলাকা কতটা ভূমিকম্প-ঝুঁকির মধ্যে আছে তা বেশ কয়েকটি ফ্যাক্টরের ওপর নির্ভর করে। বাংলাদেশের অবস্থান একটি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় হওয়ায় আমরা সবসময়ই সে ঝুঁকির মধ্যেই আছি। তবে গ্রামীণ এলাকায় বহুতল ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো কম হওয়ায় ক্ষয়ক্ষতির আশংকা কিছুটা কম। কিন্তু ঢাকাসহ বড় বড় শহরগুলোতে ক্ষতির আশংকা খুবই বেশি। ঢাকাতে অসংখ্য বিল্ডিং তৈরি হয়েছে কোনো ধরনের ভূমিকম্প প্রতিরোধক ডিজাইন ছাড়াই। অধিকসংখ্যক মানুষের বসবাসের জায়গা তৈরি করতে গিয়ে খাল, বিল, নালাসহ নীচু ভূমিতে ভরাট করা মাটিকে কোনো রকম জমাট বাঁধার সময় না দিয়ে যেসব ইমারত নির্মাণ করা হচ্ছে সেগুলো ভূমিকম্পের আঘাতে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। দুর্বল ভিত্তিভূমির মধ্যদিয়ে ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিবাহিত হয় খুব তাড়াতাড়ি। এসব জানা সত্ত্বেও খোদ রাজউকই পূর্বাচল এবং উত্তরা তৃতীয় প্রকল্পে জনগণের জন্য প্লট তৈরি করছে নীচু ভূমি ভরাট করে। মাত্রাতিরিক্ত নগরায়ণ প্রবণতার কারণে অনেক নীচু জমিতে বহুতল ভবন নির্মিত হচ্ছে সঠিক পাইলিং ছাড়াই, যা ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে থাকবে সবসময়। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ সরকারের ইমারত নির্মাণ বিধিমালা বা বিল্ডিং কোড তৈরি হয়েছে যা অনুসরণ করে ইমারত নির্মাণ হওয়ার কথা। কিন্তু ঢাকা শহরের নির্মাণে অনেক ক্ষেত্রেই যে তা মানা হয়নি তা অনেক কর্তৃপক্ষেরই জানা। ফলে এসব বিল্ডিং ভূমিকম্পে ধ্বসে অজস্র মানুষের প্রাণহানির আশংকা থাকছেই।

ভূমিকম্প আঘাত হানলে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস-এর মতো অত্যাবশ্যকীয় সেবাদানের ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়, গ্যাস ও বিদ্যুতের লাইন থেকে অনেক ক্ষেত্রেই আগুন ধরে, যা অনেক ক্ষতির কারণ হয়। পানি ও পয়ঃলাইনসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে অপরিষ্কার পানির আগ্রাসনে চরম স্বাস্থ্যঝুঁকির সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ ধরনের হুমকির মুখে আমাদের প্রস্তুতি কী? বলতে গেলে তেমন কিছুই নেই। মনে রাখা দরকার, যে কোনো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেই দুর্যোগ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনার চেয়ে দুর্যোগ-পূর্ব প্রস্তুতি অনেক বেশি কার্যকর। তবে মনে রাখা দরকার, অন্যান্য দুর্যোগগুলোর মতো ভূমিকম্পের পূর্বাভাস আগে পাওয়ার তেমন কোনো ব্যবস্থাই নেই। জানা যেতে পারে মাত্র কয়েক সেকেন্ড বা মিনিট পূর্বে। সে কারণে ভূমিকম্প ঝুঁকির প্রাক্-প্রস্তুতিও নিতে হয় অনেক আগে থেকেই। পূর্বপ্রস্তুতি যে কাজে লাগে তা আমরা কয়েকমাস আগে চীনে সংঘটিত একটি ভূমিকম্প-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা থেকে বুঝতে পারি। চীনে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল অনেক। কিন্তু তারা প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে মূল উদ্ধারকাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছিল। কারণ তাদের ছিল প্রচুর যন্ত্রপাতি এবং অনেক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। সে হিসেবে আমাদের প্রায় কোনো প্রস্তুতি নেই বললেই চলে। কোনো একটি ভূমিকম্প হলে আমাদের গণমাধ্যম ও প্রশাসন কিছুটা নড়েচড়ে ওঠে। আবার কয়েকদিনেই তা মিলিয়ে যায়।

ভূমিকম্প-পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রমের জন্য আমাদের কোন যন্ত্রপাতি নেই। ঢাকা শহরে এমন অনেক অঞ্চল রয়েছে যেখানে অনেকগুলো বহুতল ভবন রয়েছে। কিন্তু সেখানে একটি অ্যাম্বুলেন্স ঢোকার ব্যবস্থাও নেই। তবে আশার কথা আমাদের আবহাওয়া বিভাগ কিছুটা কারিগরি ক্ষমতা পেয়েছে। ভূমিকম্পের রিখটার স্কেল ও উৎপত্তিস্থল জানার জন্য পূর্বে একটি মাত্র যন্ত্র থাকলেও ২০০৭ সালের মে মাসে তারা আরও তিনটি যন্ত্র পাওয়ায় এখন আবহাওয়া বিভাগ অনেক সঠিকভাবে ভূমিকম্পের মাত্রা ও উৎপত্তিস্থল নির্ণয় করতে পারছে। ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপ করা এবং বিল্ডিংসমূহের ক্ষয়ক্ষতির আশংকা নির্ণয়ের কাজটি আমরা ভালোভাবেই সম্পন্ন করতে পারি। ২০০৩ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) যমুনা সেতুর উভয় পাশে তিনটি করে মোট ছয়টি এক্সেলেরোমিটার বসিয়েছিল। ২০০৫ সালে সারা দেশের আরও ৪০টি এক্সেলেরোমিটার বসানো হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপে আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু আমাদের প্রধান ঝুঁকি হল ঢাকা নগরী। মানুষ বাড়ছে হু হু করে। বিল্ডিং-এর সংখ্যা বাড়ছে প্রচুর। জলভূমি, খাল, নদীনালা, ডোবা ভরাট করে বাড়িঘর বানানো হয়েছে। এক জরিপে দেখা গেছে, ঢাকা মহানগরীর ৬০ শতাংশ বাড়িই খারাপ মাটির ওপর তৈরি। হাউজিং কোম্পানিগুলো কোনো রকমে নিচুভূমি ভরাট করে প্লট বিক্রি করছে বা বহুতল ভবন তৈরি করে ফেলছে। মাটিকে ঠিকমতো গাথুঁনি দেয়া হচ্ছে না, ঠিকমতো পাইলিংও করা হচ্ছে না। নরম মাটির মধ্য দিয়ে ভূকম্পনের অগ্রসর হওয়ায় তীব্রতা অনেক বেশি। বিল্ডিং কোড মেনে ভূমিকম্প প্রতিরোধী বিল্ডিং তৈরি করা না হলে ঢাকার ভবনসমূহ ভূমিকম্প-ঝুঁকির মধ্যে ডুবেই থাকবে সবসময়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ঢাকা ও অন্যান্য শহরে জরাজীর্ণ ও পুরনো বাড়ির সংখ্যা অনেক হওয়ায় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নীতিমালা মেনে না চলায় বড় ধরনের ভূমিকম্পে বাংলাদেশে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হতে পারে। উদ্ধারকাজের মেশিন ও যন্ত্রপাতির তেমন মজুদ নেই। অনেক হাসপাতাল এবং ক্লিনিক ভবন ঝুঁকিপূর্ণ। ভূমিকম্প হলে কী করতে হবে, সে বিষয়ে জনসচেতনতাও নেই।

কিন্তু ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির মোকাবিলায় সচেতনতা একটি বড় বিষয়। বলা যায়, একটি বড় ধরনের ভূমিকম্প মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিতে গেলে আমাদেরকে প্রায় শুরু থেকে শুরু করতে হবে। ভূমিকম্পের সময় কী করতে হবে এবং কী করা যাবে না তা মানুষকে জানাতে হবে। বাংলাদেশে এখন গণমাধ্যমের সংখ্যা বেড়েছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংখ্যা বেড়েছে। মিডিয়ার মাধ্যমে অন্যান্য সামাজিক কার্যক্রম বা দুর্যোগ পরিস্থিতির মতো দেশের মানুষকে ভূমিকম্প সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে।

মানুষের মধ্যে এতটুকু চিন্তা ঢুকাতে হবে যে, তার সারাজীবনের সঞ্চয়ে গড়ে-তোলা বাড়ি এবং জীবন এক মুহূর্তের একটি ভূমিকম্পে নষ্ট হয়ে যেতে পারে সামান্য নিয়ম না জানা, কার্পণ্য এবং অসচেতনতার ফলে। জলভূমি ভরাট করে তাকে নির্দিষ্ট সময় না দিয়েই বিল্ডিং নির্মাণ বন্ধ করতে হবে। বিল্ডিং নির্মাণের সময় বিল্ডিং কোড মেনে চলতে হবে। দুর্বল তলা বা সফ্‌ট স্টোরি বিল্ডিং তৈরি না করা, দেয়ালের সঙ্গে কলাম এবং বিমকে মেলাতে গিয়ে বিমের আকার কলামের সমান বা কলামের চেয়ে বড় না করা উচিত হবে। ভূমিকম্প সহনশীল ভবন নির্মাণ করলে সে ভবনে বসে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু থাকে না। তবে ভূমিকম্প-ঝুঁকির কথা চিন্তা না করে দেশে যে শত সহস্র বিল্ডিং নির্মিত হয়েছে, সেগুলোর ঝুঁকি মারাত্মক। তাই আমাদের সব সময়ই অন্তত এতটুকু সচেতন থাকতে হবে, ভূমিকম্প হলে কী করতে হবে এবং কী করা যাবে না। বাংলাদেশ ভূমিকম্প সমিতি এবং গণমাধ্যমগুলো জনগণকে সচেতন করার সে দায়িত্বটুকু কাঁধে নিলে মানুষ অনেক উপকৃত হবে।

তথ্যপঞ্জি

১। বাংলাদেশ ভূমিকম্প সমিতির ওয়েবসাইট।
২। ইধহমষধফবংয ঊহারৎড়হসবহঃ ঋধপুরহম ঃযব ২১ঃয ঈবহঃঁৎু: ঝঊঐউ
৩। বাংলাপিডিয়া
৪। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট ও নিবন্ধসমূহ

[ধরিত্রী সরকার সবুজ। প্রকৌশলী ও পরিবেশ বিষয়ের লেখক]

ভূমিকম্প: কোনোভাবেই আমরা ঝুঁকিমুক্ত হতে পারছি না

তা ন ভি রু ল হক প্র বা ল

[আজ ৩ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখ। বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতা'র পক্ষ থেকে আমরা মুখোমুখি হয়েছি (সিভিল ইঞ্জিনিয়র) পুরকৌশলী ও রিহ্যাব প্রেসিডেন্ট তানভিরুল হক প্রবালের। আমরা ওনার কাছ থেকে 'বাংলাদেশে ভূমিকম্প' বিষয়ে নানা প্রশ্নের জবাব জানতে চাইব। জনাব প্রবাল ছাত্রজীবনে প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এক সময় তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন, তখন ত্রৈমাসিক 'অতলান্তিক' নামক একটি সাহিত্য পত্রিকাও বের করতেন। তিনি ছিলেন সেই পত্রিকার যুগ্মসম্পাদক, তাঁর মা কবি ও কথাশিল্পী খালেদা এদিব চৌধুরী ছিলেন ত্রৈমাসিক 'অতলান্তিক'-এর সম্পাদক।]

হালখাতা

আপনি একজন (সিভিল ইঞ্জিনিয়র) পুরকৌশলী এবং রিহ্যাব-এর সবচেয়ে দায়িত্বশীল একটি অবস্থানে বর্তমানে আছেন, আমাদের প্রশ্ন হল, ঢাকা শহর তো অপরিকল্পিত একটি নগরী; কোনো বড় মাপের ভূমিকম্প হলে সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে– এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?

তানভিরুল হক প্রবাল

হ্যা, আমরা সবাই জানি ঢাকা একটি অপরিকল্পিত নগরী। এখানকার অন্যসব কিছুর মতো বিল্ডিংগুলোও অপরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে নতুন বিল্ডিংগুলো যদি 'ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড' মেনে করা হয়– তাহলে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে রাখা সম্ভব হবে। আর পুরনো যেসব বিল্ডিং রয়েছে সেগুলোকেও আর্থকোয়েক-প্রুফড করা সম্ভব।

হালখাতা

কিন্তু পুরনো ঢাকার পুরনো বিল্ডিংগুলোসহ অন্যান্য এলাকার পুরনো বিল্ডিংগুলোকে কি আর্থকোয়েক-প্রুফড করা সম্ভব?

তানভিরুল হক প্রবাল

পুরনো ঢাকার বিল্ডিংসহ আন্যান্য এলাকার পুরনো কিছু বিল্ডিং-এর অবস্থা খুবই নাজুক; এগুলোকে ডেস্ট্রয় করে ফেলাই ভালো। তবে পুরনো ঢাকায় কিছু বিল্ডিং আছে, যেগুলো বেশ পুরনো হলেও সেগুলোর অবস্থা অতটা নাজুক নয়, বরং এইসব বিল্ডিং-এর স্থাপত্যগত মূল্য রয়েছে– সেজন্য এগুলোকে সংরক্ষণ করাও প্রয়োজন। এই সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার সাথে এগুলোকে আর্থকোয়েক-প্রুফড করাও সম্ভব।

হালখাতা

সাধারণ মানুষদের মধ্যে অনেকে আছেন, 'ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড' বিষয়টি কী সেটা কিন্তু ভালো করে জানেন না। 'ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড' সম্পর্কে খানিকটা বুঝিয়ে বলবেন কি?

তানভিরুল হক প্রবাল

'ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড' বিষয়টি হল এদেশের বিল্ডিং নির্মাণের ক্ষেত্রে অবশ্যই পালনীয় নিয়মাবলী। এই নিয়মাবলী যথাযথরূপে মেনে বিল্ডিং তৈরি করা হলে এর অনেকগুলো সুফল আছে; যার মধ্যে একটি হল ভূমিকম্পে বিল্ডিং-এর সহজে ক্ষতি হবে না, আর হলেও তুলনামূলকভাবে ক্ষয়ক্ষতি কম হবে। এই বিল্ডিং কোড পৃথিবীর অনেক দেশে আছে আর উন্নত দেশগুলোতে তো আছেই। বাংলাদেশে এই বিল্ডিং কোড একসময় ছিল না। এখন আমাদের সেই ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড যেহেতু হয়েছে, তাই আমাদের অবশ্যই এটা মেনে বিল্ডিং করা উচিত।

হালখাতা

ঢাকায় যে সকল বিল্ডিং নতুনভাবে নির্মিত হচ্ছে, এগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি তো ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ফলো করে তৈরি হচ্ছে না। এর কারণ কী? কেন তারা করছেন না বা তারা যাতে বিল্ডিং কোড ফলো করতে বাধ্য হন সেজন্য কী ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আপনারা গ্রহণ করছেন?

তানভিরুল হক প্রবাল

রিহ্যাব প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি বলতে পারি, যে সকল ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ফলো না করে বিল্ডিং তৈরি করছেন, সেগুলোর একটি প্রতিষ্ঠানও রিহ্যাব-এর সদস্য নন। রিহ্যাব-এর সদস্য অথচ কোনো প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ফলো করছেন না, এখন আর এমনটি হওয়া সম্ভব নয়। কলাবাগানে, সাভারে বা অন্য

আরও নানা জায়গায় ফাউন্ডেশন ফেইলরের ফলে যে বিল্ডিংগুলো ডেবে বা কাত হয়ে পড়ে গেছে, এগুলোর নির্মাণ প্রতিষ্ঠান কিন্তু একটিও রিহ্যাব-এর সদস্য নয়। সুতরাং যারা রিহ্যাব-এর সদস্য নন, তাদের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির দায়িত্ব আমাদের নয়, তাদের দেখার দায়িত্ব সরকারের।

হালখাতা

কিন্তু কোনো রিহ্যাব সদস্য যদি বিল্ডিং কোড ফলো না করেন, বিল্ডিংকে আর্থকোয়েক প্রুফড করার বিষয়টি এড়িয়ে যান বা অন্য কোনো অনিয়ম করেন, সেক্ষেত্রে আপনারা কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন?

তানভিরুল হক প্রবাল

আমাদের কাছে সে রকম অভিযোগ যে আসে না, তা নয়; সে রকম ক্ষেত্রে আমরা সাথে সাথে তাদের সঙ্গে বসে অনিয়ম সম্পর্কে জানতে চাই; আমাদের এই জানতে চাওয়ার এবং সার্বিক তদন্তের মধ্য দিয়ে যদি কোনো রিহ্যাব সদস্য দোষী প্রমাণিত হন, আমরা যে-কোনো মূল্যে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকি।

হালখাতা

একটু আগে যে সরকারের কথা বললেন; 'সরকার' তো একটি এ্যাবস্ট্রাক্ট কথা; সরকারের দায়িত্ব তো রিহ্যাব ঠিকঠাক মতো সব কিছু করছে কি-না সেটাও দেখা; কথা হল যারা রিহ্যাবের সদস্য, বিল্ডিং কোড ফলো করার জন্য তাদের প্রভাবিত করা রিহ্যাবের মাধ্যমে সরকারের পক্ষে অনেক সহজ কিন্তু রিহ্যাবের সদস্য নয় এমন সব ডেভেলপারদের ক্ষেত্রে বিল্ডিং কোড ফলো করার জন্য সরকার কী ধরনের বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে?

তানভিরুল হক প্রবাল

'সরকার' একটি এ্যাব্সট্রাক্ট এবং ব্যাপক ব্যাপার সেটা ঠিক আছে, কিন্তু সরকারের মধ্যকার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিন্তু এ্যাবসট্রাক্ট ব্যাপার নয়। সেখানে কিন্তু সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব বণ্টন করা আছে।

হালখাতা

আমাদের এখানে টেকনিকাল পারসন হিসেবে ইঞ্জিনিয়রদের প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে এক ধরনের নিরুৎসাহ লক্ষণীয়। অন্যদিকে সরকারের নির্বাহী দায়িত্বে যারা থাকেন তাদের অনেক ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় পড়াশুনা ও টেকনিকাল অভিজ্ঞতা থাকে না, ফলে সেক্ষেত্রে কী করা দরকার আর কী করা দরকার নয়– সেটাও তারা অনেক ক্ষেত্রে বুঝতে না পারার কারণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন না। যেমন সরকারের নীতিনির্ধারক লেভেলে (সিভিল ইঞ্জিনিয়রিং) পুরকৌশল বিভাগের

কেউ না থাকলে বিল্ডিং বা ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে বিল্ডিং কোড ফলো করা হচ্ছে কি-না সেটা বুঝতে পারবেন না। এ ধরনের সমস্যা তো প্রতিনিয়তই হচ্ছে। এখান থেকে উত্তরণের উপায় কী হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

তানভিরুল হক প্রবাল

সরকারের নির্বাহীদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়রদের অংশগ্রহণ নেই কথাটি পুরোপুরি সঠিক নয়। তবে প্রশাসনিক জায়গা থেকে ইঞ্জিনিয়রদের যে একটু আলাদা শ্রেণীর বলে মনে করা হয় কিংবা প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়রদের সংযুক্ত হওয়ার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম– একথা অনেকটাই সত্য। সরকারের নীতিনির্ধারক লেবেলে যারা থাকেন তারা যে সবসময় সবকিছু বুঝবেন এমনটি না-ও হতে পারে। যেমন 'পূর্ত ও গৃহায়ন' মন্ত্রণালয়ে নীতিনির্ধারক লেবেলে যারা আছেন বা থাকবেন তাদের মধ্যে কোনো ইঞ্জিনিয়র যদি না থাকেন, তাহলে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ফলো করে ভবন তৈরি হচ্ছে কিনা সেটা বোঝা সরকারের জন্যে সহজ কাজ হবে না। সেক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হল সরকারের মধ্য থেকে কয়েকজন, প্রকৌশলীদের মধ্য থেকে কয়েকজন, স্থপতিদের মধ্য থেকে কয়েকজন এবং সংশ্লিষ্ট আরো এক বা একাধিক ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হতে পারে; যে উপদেষ্টা পরিষদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

হালখাতা

বাংলাদেশে রিখটার স্কেলে ৬ থেকে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প হলে বিশেষ করে ভবনগুলোর কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে বলে আপনার ধারণা?

তানভিরুল হক প্রবাল

আমি প্রথমেই বলে রাখি 'রিখটার স্কেল' কথাটি আমরা এখন আর ব্যবহার করছি না। কেননা যে স্থানে ভূমিকম্প হয় রিখটার স্কেলে কেবল সে স্থানের মাত্রা বা পরিমাণ জানা যায়। কিন্তু ভূমিকম্প সৃষ্টির কেন্দ্র থেকে তার চতুর্দিকে ভূমিকম্পের যে ওয়েভ ছড়িয়ে পড়ে তার মাত্রাটা ধীরে ধীরে কমতে থাকে, কেন্দ্র থেকে সেই ছড়িয়ে পড়া ভূমিকম্পের ক্রমহ্রাসমান মাত্রা রিখটার স্কেলে ধরা পড়ে না। ভূমিকম্প সৃষ্টির কেন্দ্রের মাত্রা কেন্দ্রের বাইরের অন্য সব জায়গা থেকে বেশি আসে। ফলে রিখটার স্কেলে যে পরিমাণের কথা বলা হয় সেটা কেন্দ্র এবং কেন্দ্রের বাইরের অন্যান্য জায়গার ভূমিকম্পের প্রকৃত পরিমাণকে সঠিকভাবে প্রকাশ করে না। রিখটার স্কেলের ঐ মাত্রা শুধু একটি জায়গার জন্যে সঠিক কিন্তু ভূমিকম্প সৃষ্টির পুরো জায়গা জুড়ে ঐ একই পরিমাণ কম্পন কিন্তু হয় না। কিন্তু বাস্তবে রিখটার স্কেলে ধারণকৃত মাত্রা দিয়ে পুরো ভূমিকম্প এলাকার মাত্রাকে বোঝানো হয়ে থাকে, যে তথ্য খুবই ভুল এবং বিভ্রান্তিকর। সে কারণে আমরা জামিলুর রেজা চৌধুরীর মতানুসারে রিখটার স্কেল কথাটি পরিহারের পক্ষ নিয়েছি।

হালখাতা

যা হোক, আমরা আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি, একটু আগে আমরা জানতে চেয়েছিলাম, মোটামুটি ধরনের ভূমিকম্প হলে কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

তানভিরুল হক প্রবাল

ভূমিকম্প এমন এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যার প্রতিকার-প্রতিরোধ এমনকি পূর্বাভাস পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব হয় না। তবে মানুষ যেটা পারে সেটা হল জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি যাতে তুলনামূলকভাবে কম হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। মোটামুটি মাপের ভূমিকম্প আমাদের মতো দেশে হলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হবে, কারণ আমাদের তেমন কোনো প্রস্তুতি নেই, জনসচেতনতা নেই। তবে হ্যা, প্রস্তুতি গ্রহণ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রক্রিয়া আমাদের এখানে শুরু হয়েছে, যার সুফল পেতে হয়তো আরও কিছু সময় লেগে যাবে।

হালখাতা

অনেকে বিল্ডিং কোড ফলো করা তো দূরের কথা, তারা স্থপতি এমনকি কোনো রকম ইঞ্জিনিয়র ছাড়াই বিল্ডিং করে ফেলেন– এ বিষয়ে যদি কিছু বলেন?

তানভিরুল হক প্রবাল

সে রকম তো অহরহই হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়র ছাড়া বিল্ডিং করে আবার গর্বও করে, বলে যে, আমার বিল্ডিং করতে কোনো ইঞ্জিনিয়রের কাছে যাওয়া লাগেনি, ইঞ্জিনিয়র ছাড়াই বিল্ডিং করে ফেললাম। এটা যে অনুচিত, বেআইনি সেটা তো তারা বোঝেনই-না বা বুঝেও মানেন না বরং এ নিয়ে এক ধরনের গর্ববোধও অনেকের আছে।

হালখাতা

কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের এবং রিহ্যাবের করণীয় কী ?

তানভিরুল হক প্রবাল

রিহ্যাবের সদস্য নয় এমন ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাংলাদেশে এক হাজারের উপরে হবে। এদের দায়-দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। আমরা শুধু রিহ্যাবের ৪৫৩ জন সদস্যের দায়-দায়িত্ব নিতে পারি এবং সে দায়িত্ব আমরা নিয়েও থাকি। রিহ্যাবের সদস্যদের নিয়েও যে অভিযোগ নেই এমন নয়। এদের মধ্যে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আসলে সাথে সাথে আমরা মীমাংসা করার চেষ্টা করি। এক্ষেত্রে

সরকার অন্তত একটি কাজ করতেই পারেন, সেটা হল যারা রিহ্যাবের সদস্য নন, তারা যেন রিহ্যাবের সদস্য হন– সরকার সে ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করতে পারেন এবং তাদের বাধ্যও করতে পারেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ রিহ্যাবের সদস্য না হন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, এদের সম্পর্কে আমাদের কোনো দায়-দায়িত্ব আছে কি-না; অ্যাজ রিহ্যাব প্রেসিডেন্ট আমি বলব, না আমাদের এক্ষেত্রে কোনো দায়-দায়িত্ব নেই।

হালখাতা

বিল্ডিং নির্মাণ সংক্রান্ত বর্তমানে নতুন যে অধ্যাদেশ হচ্ছে সেই অধ্যাদেশটি কোন অবস্থায় আছে? এই অধ্যাদেশের ক্ষেত্রে আপনাদের কিছু আপত্তির জায়গাও ছিল– এ বিষয়ে যদি কিছু বলেন...।

তানভিরুল হক প্রবাল

অধ্যাদেশটিতে এমন দু'একটি বিষয় ছিল যা আপত্তিকর ছিল এবং সেগুলো অনেকটা অবাস্তবও মনে হয়েছে। যেমন, সঠিক সময়ে ফ্ল্যাট হস্তান্তর করতে না পারলে সশ্রম কারাদণ্ড হবে, ননবেইলেবল জেল হবে ইত্যাদি। তো আমরা এসবের বিরোধিতা করেছি।

বর্তমানে অধ্যাদেশটি পাশ হয়েছে এবং রিহ্যাবের দাবি মোতাবেক প্রায় ৬০% থেকে ৭০% তারা সংশোধন করেছে।

হালখাতা

বিরোধিতা করেছেন কেন? ডেভেলপারদের বাঁচানোর জন্য? কোনো কোনো ডেভেলপারদের বিরুদ্ধে তো এসব অভিযোগ সত্য।

তানভিরুল হক প্রবাল

না, তাদের একতরফা বাঁচানোর জন্য আমরা বিরোধিতা করিনি। বরং চিন্তা করে দেখেন যে, একজন ডেভেলপারের সশ্রম কারাদণ্ড হলেই কিংবা ননবেইলবল জেল হলেই কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে না। বরং বিদ্যুৎ বিভাগ যদি সঠিক সময়ে বিদ্যুৎ-এর সংযোগ দিতে এবং বিদ্যুৎ বিতরণ করতে না পারে তাহলে দোষটা কিন্তু শুধু ডেভেলপারদের নয়। এর সঙ্গে অনেকগুলো সেক্টর জড়িত। কাজেই বিচারের রায়টি হওয়া দরকার সংশ্লিষ্ট অনেক কিছুকে বিবেচনায় রেখে।

হালখাতা

ভূমিকম্প সংক্রান্ত বিষয়ে রিহ্যাব কীভাবে কাজ করছে?

তানভিরুল হক প্রবাল

ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা আমাদের বিল্ডিংগুলোর জন্য বড় ধরনের হুমকি, এগুলো মোকাবেলার জন্য রিহ্যাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে এককভাবে উদ্যোগ নিচ্ছে আবার অন্য আরও যে-সকল প্রতিষ্ঠান ভূমিকম্প নিয়ে কাজ করছে, তাদের সঙ্গে রিহ্যাব যৌথভাবেও কাজ করে যাচ্ছে। রিহ্যাব-এর নিজস্ব উদ্যোগের অতিরিক্ত কাজ হিসেবে আমরা সেগুলো করছি।

হালখাতা

যৌথ বা সহযোগী উদ্যোগগুলো কীভাবে গ্রহণ করছেন?

তানভিরুল হক প্রবাল

সেটা হল, ধরা যাক একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান 'এশিয়ান ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সেন্টার' যার হেড অফিস ব্যাংককে; এই প্রতিষ্ঠানটি ইদানিং ১৮ মাসের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে; এই প্রকল্পের আওতায় ঢাকাতে অনেকগুলো সেমিনার হচ্ছে; এই প্রকল্পের কিছু কাজ আমরাও রিহ্যাব-এর মাধ্যমে করছি। কথা হল কাজটি আমরা কীভাবে করছি; আমাদের অনেকগুলো সাব-কমিটি রয়েছে, স্ট্যান্ডিং কমিটি রয়েছে– এসব কমিটির মধ্যে কাজগুলোকে ভাগ করে দেই। এমুহূর্তে রিহ্যাবের চার শত তিপ্পান্ন জন মেম্বার রয়েছে; এদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এবং কোনো-একটি রুলকে যথাযথভাবে পালনের জন্য আমরা নানাভাবে এদের চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে থাকি।

হালখাতা

'এশিয়ান ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সেন্টার' বাংলাদেশে ভূমিকম্প নিয়ে কী ধরনের কাজ করছে, আমাদের অন্তত দু-একটি প্রোগ্রামের কথা বলবেন কি?

তানভিরুল হক প্রবাল

আমার জানামতে সেমিনারের পাশাপাশি তারা বিভিন্ন পেশাজীবীদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাও করছে। যেমন বর্তমানে ইমামদের ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে, ইমামগণ যাতে নামাজ বা জুমার নামাজের পরে মুসল্লিদের মাঝে ভূমিকম্প নিয়ে সবাইকে সচেতন করে তুলতে পারেন। স্কুলের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও কীভাবে আত্মরক্ষা করতে হবে তার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। আবার রাজমিস্ত্রিদের ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে যাতে ভবন নির্মাণকালে প্রয়োজনীয় সচেতনতাটুকু তাদের মধ্যে তৈরি হয়।

হালখাতা

ইমামগণ আবার বলেন না যে, ভূমিকম্প আল্লাহর সৃষ্টি , কাজেই ভূমিকম্প হলে ভাগ্যে যা আছে সেটা হবেই! এখানে মানুষের কিছুই করার নেই!

তানভিরুল হক প্রবাল

আমি যতদূর জানি, না, সেটা এখন আর তারা বলছেন না। ট্রেনিং শুরুর দিকে কেউ কেউ এভাবে বলার চেষ্টা করতেন; তখন অবশ্য কেউ কেউ লোকবিশ্বাস থেকেও বলতে চাইতেন যে, পৃথিবীটা গরুর দুটি শিংয়ের যে কোনো একটির ওপর থাকে; আর এক শিং থেকে আরেক শিংয়ের ওপর পৃথিবীকে ঝাঁকি দিয়ে নেয়ার সময়ই পৃথিবীটা কেঁপে ওঠে, তখন ভূমিকম্প হয়। ইমামদের ট্রেনিং দেয়ার পরে অবশ্য এসব ধারণা তাদের মধ্য থেকে কেটে গিয়েছে।

হালখাতা

আপনি জানেন কি কত জন ইমামকে এই প্রকল্পের আওতায় ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে?

তানভিরুল হক প্রবাল

আমার জানামতে ১৫০ থেকে ১৬০ জন ইমামকে এই প্রকল্পের আওতায় একবারে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। আর বাংলাদেশে মোট ইমামদের সংখ্যা ৩ লক্ষ। তাহলে দেখা যাচ্ছে ২০০ ভাগের এক ভাগকে তারা মাত্র ট্রেনিংয়ের আওতায় নিতে পেরেছেন। অবশ্য আমার জানা মতে আরেকটি প্রকল্পের আওতায় একটি বড় সংখ্যক ইমামকে ট্রেনিংয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে।

হালখাতা

সকল ইমাম তো পুরুষ! সেক্ষেত্রে নারী ও শিশু-কিশোরদের সচেতনতার জন্য কি কোনো উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে?

তানভিরুল হক প্রবাল

আমার জানামতে চলমান এই প্রকল্পের আওতাতেই অন্য আরও একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যেখানে নারী ও শিশু-কিশোরদের ভূমিকম্প সম্পর্কে সচেতন করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

হালখাতা

কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব? একটু বিস্তারিতভাবে বলবেন কি?

তানভিরুল হক প্রবাল

তারা সেটা কীভাবে করছেন, সে ব্যাপারে আমি বিস্তারিত জানি না। আপনারা ওনাদের সঙ্গে আলাপ করলে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

হালখাতা

আপনি ব্যক্তিগতভাবে কী মনে করেন? এই বিশাল সংখ্যক নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোরকে কী উপায়ে দ্রুত ও সহজে ভূমিকম্প বিষয়ে তাদের করণীয় সম্পর্কে সচেতন করে তোলা সম্ভব?

তানভিরুল হক প্রবাল

আমরা তো টিভিতে টক শো করতে করতে টায়ার্ড হয়ে গেছি কিন্তু তাতে তো খুব একটা কাজ হচ্ছে না। এতে হয়তো একটি বিশেষ শ্রেণী সচেতন হচ্ছেন কিন্তু সাধারণ জনগণ ও শিশু-কিশোরদের জন্য আলাদাভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সেটা হতে পারে ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোতে বিজ্ঞাপন আকারে বারবার প্রচার করা এবং বিনোদন বা আধাবিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাধারণ জনগণকে সচেতন করা। পথনাটক বা লোকগানের মাধ্যমে সচেতন করা। পাঠ্যপুস্তকে ছবিসহ ভূমিকম্প বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করা। শহরে বিশেষ করে যেখানে লিফ্ট আছে, সেসব লিফ্টের মধ্যে যদি ছবিসহ পোস্টার সেঁটে দেয়া যায় তাহলে আমার মনে হয় স্কুলে যাওয়ার সময়ে এবং স্কুল থেকে ফেরার সময়ে শিশু-কিশোরদের সহজেই জিনিসটি চোখে পড়বে– এভাবে আরও নানা উদ্যোগের মধ্য দিয়ে এদের সচেতন করে তোলা সম্ভব।

হালখাতা

ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে গেলে ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবন ও মানুষের ক্ষেত্রে ভূমিকম্প-পরবর্তী পর্যায়ে রিহ্যাব কী ধরনের ভূমিকা নেবে?

তানভিরুল হক প্রবাল

সত্যি কথা বলতে কি, যদি মোটামুটি ধরনের একটি ভূমিকম্প হয়েই যায়, তাহলে রিহ্যাব-এর কিছু একটা করার জন্য কোনোই প্রস্তুতি নেই। আমরা যতদূর জানি বাংলাদেশ সরকারেরও উল্লেখযোগ্য কোনো প্রস্তুতি নেই। যা ভাবলে সত্যিই আতঙ্কিত হতে হয়।

হালখাতা

কিন্তু এই আতঙ্ক থেকে রক্ষার কোনো উপায়ের কথা কি অন্তত গবেষক বা চিন্তক পর্যায়েও ভাবা হচ্ছে?

তানভিরুল হক প্রবাল

সেটা হয়তো ভাবনা-চিন্তা করা হচ্ছে। কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি তো থাকার জন্য একটি শক্তিশালী জাতীয় অর্থনীতি থাকা দরকার। আর শক্তিশালী অর্থনীতির জন্ম দেয়ার জন্য উঁচু মানের রাজনীতি দরকার। এসবকে পাশ কাটিয়ে বড় কোনো অর্জনই সম্ভব নয়। ভূমিকম্পের পরে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, সেটা মোকাবেলার জন্য বড় কোনো উদ্যোগ সরকারকেই নিতে হবে। তবে রিহ্যাব-এরও পাশাপাশি প্রস্তুতি থাকা দরকার, যে বিষয়টি করার জন্য আমি যতদিন প্রেসিডেন্ট আছি ততদিন চেষ্টা করে যাব কিছু-একটা করার জন্য। দেখা যাক কতটুকু কী করা যায়।

হালখাতা

একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়র এবং রিহ্যাব প্রেসিডেন্ট হিসেবে 'বাংলাদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ' বিষয়টি মাথায় রেখে এমন একটি সুপারিশের কথা বলবেন কি যেটি আপনার নিকট এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে হয়?

তানভিরুল হক প্রবাল

সেটা হল, 'বাংলাদেশ একটি ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ' হিসেবে আমরা কিন্তু ভূমিকম্প থেকে কোনোভাবেই ঝুঁকিমুক্ত হতে পারছি না। কাজেই একটি বিল্ডিং তৈরির আগে একটি বিষয় অন্তত ভাবা দরকার যে ভূমিকম্প যেহেতু ঠেকানো যাবে না তাই সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণকে যতটা কমিয়ে রাখা যায় সেই চেষ্টাটা করে যাওয়া। এক্ষেত্রে আমার প্রধান একটি সুপারিশ হল, যে সব জমি ভরাট আছে সেসব জমিতে আগে বিল্ডিং করা; এতে করে ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি যেমন কম থাকবে এবং ফ্ল্যাটগুলোর ক্রয়মূল্যও অনেক কমে আসবে। কারণ ডোবা হলে সেটা যদি নতুন করে ভরাট করা হয় তাহলে সেই জায়গায় বিল্ডিং করা ঝুঁকিপূর্ণ আর পাইলিং করা হলে কস্ট বেড়ে যায়, কস্ট বেড়ে গেলে ক্রেতাকে সেটা অধিক মূল্যে ক্রয় করতে হয়। পক্ষান্তরে ভরাট জমিতে বিল্ডিং করা হলে ভূমিকম্পের ঝুঁকি যেমন কম থাকে একইভাবে সেক্ষেত্রে পাইলিংয়ের প্রয়োজন হয় না বিধায় ডেভেলপারদের ব্যয় কমে যায়; ফলে ফ্ল্যাট-ক্রেতাগণও তুলনামূলক কম খরচে ফ্ল্যাট ক্রয় করতে পারেন। কাজেই ভরাট জমিতে বিল্ডিং তৈরি করা অনেক বেশি কস্ট-এফেকটিভ হয়। সেজন্য বিল্ডিং তৈরির জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভরাট জমি ছেড়ে দেয়া দরকার বলে আমি মনে করি।

হালখাতা

প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও হালখাতাকে সময় দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

তানভিরুল হক প্রবাল

'হালখাতা'কেও ধন্যবাদ ভূমিকম্পের মতো একটি অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে একটি সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য।

বাংলা ভাষায় ভূমিকম্পবিষয়ক দুটি বই

সু ব্র ত ব ড়ু য়া

ভূমিকম্প হচ্ছে এমন এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় যা নিবারণ করা মানুষের সাধ্যাতীত; এমনকি ভূমিকম্পের আগাম সতর্কতা জ্ঞানের কৌশল বা প্রযুক্তিও মানুষ এখনো আয়ত্ত করতে পারেনি। সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীতে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে আসছে এবং প্রবল ভূমিকম্পের কারণে বিশ্বের নানা স্থানে ব্যাপক প্রাণহানিসহ অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতিও ঘটেছে। তবু ভূমিকম্প সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নিতান্ত সীমিত। ভূমিকম্প নিয়ে বাংলা ভাষায় সাধারণ উৎসাহী বা আগ্রহী পাঠকদের জন্য লেখা বইয়ের সংখ্যা তেমন বেশি কিছু নেই। ভূমিকম্প নিয়ে লেখা যে দুটি বইয়ের কথা এখানে বলতে যাচ্ছি সে দুটি হচ্ছে– সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ভূমিকম্প' এবং নির্মল সরকার রচিত 'ভূমিকম্পের কথা'। বই দুটি প্রকাশের সময়কালের মধ্যে ব্যবধান ৩৭ বছর। প্রথম বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে আর দ্বিতীয়োক্ত বইটি ২০০২ খ্রিস্টাব্দে। 'ভূমিকম্প' বইটির প্রকাশক বিশ্বভারতী, কলিকাতা। 'ভূমিকম্পের কথা' বইটির প্রকাশক বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা। বিশ্বভারতীর 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' সিরিজের বইগুলো সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য ভূমিকম্প বইটির শেষ প্রচ্ছদে যা বলা হয়েছে তা হল :

'বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষত, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিত্তানুশীলনের পক্ষে বাধার অন্ত নাই, ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না। যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান

যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।'

বইটির লেখক সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বইটির বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেছেন ১০টি অধ্যায়ে বা অংশে। সেগুলো হল: ১. ভূমিকম্পের প্রকৃতি, ২. ভূমিকম্পের মাত্রা-বিভাগ, ৩. ভূমিকম্পের কেন্দ্র, উপকেন্দ্র ও সমকম্পন রেখা, ৪. ভূমিকম্প-মাপক যন্ত্র, ৫. ভূমিকম্পের তরঙ্গ ও তাহাদের গতিবেগ, ৬. ভূমিকম্পের রেখাচিত্র, ৭. ভূমিকম্পের উৎপত্তির কারণ, ৮. ভূমিকম্পের ইতিবৃত্ত, ৯. ভূমিকম্প সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এবং ১০. ক্ষুদ্র কম্পন।

অধ্যায়গুলোর মধ্যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় আবার ২টি করে এবং সপ্তম অধ্যায় ৩টি অংশে বিভক্ত। সেগুলো হচ্ছে: ৫.১ ভূমিকম্পজনিত সমুদ্রস্ফীতি, ৫.২ ভূমিকম্পের আওয়াজ; ৬.১ পৃথিবীর অভ্যন্তরের গঠন, ৬.২ ভূকম্পীয় রশ্মি; ৭.১ মহাদেশের অবস্থান পরিবর্তন, ৭.২ সমস্থিতিবাদ, ৭.৩ অভিকর্ষের অসামঞ্জস্য।

বিষয়বস্তুর এ তালিকা থেকেই বোঝা যায় বইটিতে ভূমিকম্প বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনাসহ বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। ভূমিকম্পের সূচনা যে পৃথিবীর ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত সে কথা উল্লেখ করে লেখক সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:

'ভূমিকম্পের ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। সেই আদিমকালে, বহুকোটি বৎসর পূর্বে গোলাকার জ্বলন্ত তরল পদার্থের উপরিভাগ ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে যখন পৃথিবীর কঠিন পৃষ্ঠদেশের উদ্ভব হয় তখন হইতেই ভূপৃষ্ঠে ভূমিকম্পও আরম্ভ হয়। এইসব ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠদেশেরও বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং এখনও ঘটিতেছে।

ভূমিকম্প এত প্রাচীন হইলেও লিখিতভাবে ভূমিকম্পের বিবরণ খ্রীস্টপূর্ব ১৮০০ সালের পূর্বে পাওয়া যায় না। কম্পনের তীব্রতা অনুসারে অ্যারিস্টটল ছয় প্রকারের ভূমিকম্পের বিবরণ দিয়াছেন। ১৩২ খ্রীস্টাব্দে চীন দেশের টিয়োকো নামের এক ব্যক্তি ভূমিকম্পের প্রথম আন্দোলনের নির্দেশ পাওয়ার জন্যে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তখন হইতে চীন দেশে এবং অন্যান্য দেশেও ভূমিকম্পের কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু ভূমিকম্প-বিজ্ঞানের প্রকৃত সোপান প্রস্তুত আরম্ভ হয় মাত্র দুই শত বৎসর পূর্বে। ঐ সময় হইতে ভূমিকম্প-পর্যবেক্ষণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত হয়, গণিতের সাহায্যে ভূমিকম্প তরঙ্গের উৎপত্তি ও বিস্তারের সঠিক আলোচনা করা হয় এবং গত পঞ্চাশ বৎসরে অনেক উৎকৃষ্ট ভূমিকম্প-মাপক যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে এবং পৃথিবীর সর্বত্র ভূমিকম্প মানমন্দির স্থাপনের ফলে ভূমিকম্প সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমরা জানতে পারিয়াছি। ভূমিকম্পের তরঙ্গ পৃথিবীর অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হওয়ার সময় পৃথিবীর অভ্যন্তরের যে সংবাদ বহন করিয়া আনে, তাহা হইতে পৃথিবীর অভ্যন্তরের এক মনোরম চিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে।'

সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভূমিকম্প বইটির সপ্তম অধ্যায় বা অংশে 'ভূমিকম্পের উৎপত্তির কারণ, প্রসঙ্গে লিখেছেন :

'পৃথিবী চির-অশান্ত ও পরিবর্তনশীল। পৃথিবীর জন্মের ইতিহাস আলোচনা করিয়া জানা যায় যে শতকোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবী জলীয় বাষ্পযুক্ত বায়ুমলে আবৃত অতি উষ্ণ গোলাকার তরল পদার্থে পূর্ণ ছিল। তখন পৃথিবীর উপরিভাগ উত্তাল তরঙ্গমালায় এবং জোয়ার-ভাঁটায় উদ্বেলিত এক বিরাট গোলাকার অতি উষ্ণ ফুটন্ত মহাসাগরের ন্যায় ছিল। তারপর পৃষ্ঠতল ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে কোনো কোনো স্থানে শিলা হইয়া ভাসিতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে সকল স্থান উঁচু-নিচু কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। ইহাই ভূত্বকের প্রারম্ভের ইতিহাস। পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা, সমভূমি, মালভূমি, বিরাট বিরাট খাদ, সমুদ্রগর্ভ হয় ইহার ভূসংস্থান (Topography)।

এই পাতলা ভূত্বকের নীচের অতি উষ্ণ গলিত পদার্থ ইহাকে সারাক্ষণ আন্দোলিত করিতে থাকে। এই অবস্থাতেই ভূমিকম্পের জন্ম হয়। ক্রমে ক্রমে কয়েক কোটি বৎসর গত হয়, পৃথিবী আরও ঠাণ্ডা হয় এবং উহার উপরিভাগের কাঠিন্য উহার অভ্যন্তরে আরও গভীরভাবে প্রবেশ করে। ভূত্বকের উপরের উষ্ণতা যখন ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের নীচে নামিয়া আসে তখন মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইয়া সমুদ্রগর্ভ, হ্রদগর্ভ, খানা, ডোবা সব জলে পূর্ণ হইয়া যায় এবং বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প অনেক কমিয়া যায়। শতকোটি বৎসর গত হইয়াছে, এখনও পৃথিবীর অন্তর্দেশ গলিত এবং অতি উষ্ণ অবস্থায় আছে। আজও ইহার উপরিভাগে ভূমিকম্পের তাণ্ডবলীলা চলিতেছে।'

ভূমিকম্পের উৎপত্তির কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জার্মানির বিখ্যাত আবহবিদ ওয়েগনার (বিমহবৎ) প্রচারিত মহাদেশের অবস্থান পরিবর্তনবাদ (Theory of Continental Drift) সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। এছাড়া তিনি সমস্থিতিবাদ (Theory of isostacy) এবং অভিকর্ষের অসামঞ্জস্য (gravity anomaly) সম্পর্কেও বিবরণ উপস্থাপন করেছেন। সমস্থিতিবাদ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

'ভূমিকম্পের আলোচনায় সমস্থিতিবাদের মূল্য বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে পৃথিবীর পৃষ্ঠত্বকের নানা কারণে পরিবর্তন ঘটিতেছে। বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়া হিমালয়ের উপরের মৃত্তিকা ক্রমাগত অপসারিত করিতেছে, নানা স্থানে ভূমিস্খলন ঘটিতেছে এবং হিমবাহ অনেক গণ্ডশিলা (boulder) নীচে নামাইতেছে। ভাসমান হিমালয় ইহার ফলে আরও উচ্চ হইয়া উঠিতেছে কিংবা ইহার উপরের দিকে উঠিবার জন্য একটা শক্তি কাজ করিতেছে। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় হিমালয়ের সীমান্তে সমভূমির সঙ্গে সন্ধিস্থলে একটা ফাটল আছে; ইহাকে বলা হয় সীমান্তের স্রংশ (boundary fault)। স্রংশের উভয় দিকের পদার্থ পর্যবেক্ষণ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় এক অংশের অপরাংশ হইতে অপসরণ ঘটিয়াছে। এইরূপ সীমান্তের স্রংশের নিকট ভূমিতলে অবস্থিত বড়ো বড়ো প্রস্তরের উপর ক্রমবর্ধমান যুগ্মবল (couples) কাজ করে, যাহার ফলে এমন একটা সময় আসে যখন উহারা ফাটিয়া চুরমার হইয়া যায়। ইহাতেই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। এগুলির কেন্দ্র প্রায় অগভীর হয়। ভারতবর্ষের অনেক ভূমিকম্প হিমালয়ের স্রংশের নিকটে উৎপন্ন হয়।'

ভূমিকম্পের আরও একটা কারণ অনুমান করা হয়। ঐ কারণটি গভীর কেন্দ্রের বেলায় খাটে। পরীক্ষার ফলে জানা যায় যে কোনো পদার্থের অবস্থা যদি অত্যধিক পীড়ন অথবা চাপ ও উষ্ণতার দরুন গলনাঙ্কের (melting point) নিকটে থাকে তাহা হইলে ঐ পীড়ন অথবা চাপ সামান্য বৃদ্ধি করিলেই উহা গলিত অবস্থা প্রাপ্ত হয় কিংবা উহার আণবিক গঠনের পরিবর্তন (polymorphictransition) ঘটে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোনো স্থানে ঐরূপভাবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলে ঐ স্থানের পদার্থের হঠাৎ আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে ভূমিকম্প উৎপন্ন হয়। ভূমিকম্পের ফলে পীড়ন অথবা চাপ কমিয়া যায় এবং ঐ স্থানের পদার্থ আবার পূর্বের অবস্থা ফিরিয়া পায়। আবার পীড়ন অথবা চাপের বৃদ্ধি ঘটিলে ঐ স্থানেই কিংবা উহার নিকটবর্তী স্থানে পুনরায় ভূমিকম্প হয়। হিন্দুকুশ পর্বতের প্রায় ২৫০ কিলোমিটার নীচে প্রায় একই স্থানে পুনঃ পুনঃ ভূমিকম্প হইয়াছে। এইজন্যে অনুমান করা হয় উপরোক্ত প্রণালীতে ঐখানে ভূমিকম্প হয়।'

বইটিতে ভূমিকম্পের মাত্রাবিভাগ প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে একেবারে শুরুর দিকে। এতে লেখক 'রশি-ফরেল' (Rossy-Forel) মাত্রাবিভাগ, 'মারকেলি' মাত্রাবিভাগ এবং 'পরিবর্তিত মারকেলি মাত্রাবিভাগ'-এর উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন। 'রশি-ফরেল' মাত্রাবিভাগের ক্ষেত্রে ভূমিকম্পকে দশটি মাত্রাতে বিভক্ত করা হয়েছিল; পক্ষান্তরে 'পরিবর্তিত মারকেলি মাত্রাবিভাগ' বিভক্ত বারোটি মাত্রায়। এ বইটিতে আরো রয়েছে ১৭৩৭ খ্রি. থেকে ১৯৫০ খ্রি. পর্যন্ত ২১৪ বছরে ভারতীয় উপমহাদেশে সংঘটিত ৮০টি ভূমিকম্পের একটি তালিকা। এ ছাড়াও রয়েছে অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বে সংঘটিত বড়ো বড়ো ১২টি ভূমিকম্পের বিবরণ। মোট ৮৭ পৃষ্ঠার নাতিবৃহৎ এ বইটিতে যদিও বর্ণনার চেয়ে বেশি রয়েছে তাত্ত্বিক ও গাণিতিক উপস্থাপন, তবুও সাবলীল ও সহজ ভাষায় রচিত বলে সাধারণ পাঠকদের পক্ষেও বইটি পড়তে তেমন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

দুই

ভূমিকম্প বিষয়ে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত 'ভূমিকম্পের কথা' বইটির প্রকাশক 'বাংলাদেশ শিশু একাডেমী' বিধায় অনুমান করা যায়, উদ্দিষ্ট পাঠকসমাজ অবশ্যই কিশোর ও তরুণরা। সে কারণেই বইটির লেখক নির্মল সরকার যথাসম্ভব সহজ ভাষায় বইটিতে ভূমিকম্পবিষয়ক নানা তথ্য তুলে ধরেছেন। এ বইটির বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে বারোটি অধ্যায়ে। সেগুলি হল : ১. ভূমিকা, ২. ভূমিকম্প সম্পর্কে জানা দরকার, ৩. ভূমিকম্পের কারণ, ৪. ভূমিকম্পের তীব্রতা ও শক্তি পরিমাপ স্কেল, ৫. ভূমিকম্পের ফলাফল, ৬. পৃথিবীর ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা, ৭. ভূমিকম্পের পূর্বাভাস, ৮. বাংলাদেশে সংঘটিত ভূমিকম্পের কারণ, ৯. বাংলাদেশে সংঘটিত সাম্প্রতিক কয়েকটি ভূমিকম্প, ১০. মহানগরী ঢাকার ভূমিকম্প হুঁশিয়ারি, ১১. বাংলাদেশে ভূমিকম্প পরিমাপ বিষয়ে সুযোগ-সুবিধা ও মানচিত্রায়ন, এবং ১২. বাংলাদেশে ভূমিকম্প সচেতনতা এবং ভূমিকম্প থেকে রক্ষার উপায়।

'ভূমিকম্পের কারণ' শীর্ষক অধ্যায়ে লেখক প্রথমে ভূমিকম্প সম্পর্কে লোকবিশ্বাস, পৌরাণিক কিংবদন্তি এবং প্রাচীন যুগের পণ্ডিতদের ব্যাখ্যার বিষয় বর্ণনা করেছেন। এরপর বৈজ্ঞানিক মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার তাত্ত্বিক আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন 'ইলাস্টিক রিবাউন্ড থিউরি'র কথা। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

"কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে ভূপৃষ্ঠের ভূমিকম্পের কারণ নিয়ে অনেক মতামত ও বিশ্লেষণ আমরা জেনেছি। এ সকল বিজ্ঞানসম্মত মতামত ও যুক্তি থেকে ভূমিকম্প বিষয়ে জানা গেছে অনেক কিছু। এ সকল মতামত ও যুক্তি নির্ভরযোগ্য এবং বেশ জোরালো। এ বিষয়ে যে তত্ত্বটি রয়েছে সেটির নাম 'ইলাস্টিক রিবাউন্ড থিওরি' অর্থাৎ কিভাবে একটি ভূমিকম্প সংঘটিত হয় তার বিশ্লেষণ রয়েছে এই তত্ত্বে। এটিই হচ্ছে 'ইলাস্টিক রিবাউন্ড থিওরি'। এ তত্ত্বে বলা হয়েছে– ভূ-অভ্যন্তরভাগে পাশাপাশি অবস্থিত শিলাস্তর কোনো সময় যদি অস্বাভাবিক চাপের মুখে পড়ে তখন সেই শিলাস্তূপের কোনো দুর্বল অংশ দিয়ে তা ছিঁড়ে যেতে বাধ্য হয়। ফলে পার্শ্ববর্তী স্তরের তুলনায় অপর অংশের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ স্থানচ্যুতি ঘটে। এতে শিলাস্তরের স্থির অবস্থায় পরিবর্তন আসে। এই আকস্মিক স্থানচ্যুতি এবং শিলাস্তরের পতন অভ্যন্তরীণ অন্য স্তরের ভেতর দিয়ে শক্তি বিচ্ছুরিত করে এবং তা প্রসারিত হয়ে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে। তথ্যটির এই ব্যাখ্যার কথাগুলো বলেন ড. চার্লস এফ. রিখটার। তিনিই ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপার যন্ত্র রিখটার স্কেলের আবিষ্কারক।"

ভূমিকম্পের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বইটিতে আরো লেখা হয়েছে :

'ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞদের গবেষণা অনুযায়ী সাধারণত যে কারণগুলো ভূমিকম্পের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয় সেগুলোর মধ্যে দু'টি কারণ প্রধান। একটি, ভূ-আলোড়ন। অন্যটি, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত।

ভূ-আলোড়নের প্রভাবে কোনো ফাটল বরাবর একটি শিলাস্তর হতে পার্শ্ববর্তী শিলাস্তরের মধ্যে স্থানচ্যুতি ঘটলে তাকে বলা হয় চ্যুতি (Fault)। ভূমিকম্প সংঘটনে এই চ্যুতিরও প্রভাব রয়েছে। ১৯৫৯ সালের ১৭ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের হেবগেন এবং ম্যাডিসন জলপ্রপাত এলাকায় যে ভূমিকম্প হয় সেটি চ্যুতিজনিত। এজন্য প্রায়ই বলা হয়– চ্যুতি, আগ্নেয়গিরি এবং ভূমিকম্প তিনটি একই সঙ্গে দেখা যায়।

এ তিনটি প্রধান কারণ ছাড়াও লেখক ভূমিকম্পের আরও যে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল– তাপ বিকিরণ, ভূমিধ্বস এবং হিমালয়ের মতো বৃহদাকার পর্বতগাত্র থেকে তুষারখণ্ড ধ্বস ইত্যাদি। এছাড়াও লেখক উল্লেখ করেছেন কৃত্রিম বা মনুষ্যসৃষ্ট ভূমিকম্পের কথাও। 'ভূমিকম্পের তীব্রতা ও শক্তি পরিমাপ স্কেল' শীর্ষক অধ্যায়ে লেখক নির্মল সরকার ভূমিকম্পের তীব্রতা নির্ধারণের জন্য আবিষ্কৃত স্কেলগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি উল্লেখ করেছেন ইতালির এম. এস. ডি. রসি (১৮৭৪), সুইজারল্যান্ডের এফ. এ. ফোরেল (১৮৭৮), ইতালির জি. সারকেল্লি (১৯০২) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ড. চার্লস এফ. রিখটার (১৯৩৫) কর্তৃক উদ্ভাবিত

স্কেলগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, বর্তমানে আমরা যে স্কেল ব্যবহার করি সেটি 'রিখটার স্কেল।'

ভূমিকম্পের ফলাফল শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন :

'ভূমিকম্প মানুষের কাছে একটি ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। বিভীষিকাময়ও বটে। কারণ ভূমিকম্প ভূত্বকের উপরিভাগের জল ও স্থল উভয় ভাগেই ভীষণ ক্ষয়-ক্ষতি ও ধ্বংসলীলা ঘটিয়ে থাকে। পৃথিবীতে বোধ হয় খুব কম প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলেই এরূপ হয়ে থাকে। এতে ক্ষতি হয় প্রাকৃতিক সম্পদের। মানবসৃষ্ট সম্পদেরও কম ক্ষতি হয় না। প্রাণ বিনষ্ট হয়, অনেকে আহত ও গৃহহীন হয়। শুধু তাই নয়, ভূমিকম্প থেকে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন দুর্যোগ। এগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলাফল আরো ভয়াবহ। যেমন অগ্নিকাণ্ড এমনি একটি বড় ধরনের সমস্যা ও দুর্যোগ। বিশেষ করে নগর এলাকায় ভূমিকম্পের সময় এ ধরনের দুর্যোগ অহরহই ঘটতে পারে। জাপানে ১৯২৩ সালে পহেলা সেপ্টেম্বর যে ভূমিকম্প সংঘটিত হয় তাতে নগর এলাকায় আগুন ধরে যায়। সরকারি হিসেব মতে এ সময় ৯,৯৩৩ জন লোক মারা যায়। নিখোঁজ হয় ৪৩,৪৭৩ জন। আহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১,০৩,৭৩৩ জন। ৫,৭৬,২৬২টি বাড়ি-ঘরের ক্ষতি হয়। এতে ধ্বংস হয়ে যায় শহরটির পুরো কাঠামো।'

এ বইটির বিশেষত্বের একটি দিক হল 'ভূমিকার পূর্বাভাস' শীর্ষক অধ্যায়টিতে উপস্থাপিত আলোচনা। এতে প্রচলিত লোকবিশ্বাস থেকে শুরু করে পূর্বাভাস সম্পর্কিত গবেষণার উল্লেখ রয়েছে। তবে এ আলোচনা বিস্তারিত তথ্যসমৃদ্ধ নয়। বইটির আরেকটি বিশেষ দিক বাংলাদেশ সম্পর্কিত আলোচনা। এ আলোচনায় বাংলাদেশে সংঘটিত ভূমিকম্পের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষের ফলেই বাংলাদেশে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে থাকে। ভূমিকম্পের কারণ অনুসন্ধান ছাড়াও বাংলাদেশে সংঘটিত সাম্প্রতিক কয়েকটি ভূমিকম্প নিয়েও এ বইটির একটি অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে এবং একটি সারণিতে তা তুলে ধরা হয়েছে।

'মহানগরী ঢাকার ভূমিকম্প হুঁশিয়ারি' অধ্যায়টিতে লেখক ঢাকা নগরীর ভূ-তাত্ত্বিক গঠনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোচনা তুলে ধরেছেন। এ আলোচনার একেবারে শুরুতেই তিনি আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে 'সুতরাং যে কোনো সময়ে ভূমিকম্পের প্রকোপে আক্রান্ত হতে পারে আমাদের এই তিলোত্তমা নগরী ঢাকা।' এর কারণ প্রসঙ্গে লেখক লিখেছেন :

'আমরা অনেকেই জানি মহানগরী ঢাকা এমনিতেই ভূতাত্ত্বিকভাবে অস্থিতিশীল বৃহত্তর মধুপুর সোপানভূমির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মধুপুর সোপানভূমি অঞ্চলটি সামগ্রিকভাবে বঙ্গ অববাহিকার একটি ক্রমোত্থিত অংশ। এখানে চলছে উত্থান প্রক্রিয়া। অপর দিকে ঢাকা মহানগরীতেও স্থায়ীভাবে অনেকগুলো ভূতাত্ত্বিক ব্লক রয়েছে। এই ব্লকগুলোর কোনোটি উত্থিত হচ্ছে, কোনোটি দেবে যাচ্ছে। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় বিগত কয়েক শতকে এ অঞ্চলটি ১১ মিটারের মতো দেবে গেছে। পশ্চিমে যমুনা উপত্যকা অঞ্চলটি ধাক্কা দিচ্ছে; দক্ষিণে রয়েছে বৃহত্তর ঢাকা অবনমন অঞ্চল যা কিনা

সাম্প্রতিক কালে বার্ষিক ১.৮২ মি.মি. হারে নিমজ্জিত হচ্ছে। এসব অস্থিতিশীল ভূতাত্ত্বিক অঞ্চলের প্রভাব নিশ্চিতভাবেই ঢাকা মহানগরীর ওপর পড়বে। ভূমিকম্প সম্ভাবনার দিক থেকে ঢাকার অবস্থা বিপজ্জনক পর্যায়ে।'

ঢাকা মহানগরী ছাড়াও লেখক তাঁর বইয়ে বাংলাদেশে ভূমিকম্প পরিমাপ সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা এবং ভূমিকম্পের মোকাবিলার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে আলোচনা করেছেন পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে। মোট কথা, বইটিতে ভূমিকম্প সম্পর্কে জ্ঞাতব্য নানা বিষয়ে যথাসম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটি যেহেতু শিশু-কিশোর পাঠকদের জন্য রচিত সেজন্য এতে তাত্ত্বিক বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে সহজ ভাষায় এবং গাণিতিক উপস্থাপনা পরিহার করা হয়েছে।

আমাদের জানা মতে বাংলাভাষায় ভূমিকম্প বিষয়ে এই ক্ষুদ্রকার বই দুটি বাদে আর কোনো বই নেই। বিশেষ করে গভীর ও বিস্তৃত পসিরে জানার জন্য ভূমিকম্প নিয়ে বাংলায় একটি বইও নেই। বিষয়টি আমাদের হয়তো অবাক করে কিন্তু এটি-ই সত্য। আর ভূমিকম্প নিয়ে যারা একাডেমিশিয়ান গবেষক আছেন তাঁদের মাধ্যমে বাংলা নয়, ইংরেজি ভাষা। কাজেই আমাদের দারিদ্র্য অনেক ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও যে, এতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাংলায় অন্তত একটি বৃহৎ আকারের বই নেই। এই দারিদ্র্য সূচক অমাদেরই আমাদেরই লজ্জার আবরণে!

[সুব্রত বড়ুয়া। কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক। প্রাক্তন পরিচালক, বাংলা একাডেমী।]

ভূমিকম্প নিয়ে কিছু কথা

র বি উ ল হু সা ই ন

ভূমিকম্পে পৃথিবী যখন জেগে ওঠে অথবা গা-ঝাড়া দিয়ে একটু আড়মোড়া দেয়, তখন তার ওপর-ভাগে বাস-করা প্রাণী, জীব-জন্তু, গাছ-পালা, নদী-সাগর সব দুলে ওঠে প্রবলভাবে। তাতে সবার ভীষণ ক্ষতি ও অসংখ্য প্রাণহানি ঘটে। নির্ভর করে কত প্রবলতায় তা সংগঠিত হয়। যে-প্রবল শক্তিতে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে তা পরিমাপ করার জন্যে যে যন্ত্র সাধারণত ব্যবহৃত হয়, সেটা রিখটার যন্ত্র হিসেবে পরিচিত। এই রিখটার যন্ত্রের স্কেলে যত মাত্রা বাড়ে, ততই তা মারাত্মক ও ভয়াবহরূপে দেখা দেয়। আমাদের দেশে জানা যায় ১৮৯৭ সালে বিরাট এক বিধ্বংসী ভূমিকম্প দেখা দিয়েছিল। তার জন্যে উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়। ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ পরিবর্তন হওয়া ছাড়া দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরসহ অসংখ্য দালান-কোঠার ধ্বংস ও ভগ্নসাধন ঘটে। সাধারণত দেখা যায় যে, একশ বছর পরপর এ ধরনের বড় আকারের ভূমিকম্প আসে। তবে যেই হিসেবে ১৯৯৮ সালে বড় আকারের ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা ছিল সেই আকারের বড় ভূমিকম্প তখন হয়নি। এই ভয়াবহ ঝুঁকির ভূমিকম্প অবশ্য তারপর থেকে যে-কোনো সময়ে ঘটতে পারে। এরকমই বিশেষজ্ঞরা মনে করে থাকেন। তাহলে বলা যায় এই সময়ে অর্থাৎ আজ বা কাল যে-কোনো দিনে বা যে-কোনো মুহূর্তে ভূমিকম্প তার বিধ্বংসী রূপ নিয়ে আমাদের সামনে হানা দিতে পারে। তাই যদি ঘটে তাহলে কী যে অবস্থা হবে পরবর্তী সময়ে, সেই কথা চিন্তা করলেও দেহ-মন সব অবশ হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে।

কিন্তু তাই বলে বসে থাকলে তো চলবে না, আমাদের এর বিপরীতে প্রয়োজনীয় প্রতিকার আর সেই দুঃসময়ে এই বিপদের মোকাবেলা করে সাহসের সঙ্গে মুখোমুখি যাতে হওয়া যায়, ভয় না করে, ভেঙে না পড়ে, হতাশাগ্রস্ত না হয়ে সেই মনোবল অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপক ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া কোনো উপায় আমাদের সামনে নেই। এই সচেতনতাটি এখন থেকেই লালন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বাস্তবায়নের রাস্তা সুগম না করলে সামনে সমূহ বিপদের হাত থেকে কেউই বাঁচতে পারব না। ভূমিকম্প ধ্বংসযজ্ঞটি সবসময় দৈবাৎ ঘটে, আগাম কোনো খবর না দিয়ে এবং এই দুর্ঘটনাটি বন্যা বা ঝড়ের মতো আগে থেকে জানার কোনো বৈজ্ঞানিক উপায়ও নেই। তবে জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি ও পিঁপড়ার অস্বাভাবিক ভয়ার্ত গতিবিধি বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দলে দলে স্থান পরিবর্তন শুরু হলে বিশেষজ্ঞরা যদি লক্ষ রাখেন তাহলে হয়তো খানিকটা আগাম সংবাদ জানা যেতে পারে। এই বিশেষ আচরণের

কারণ হিসেবে তারা যদিও কোনো সঠিক বিজ্ঞানসম্মত ধারণা এখনো খুঁজে পাননি, যদিও চেষ্টাটি অব্যাহত আছে। যেমন বহু পিপঁড়ের মধ্যে তারা কোনো রকম যানজট না বাধিয়ে যে-চলাচল করে, সেটা দেখে একদল জার্মান বিজ্ঞানী শহরের তীব্র যানজট সমস্যার সমাধান করতে গবেষণা করে যাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি পরম গুরু ও শিক্ষক। মানুষের যাবতীয় শিক্ষার বিষয়, বিপদ-সঙ্কুলতা থেকে আশ্রয়ের উপায়, উদ্ভিদজগতের মাধ্যমে ঔষধের দ্বারা রোগ-শোক থেকে নিরাময় লাভ, শস্য, ফুল-ফল থেকে খাদ্য-খাবারের যোগান– এ সবই প্রকৃতি থেকে আহরিত শিক্ষা থেকে সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব আবিষ্কার যা মাটি, বাতাস, আগুন, পানি, আকাশের মেঘ-বিদ্যুৎ ইত্যাদি নানা উৎস থেকে গভীর পর্যবেক্ষণ ও বিজ্ঞান-মনীষীদের দ্বারা প্রচলিত ও ব্যবহৃত আবিষ্কার সর্বজনীনভাবে যেভাবে ঘটেছে সবই প্রকৃতির অবারিত অবদান। আবার এই প্রকৃতিই তার রুদ্ররূপ ধারণ করে সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, অগ্ন্যুৎপাত, বন্যা, আর মহামারী দিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করে এবং তার অনেক কিছুই হঠাৎ করে ঘটে। যে-প্রকৃতির এমন রহস্যময় বিরূপ ও বিধ্বংসী আচরণ, তা চিরটাকাল অজানাই থেকে যাবে সেটাই-বা কেন হবে!

ভূমিকম্প কেন হয়? বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি গ্রহের ওপরে ভূপৃষ্ঠে সমভূমি বা পর্বতশ্রেণী কিংবা আমাদের পৃথিবীর মতো বিশাল সাগর থাকলেও ভেতরে অতি তাপমাত্রার তপ্ত অগ্নিলাভা বিদ্যমান। সেই লাভা কোনো কারণে যখন অগ্নিগিরি হয়ে উদগারিত ও বিচ্ছুরিত হয় তখন ভূপৃষ্ঠে কম্পনের সৃষ্টি হয় এবং তখনই ভূমিকম্প ঘটে। আবার এমনও হয় যে, গ্রহের মধ্যে যে বহু টেকটনিক প্লেট বিদ্যমান তা যদি তার স্থান বদল করে বা একটা থেকে আরেকটা ওপরে বা নিচে কোনো কারণে নড়াচড়া করে, তখন যে-প্রবল কম্পনের সূত্রপাত ঘটে, সেটা ভূপৃষ্ঠের ওপরে ভূমিকম্প তার ভয়ঙ্কর-রূপ নিয়ে হাজির হয়। এখন আমরা যে-পৃথিবীর রূপ দেখি তার সৃষ্টি হয়েছে আদিকাল থেকে বারবার সংগঠিত অনেক অনেক অগ্ন্যুৎপাত আর ভূমিকম্পের কারণে। সাগরের সৃষ্টি হয়েছে বহুকাল অবধি ক্রমাগত বৃষ্টি, বজ্রপাত ও ঘূর্ণিঝড়ের বদৌলতে। বলা যেতে পারে, পৃথিবীর এই বর্তমান রূপ বহু ঘাত-প্রতিঘাত ও চড়াই-উৎরাই পার করে এখন শান্ত ও স্থিতিশীল অবস্থারই স্বরূপ। তবে মাঝে-মধ্যে একটু যে নড়ে-চড়ে ওঠে তাতে বেশ ভালোই হয় তবে তা একটু বিপদ ডেকে আনে। সমতলভূমির চেয়ে পাহাড়-পর্বত অঞ্চল ভূমিকম্পের জন্যে বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ। আমাদের দেশটি নদী-বিধৌত পলিমাটি দিয়ে গঠিত, এক সুজলা-সুফলা ভূ-খণ্ড। এখানে পাহাড়শ্রেণী তেমন নেই বললেই চলে। তবুও এ অঞ্চল ভূমিকম্পের দিক দিয়ে খুব সংঘাতপূর্ণ। ভূমিকম্পের তীব্রতাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় যেমন ঝুঁকিপূর্ণ, মাঝারি এবং মৃদু। তেমনভাবে বাংলাদেশকেও তিন ভাগে বিভাজিত করা হয়েছে; মানচিত্রে দিনাজপুর-রংপুরের নিচ দিয়ে একটু বাঁকা করে সিলেট অঞ্চলের নিচ পর্যন্ত যদি একটি রেখা টানা যায় তাহলে তার ওপরের অংশবিশেষ তীব্র ঝুঁকিপূর্ণ। আর যশোর-কুষ্টিয়ার নিচ দিয়ে ঢাকা হয়ে পার্বত্য-চট্টগ্রামের মাঝ বরাবর বাঁকা করে রেখা টানলে তার ওপরের অংশ মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ আর তার নিচের অংশ অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর

অবধি খুলনা-বরিশাল সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল। কিন্তু এরপরেও ভূমিকম্পের তীব্রতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা যায় না, যে-কোনো অঞ্চলে যখন-তখন ভূমিকম্প তার মর্জিমাফিক আঘাত হানতে পারে। রাজধানী ঢাকা শহর মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে পড়লেও, বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে এর ভূ-গর্ভ বরাবর যে টেকটনিক প্লেট আছে যেটা থেকে আরেকটি বেশ অসমভাবে বিদ্যমান, একই তলে সমানভাবে নেই। ফলে যে-কোনো সময়ে প্রবলভাবে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, একটু বিচ্যুতি হলেই তখন এমন এক ভয়াবহ ভূমিকম্প দেখা দেবে যা ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ডেকে আনবে।

এখন যদি এমন হয়, তাহলে গ্রামাঞ্চলের চেয়ে ঢাকা শহরই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং স্বভাবতই তা শহরের উঁচু-উঁচু দালানের কারণে। স্থপতি, নগরবিদ ও সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের দ্বারা অথবা এদের ব্যতিরেকে যে-সমস্ত বহুতলবিশিষ্ট বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবন অপরিকল্পিতভাবে যত্রতত্র গড়ে উঠেছে কিংবা প্রয়োজনীয় ও ন্যূনতম সঠিক প্রযুক্তি ও যথোপযুক্ত উপাদান ছাড়াই বলা যায় যে-সমস্ত বেশির ভাগ দালান-কোঠা নির্মিত হয়েছে, সেগুলোর পরিণতি হবে ভয়াবহ। এসব স্থাপনা তৈরি হয়েছে তড়িৎগতিতে অল্প সময়ে অতিলোভের কারণে অর্থশালী হওয়ার জন্যে। যারা ভয়াবহ এবং অসুস্থ এই প্রতিযোগিতায় নেমেছেন, তারা দেশের জন্যে তো বটেই স্বয়ং নিজের এবং প্রতিবেশীসহ সবার জন্যে ধ্বংসের কারণ। প্রতিটি মানুষের সামাজিক দায়িত্ব আছে, তা তারা যদি পালন না করেন তাহলে তা সবার জন্যে বিপদ ডেকে আনবেই। নিকট অতীতে আমরা দেখেছি কেমন করে তাসের ঘরের মতো প্যানকেক সিনড্রোম অনুযায়ী অতিলোভী ধন-অহঙ্কারী মূর্খ ব্যক্তিদের ভবনসমূহের একে একে ভূমিকম্প হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটেছে এবং অসংখ্য নির্দোষ মানুষেরা প্রাণ হারিয়েছে। যেই জন্যে নির্মাতা, মালিকপক্ষ, নক্সাকারী এবং কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই কঠোরভাবে নিয়ম-কানুন, নীতিমালা, নির্মাণ-কোড যথাযথভাবে অনুকরণ করতে হবে, তা না মানলে আইনত তারা দণ্ডিত হবেন, কারণ তা বেআইনী এবং চরম এক মানবতাবিরোধী কাজ। ভাবলে শিউরে উঠতে হয় যদি ভূমিকম্প সত্যিই ঘটে তাহলে কী ভয়াবহ ঘটনার অবতারণা হবে। এসবের নিরসনের জন্যে আশার কথা, কয়েক বছর আগে বাংলাদেশে নির্মাণ কোড প্রচলিত হয়েছে এবং ইদানিংকালে ফ্লোর এরিয়া রেশিও বা ফারেরও উদ্ভব ঘটেছে। ভূমিকম্পের রিখটার স্কেলের মাপকাঠি অনুযায়ী কাঠামো স্ট্রাকচারাল প্রকৌশলীদের পক্ষে যথাযথভাবে একটি দালান ডিজাইন করা সম্ভব নয় যদিও ডেভেলপাররা তেমনভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন, তবে তারা ভবনের ভূমিকম্প -পরবর্তী ভয়াবহ অবস্থার তীব্রতা লাঘব করতে এক সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারেন। ভূমিকম্প যেহেতু রহস্যপূর্ণ আচরণ করে; কখন, কী এবং কতটুকু ভূমিকম্প ঘটবে তা আগে থেকে জানা যায় না। না ঘটা পর্যন্ত তাই এই অজানা অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হয়। একটি ভবনকে ভূমিকম্পের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকতে হলে ভবনের গঠন, ভূমির ভর নেয়ার ক্ষমতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, উন্নত যথাযথ স্থাপত্য ও প্রকৌশল নক্সা, উপরন্তু নির্মাণসামগ্রীর পর্যাপ্ততা ও ব্যবহারের নিশ্চয়তা, নির্মাতার নৈতিকতা, যথোপযুক্ত তদারকি, উপরন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিবিড় পর্যবেক্ষণ– সবই ভীষণভাবে জরুরি। মনে

রাখতে হবে সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ আধুনিক এক উন্নত প্রযুক্তি। এরকম ধরনের স্থাপনার ক্ষেত্রে কোনোরূপ শৈথিল্য, কারচুপি, চৌর্যবৃত্তি ও ধূর্তামি-চালাকির কোনো জায়গা নেই এবং এ নিয়ে কোনো ছেলেখেলা চলে না। যতটুকু প্রয়োজন তা উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ দ্বারা তাদের অভিজ্ঞতানুযায়ী বাস্তবায়ন করতে হয়, এটাই আধুনিক সভ্যতার শিক্ষা। এখানে ওপর মহল থেকে অকারণ অযাচিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ করা মহাপাপ, দণ্ডনীয় ও অনৈতিক। ভূমিকম্পের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে সততা, নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে সচেতন মহলকে সংগ্রাম করতে হবে, তা না হলে ভূমিকম্পের আগে বা পরে কখনো পরিণতির সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না। ভূমিকম্প মরণের মতোই অবশ্যম্ভাবী তবে মরণের সঙ্গে সুস্থ প্রতিযোগিতা করা যায় না। যাতে করে ভূমিকম্পের মোকাবেলা করা যেতে পারে সেই অনুসারে কাজ করে যাওয়াই হতে পারে আমাদের এই অসহায় অবস্থার সান্ত্বনা।

[রবিউল হুসাইন। কবি, প্রাবন্ধিক, সংগঠক, স্থপতি।]

বাংলাদেশে ভূমিকম্প: আশংকা ও প্রস্তুতি

জ য় না ল আ বে দী ন

ছোটকালে ভূমিকম্পের কারণ হিসেবে বড়দের কাছে শুনেছি 'পৃথিবী একটি গরুর শিং-এর উপরে থাকে। গরু যখন পৃথিবীর ভার বইতে বইতে ক্লান্ত হয়ে যায়– তখন এক শিং থেকে অন্য শিং-এ স্থানান্তর করে। এই সময় ভূমিকম্প হয়।' এটা হয়তো কোনো রসিক মানুষের কল্পনা।

ভূমিকম্প কী?

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মতে– ভূমিকম্প বলতে প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীর কোনো অংশের মাটি হঠাৎ করে কেঁপে ওঠাকে বোঝায়। আরো ভালো করে বলতে গেলে 'প্রাকৃতিক কারণবশত ভূ-আলোড়নের ফলে ভূপৃষ্ঠের কোনো কোনো অংশে আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী কম্পনের সৃষ্টি হলে তাকে ভূমিকম্প বলে।' ভূমিকম্পের কম্পন প্রচণ্ড বা মৃদু আকারের

হতে পারে। প্রতি বছর গড়ে এ বিশ্বে প্রায় ৬০০০ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এর বেশিরভাগই হয়ে থাকে সমুদ্রের তলদেশে। সমুদ্রের তলের ভূত্বক খুব দুর্বল বিধায় সেখানে ভূমিকম্প বেশি হয়। সমুদ্রের তলদেশে সংঘটিত ভূমিকম্প আমরা টের পাই না। একটি মাঝারি ভূমিকম্প থেকে যে শক্তি নির্গত হয় তা ১৮০ মিলিয়ন মেট্রিক টন টিএনটির (TNT= trinitrotoluone) সমান। অর্থাৎ এই শক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে ফেলা পারমাণবিক বোমার শক্তির প্রায় দশ হাজার গুণ বেশি।

ভূমিকম্পের কারণ

১. ভূ-আলোড়নের ফলে ভূ-ত্বকের কোনো স্থানে শিলা ধসে পড়লে বা শিলাচ্যুতি ঘটলে ভূমিকম্প হয়।

২. ভূ-ত্বক তাপ বিকিরণ করে সঙ্কুচিত হলে ভূ-নিম্নস্থ শিলাস্তরে ভারের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে বহির্ভাগে ও অভ্যন্তরে ফাটল বা ভাঁজের সৃষ্টি হয়। তখন ভূপৃষ্ঠ কেঁপে ওঠে।

৩. পৃথিবীর অভ্যন্তরে অত্যধিক তাপের জন্য উত্তপ্ত বাষ্প ও শিলারাশির চাপ ভূ-ত্বকের নিম্নভাগে ধাক্কা দিলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

৪. আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় উর্ধ্বমুখী উত্তপ্ত বাষ্প ও শিলারাশির চাপে নিকটবর্তী স্থানেও ভূমিকম্প হয়। বর্তমানে পৃথিবীতে ভূমিকম্পের ঘটনা প্রধানত দুটি বলয়ে সীমাবদ্ধ। একটি হিমালয় ও আল্পস পার্বত্য বলয় এবং অপরটি প্রশান্ত মহাসাগরের উভয় তীরস্থ বলয়। আমাদের এই উপ-মহাদেশে যে সকল ভূমিকম্প হয়েছে তার বেশির ভাগই হিমালয় ও তার পাদদেশ এবং গঙ্গা-অববাহিকা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাম্প্রতিক কালে অন্যান্য দেশের মধ্যে আলাস্কা, জাপান, গুয়াতেমালা, ইতালি ও চীনদেশে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে। ১৯৭৬ সালে চীনের ভয়াবহ ভূমিকম্পে প্রায় ৭ লক্ষ লোক নিহত হয়েছিল। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৭.৯। চলতি বছরে চীনে যে ভূমিকম্প হল তাতেও প্রচুর প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গত বছর ৮ অক্টোবর পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ভারতে সংঘটিত ভূমিকম্পেও ব্যাপক জানমালের ক্ষতি হয়। রিখটার স্কেলে এর পরিমাণ ছিল ৭.৬।

বাংলাদেশে ভূমিকম্প

হাজার হাজার বছর ধরে ভূমিকম্প প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে দেখা দিলেও বাংলাদেশে ১৫৪৮ সালে প্রথম রেকর্ডেড ভূমিকম্পের তথ্য জানা যায়। গত ১০০ বছরে বাংলাদেশে শতাধিক ভূমিকম্প হয়েছে। ১৯৬০ সাল থেকে বর্তমান বছর পর্যন্ত এদেশে প্রায় ৭০ টি ছোট-বড় ভূমিকম্প হয়েছে। ২০০৩ সালের দিকে পেশাগত কারণে আমি রাঙ্গামাটিতে ছিলাম। ২০০৩ সালে রাঙ্গামাটিতে যেদিন ভূমিকম্প হয় ঐ দিন তিনবার মৃদু ভূ-কম্পন আমি নিজেই টের পাই। প্রথমবারে লক্ষ্য করি আমার খাট কাঁপছে।

জানালা দিয়ে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখি বাগানের গাছে বসা কাক কা কা করে উড়ে যাচ্ছে।

প্রধান কয়েকটি ভূমিকম্পের তথ্য নিম্নরূপ:

তারিখ	সময়	রিখটার স্কেল	উৎপত্তিস্থল	ক্ষয়ক্ষতি
১৫৪৮	–	–	–	সিলেট ও চট্টগ্রামে ক্ষয়ক্ষতি হয়
১৬৬২	–	–	–	সিলেটে ক্ষয়ক্ষতি হয়
২.৪.১৭৬২	৭.০	চট্টগ্রাম	বাংলাদেশের সর্বত্র। ঢাকা জেলায় মৃত্যু ৫০০। বেশ কয়েকটি দ্বীপ ডুবে যায়। মেঘনা নদীর পানি অনেক উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। সীতাকুণ্ডু পাহাড়ের আগ্নেয়গিরির মুখ খুলে যায়।	
১০.০৪.১৭৭৫	–	–	ঢাকা শহর	ঢাকা শহরের তেজগাঁও-এর বেশকিছু বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
১১.০৫.১৮১২	–	–	–	সারা বাংলাদেশে। সিলেটে ক্ষয়ক্ষতি বেশি।
১৮৬৫	–	–	–	এই বছর দুটি ভূমিকম্প হয়।
১৪.০৭.১৮৮৫	–	–	–	-ঐ
১০.০১.১৮৮৯	–	৭.৫	সিলেট জৈন্তা পাহাড়।	
–	১২.০৬.১৮৯৭	–	৮.৭	শিলং ভারতবর্ষের সবচেয়ে ক্ষতিকর ভূমিকম্প। সিলেটে নিহত ৫৪৫। ময়মনসিংহ, রাজশাহী অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত।
১৮.০৭.১৯১৮	–	৭.৬	শ্রীমঙ্গল	–

১৫.০১.১৯৩০ – ৮.৩ আসাম রংপুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৫.০৮.১৯৫০ – ৮.৪ আসাম আসাম ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা নামে খ্যাত।

২২.১১.১৯৯৭ – ৬.০ চট্টগ্রাম চারতলা বিল্ডিং-এর দেড় তলা নিচে ডেবে যায়। নিহত ৬।

২২.০৭.১৯৯৯ – ৫.২ মহেশখালি কাঁচা ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

২৭.০৭.২০০৩ – ৫.১ রাঙ্গামাটি। –

২৬.১২.২০০৪ – ৭.৩৬ সুমাত্রা বাংলাদেশে নিহত ২। অন্যত্র ৩০,০০০ জন।

পাঁচ

বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা

বাংলাদেশে ভূমিকম্পের বড় ধরনের আশঙ্কা ক্রমেই প্রবল হচ্ছে। গত কয়েক বছরে দেশে ছোট ও মাঝারি অনেক ভূমিকম্প হয়েছে। ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা এগুলোকে বড় ধরনের ভূমিকম্পের পূর্ব লক্ষণ হিসেবে গণ্য করছেন। বাংলাদেশে ভূমিকম্পের আশঙ্কা সম্পর্কে দৈনিক সমকাল পত্রিকায় গত ০৬.১০.২০০৮ তারিখে অনিকা ফারজানা পরিবেশিত এক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ অবজারভেটরি পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ হুমায়ূন আখতার জানান, ছোট ছোট যেসব ভূমিকম্প হচ্ছে এগুলো আসলে বড় ও ভয়াবহ ভূমিকম্পেরই আগাম সংকেত। তাঁর মতে আবহাওয়া অধিদপ্তর ভূকম্পনের মাত্রা পরিমাপেও ভুল করে থাকে। তিনি বলেন, 'চলতি ২০০৮ সালের জানুয়ারিতে ২ বার, মার্চে ১ বার, এপ্রিলে ২ বার, মে মাসে ১ বার, জুলাইতে ৩ বার, আগস্টে ৪ বার এবং সেপ্টেম্বরে ১৩ বার ভূমিকম্প হয়েছে। এসব ভূমিকম্প ছিল রিখটার স্কেলে ২ থেকে ৪.৯ মাত্রার মধ্যে। এগুলোর অধিকাংশের উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ৬৫-৭০ কিলোমিটার দূরে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের কাছাকাছি মধুপুর ফল্টে।' আশঙ্কা করা হচ্ছে, যে কোনো সময় ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের আশপাশে বেশ ভয়াবহ ভূমিকম্প হতে পারে। দৃষ্টান্ত টেনে অধ্যাপক সৈয়দ হুমায়ূন আখতার বলেন, 'আবহাওয়া অধিদপ্তরের রেকর্ড অনুযায়ী গত জুলাই, ২০০৮-এর ভূমিকম্পের রিখটার স্কেলের মাত্রা ছিল ৫.৬ এবং সেটির উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা থেকে ২৩৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব ও উভয় দিকে সিলেটের কাছাকাছি। যদিও একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ অবজারভেটরি ও ভারতীয় ভূমিকম্প পরিমাপ কেন্দ্র ওই ভূ-কম্পনের মাত্রা নির্ণয় করেছিল ৪.৮। যার উৎপত্তিস্থল ছিল ময়মনসিংহের কাছাকাছি।'

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকম্প এবং সুনামি বিশেষজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডা. মাকসুদ কামাল বলেন, 'চট্টগ্রাম, সিলেট ও ঢাকা সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা। সাম্প্রতিককালে পরিচালিত এক প্রাথমিক গবেষণায় দেখা গেছে 'একটি বড় ধরনের ভূ-ফাটল মিয়ানমার থেকে মহেশখালি হয়ে চট্টগ্রামের উপকূল হয়ে ফেনী এরপর আসাম হয়ে ত্রিপুরা পর্যন্ত গেছে। তিনি জানান ১৭৬২ সালে চট্টগ্রাম উপকূলে রিখটার স্কেলে ৭ মাত্রায় ভূমিকম্প হয়েছিল। প্রায় ৩৫০ বছর পর এ ভূ-ফাটল অনেক বেশি শক্তি সঞ্চয় করেছে। ভূ-কম্পনের ইতিহাস উল্লেখ করে তিনি জানান ১৭৭৫ ও ১৮১২ সালে আরো দুটি ভূমিকম্প আঘাত হানে ঢাকায়। আবার ১৮৭৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর এবং ১৮৮৫ সালের ১৪ জুলাই দু'টি ভূমিকম্প ঢাকা শহরে আঘাত হানে। ১৮৯৭ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্প ঢাকা শহরের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। সাম্প্রতিককালে চট্টগ্রাম এলাকায়ও বেশ কয়েক দফা ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে।

ছয়

প্রস্তুতি

পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারিং জিওলজি এ্যান্ড ন্যাচারাল হ্যাজার্ড অ্যাসেসমেন্টের ডেপুটি ডাইরেক্টর এবং ব্রাঞ্চ চিফ রেশাদ মো. একরাম আলী জানান, ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগ ঘটে গেলে সরকার কিছুই করতে পারবে না। এমনকি উদ্ধারকাজও চালাতে পারবে না। কেননা রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের তেমন কোনো প্রস্তুতিই নেই। তবে কিছুটা আশার কথা এই যে, ইউরোপীয়ান কমিশন, ইএফআইডি এবং ইউএনডিপির অর্থায়নে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এছাড়া মহানগর এলাকার ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমাতে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কমপ্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের (সিডিএমপি) আওতায় একটি কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে।

পাশাপাশি সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ ঢাকা মহানগরীতে ভূমিকম্পনের ঝুঁকি কমাতে পরিকল্পনা তৈরি করেছে বলে জানা গেছে। তিনি বলেন, 'ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবেলায় কাজ করছে সিডিএমপি। ঢাকা মহানগরসহ ঝুঁকিপূর্ণ শহরগুলোকে বাঁচাতে কর্মসূচি নেয়া হয়েছে।'

ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেহেদি আহমেদ আনসারী বসতির ধরন পর্যালোচনা করে বলেন, 'অপরিকল্পিত বাড়িঘর নির্মাণ ও ঘনবসতির কারণে ঢাকা শহর ভূমিকম্পের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ২০ টি শহরের তালিকায় ঢাকা শহর রয়েছে। এখানকার ৬৫ শতাংশ ঘরবাড়ি প্রকৌশল পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধান ছাড়াই নির্মিত। ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসরণ করা হচ্ছে না। একদিকে অপরিকল্পিত নগরায়ণ, অন্যদিকে ব্যাপকহারে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে ঢাকার অনেক এলাকা দেবে যেতে পারে। পাশাপাশি ঢাকার বিভিন্ন অংশে

নিঃশব্দ ভূ-আলোড়ন সক্রিয় রয়েছে। কাজেই ভূমিকম্প-ঝুঁকি কমাতে প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থার ওপর নজর দিতে হবে।'

তিনি বলেন, 'বাড়িঘর নির্মাণে প্রকৌশলীদের দিয়ে নকশা তৈরি করাতে হবে। নকশায় ডিজাইনকারীর স্বাক্ষর থাকতে হবে। সমস্যা হলে যেন তাকে দায়ী করা যায়। বাড়ি নির্মাণের সময় বিল্ডিং কোড অনুসরণ করতে হবে। এদেশের টালির ছাদ বা স্লাব ছাড়া ছাদের বাড়ি, লিনটেনবিহীন বাড়িগুলো ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সমূহ এই ভয়ঙ্কর পরিণাম এড়াতে জরুরিভিত্তিতে ভূমিকম্পরোধক নির্মাণপদ্ধতিকে উৎসাহিত করতে হবে।'

পরিশেষে বলতে চাই যদি অকস্মাৎ বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়– তাহলে প্রাণরক্ষায় তাৎক্ষণিকভাবে কী করা প্রয়োজন তা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে বেশি বেশি করে প্রচার করতে হবে– যাতে মানুষ ভূমিকম্প বিষয়ে জানতে আরও আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং সারাদেশের মানুষ যতটা সম্ভব দ্রুত সচেতন হতে পারে।

সূত্র :১. শিশু বিশ্বকোষ, ২. দৈনিক সংবাদ, ৩. দৈনিক সমকাল, ৪. অন্যান্য

[জয়নাল আবেদীন মুক্তিযোদ্ধা। প্রাবন্ধিক। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।]

ভূমিকম্প এবং আমরা

ফে র দৌ সী সু ল তা না

মাসটা ছিল সেপ্টেম্বর নাকি অক্টোবর ঠিক মনে নেই সন্ধেবেলা আমি আর আমার বড় ছেলে ফাহিম (১৪) শুয়ে শুয়ে টিভি দেখছিলাম। হঠাৎ খাটটা নড়ে উঠলাা। একটু যেন জোরেই ঝাঁকি খেলাম। আমি অবাক হয়ে ফাহিমকে দেখলাম। ওর শরীরে হাত রাখলাম। আমার চোখে বিস্ময়। ফাহিম এত শক্তি কোত্থেকে অর্জন করল? এত বিশাল খাট নাড়িয়ে দিল! আমাদের মাস্টার বেডটা একটু বড়ই। ডাবল বেড-এর চেয়েও বড়। দুই ছেলে আর আমরা দুজন যেন একসাথে হাত-পা নেড়ে ঘুমুতে পারি সেজন্যই

এই খাট বানানো হয়েছিল বেশ মজবুত করে। বক্স খাট। ফ্লোর থেকে মাত্র বারো ইঞ্চি উপরে যেন বাচ্চারা ফ্লোরে পড়ে গেলেও ব্যথা কম পায় তাই এই ব্যবস্থা।

যাহোক, আমার চোখে চোখ রেখে ফাহিমও অবাক। সে শুধু বলল, আম্মু ভূমিকম্প নাকি? আমার ঘোর কাটল! হ্যাঁ! হ্যাঁ তাই হবে হয়তো।

ছোট ছেলে গালিব (১২)-এর স্বভাব সময় পেলেই হাঁটাহাঁটি করার। সে খাটের ওপর হোক, বিছানার ওপর হোক, টেলিভিশন দেখার ফাঁকে হোক, পায়চারি করতে থাকে। যথারীতি এসময় সে পায়চারি করছিল তাই টের পায়নি। আর আমার হাজবেন্ড আনিস কী কাজে যেন মগ্ন ছিল, সে-ও অনুভব করেনি।

ফাহিম উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, গালিব ভূমিকম্প হয়েছে এইমাত্র, টের পেয়েছ? গালিব আকাশ থেকে পড়ল। কই যা-আ-আ। ও খালি মিথ্যে কথা বলে। ফাহিমের উত্তেজনা কমে না। সোৎসাহে ফাহিম বলে, হ্যাঁ, সত্যি। আমাকে বিশ্বাস না হলে আম্মুকে জিজ্ঞেস করো। আমাদের কোলাহল শুনে আনিসও বের হয়ে আসে। সে-ও অবাক। কই টের পাইনি তো। তোমরা দুই বোকা কিসে থেকে কী দেখেছ কে জানে! ভূমিকম্প ভূমিকম্প বলে তোমরা চিৎকার করছ আর আমি আর বাবা টের পেলাম না। তাছাড়া ভূমিকম্প হলে লোকজনের হৈ চৈ শুরু হয়ে যেত না এতক্ষণে? ওর কথার তোড়ে আমরা মা-ছেলে বোকা বনে গেলাম।

টিভি তো চলছিলই। মনিটরে ব্রেকিং নিউজ চলে এল। কিছুক্ষণ আগে ঢাকা ও এর আশপাশে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ৫। এখনো দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ভূমিকম্পের খবর আসছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমান তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। আমরা দেখলাম। এসময় ফোন বেজে উঠল। ধরলাম। নেত্রকোণা থেকে ফোন। ওপাশে আমার ভাবী উত্তেজিত স্বরে ভূমিকম্পের খবর দিচ্ছে। কে টের পেয়েছে কে পায়নি তা সবিস্তারে বর্ণনা করছে। এ-ই, এ-ই হল ভূমিকম্প সম্পর্কে আমাদের ধারণা। যেন আমাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে খানিকটা তরঙ্গ।

ঢাকাতে ভূমিকম্প নিয়ে বিশাল বিশাল সেমিনার হয়। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ তাদের মতামত রাখেন। আমরা খবরের কাগজে তাদের ফটোসহ খবর পড়ি। কিন্তু সে সব খবর থাকে অত্যন্ত কম। এগুলো আমাদের মনের চাহিদাকে সর্বাংশে পূরণ করে না। এবং আমাদের আশ্বস্ত করে না। কারণ ভূমিকম্পের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, এর ধ্বংসযজ্ঞ আর ভয়াবহতার সাথে এটিকে প্রতিরোধের, এটি থেকে রক্ষা পাবার, মোকাবেলা করার যে আয়োজনের অপ্রতুলতার কথা বলা হয় তা আমাদের আরো হতাশ করে। এই বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ যদি ঘটেই যায় আমরা কেউ বাঁচব না তা সহজেই অনুমেয়। এজন্য এই বিষয়টিতে ঢুকতে চাই না আমরা, সরকারি উদ্যোগের অপ্রতুলতা, উদাসীনতা বা দৈন্যতা আমাদের মনটাকে আরো বিষণ্ন করে তোলে।

তাই ব্যাপকভাবে, ইতিবাচকভাবে গণ-সচেতনতা তৈরি হয় না। ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমরা ছোট-খাট প্রতিরোধ-প্রতিকারের কথা ভাবি না। আর তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এসব ভাবনা ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্বও তো কেউ নিই না।

সেদিন উঠল ভূমিকম্প প্রসঙ্গ। আমি দু'ছেলেকেই জিজ্ঞেস করলাম, এখন যদি ভূমিকম্প হয় কী করবে?

ফাহিম নির্বিকারভাবে বলল, চুপচাপ বসে থাকব। কেন? ফাহিম বলল, তো কী করব? একটু পর তো থেমেই যাবে। আর যদি জোরে হয় কোথাও যাওয়ার আগেই তো হুড়মুড় করে মাথার ওপর ভেঙে পড়বে বাড়িটা। তার চাইতে বসে থাকাই তো ভালো। গালিব হঠাৎ বলে উঠল, কেন ভাইয়া, আমরা সবাই টেবিলের তলায় ঢুকে যাব! তাহলে আর ছাদ ভাঙলেও আমাদের মাথায় পড়বে না।

আমি চমৎকৃত হলাম। ঠিকই তো! আমরা প্রক্রিয়া জানা থাকলে স্বল্পতম সময়েও এভাবেই নিরাপদ হতে পারি। আমি গালিবকে ওর বুদ্ধির জন্য প্রশংসা করলাম।

বললাম, আচ্ছা ধরো স্কুলে যদি এরকম হয়? তো তখন কী করবে? এবার দু'ভাই-ই চটপট বলল, টিচারের টেবিলের তলায় গিয়ে লুকাব।

আমি বললাম, ক্লাশে তো স্টুডেন্ট অনেক। এতজন ধরবে কি টিচারের টেবিলের নিচে? টিচারের তো ছোট্ট একটা টেবিল। ওরা বলল, আম্মু সবাই তো জানে না বলে দৌড়ে নিচে নামবে। মাঠে-

আমি শিউরে উঠলাম। পাচঁ তলা ভবনের সব বাচ্চা ঐ সিঁড়ি দিয়ে একযোগে নামার চেষ্টা করলে কী ঘটতে পারে। পায়ের চাপে পিষ্ট হবে অনেকে, যারা নামবে চাপা পড়বে নিজেদের স্কুল ভবনের নিচেই, করিডোরে, সিড়িতে, ক্লাসে– কী ভয়ানক অবস্থা হবে! ভাবতে পারা যায়?

আমি দেখেছি এসব স্কুলগুলো অধিকাংশ দুর্বল ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কাজেই অতি অল্পতেই দুর্ঘটনা ঘটা বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু যদি এমন হয়, বাচ্চারা নিজ নিজ ডেস্কের নিচে ঢুকে যায়, তবে হয়তো রক্ষা পাবে তারা। কিন্তু স্কুলে তো এসব শেখাতে হবে বাচ্চাদের। ভূমিকম্পের সময় কী রকম আচরণ করতে হবে, কিভাবে নিজেদের রক্ষা করতে হবে, এসব তো কিছুই শেখানো হয় না। পরিবারে এবং স্কুল-কলেজে যদি বাচ্চাদের এসব বিষয়ে জ্ঞান দেয়া হয় তবে প্রাণহানির আশংকা অনেক কমে যাবে। আমরা কি স্কুল-কলেজে ভূমিকম্পের ওপর বাচ্চাদের সচেতন করার জন্য ভূমিকম্প বিষয়ক কোনো সিলেবাস অর্ন্তভুক্ত করতে পারিনা? বিষয়টা কিন্তু খুব কঠিন কিছু নয়। একটি সিদ্ধান্তের ব্যাপার মাত্র।

শুনেছি চীন ও জাপানে ভূমিকম্প থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘর-বাড়িগুলো বর্তমানে এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন ভূকম্পনে তা ক্ষতিগ্রস্ত কম হয়। বাড়িঘরের ভারি আসবাবপত্র ওয়ালের পাশে সেট করে আংটা দিয়ে আটকে দেয়া হয় যাতে ভূকম্পনে তা মানুষের গায়ের ওপর পড়ে বিপদ ঘটাতে না পারে। আর উপরে কোনো তাকে মালপত্র রাখলে সেগুলোও আংটা দিয়ে আটকে রাখা হয়। এই কাজগুলো তো আমরাও করতে পারি। খুব কঠিন কাজ তো নয়! দরকার শুধু সচেতনতা। কারণ ভূমিকম্প কিন্তু ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের মতো আগাম কোনো আভাস দেয় না। এটা মুহূর্তেই ঘটে যায়। আর এরকম সময়ে বাড়িঘর ধ্বসে না পড়লেও যদি শরীরের ওপর ধমাধম

ফ্রিজ, ওয়াড্রোব, আলমারি কাত হয়ে পড়ে তাহলেও কিন্তু প্রাণহানি বা পঙ্গুত্ববরণ করা আশ্চর্যের কিছু হবে না।

তাই শুধু সেমিনার সিম্পোজিয়াম নয়, সাথে সাথে প্রয়োজন গণসচেতনতাও। এর জন্য চাই ব্যক্তিপর্যায়ের উদ্যোগএবং পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা। ছোট ছোট এসব উদ্যোগ প্রয়োজনে প্রাণরক্ষায় বিশাল ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই রয়েছে স্কুল-কলেজগামী ছেলেমেয়ে। যদি বাড়ির পড়ার টেবিল মজবুত এবং একটু বড়সড় বানানো হয় তাহলে প্রয়োজনে এগুলো হবে প্রাণরক্ষার প্রধান অবলম্বন।

আর খোলা মাঠে যাওয়ার সময় যারা পেয়ে যাবেন তারা তো সেখানে যাবেনই। আমাদের এই অট্টালিকা-সমৃদ্ধ ঢাকা নগরীর হাই রাইজবিল্ডিং-এর যারা বাসিন্দা তারা কী করবেন। লিফট তো ব্যবহার করা যাবেন না। নিচে নেমে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব বলে সিঁড়ি ব্যবহার করা যেতে পারে। আর যদি একেবারেই সময় না পাওয়া যায় বিল্ডিং-এর পিলার ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এই জায়গাটি মোটামুটি মজবুত। এই কথাগুলো আমাদের বুঝতে হবে। খুব সহজ করে । আমরা যেন সববয়সী মানুষই বিষয়টি বুঝতে পারি– ভূমিকম্পের সময় কোন অবস্থায় কী করতে হবে। তাহলে ধ্বংসযজ্ঞ হলেও প্রাণহানি কম হবে।

[ফেরদৌসী সুলতানা। লেখক, আইনজ্ঞ, সমাজসেবক ও ব্যাংক কর্মকর্তা।]

ভূমিকম্প : ধ্বংসে ও বিনির্মানে

রু শো তা হে র

ভূকম্পনে ধ্বসে পড়তে পারে ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, এমনকি প্রস্তরময় পাহাড়ও। ফাটল ধরতে পারে ভূ-ত্বকে, সৃষ্টি হতে পারে হ্রদ, সাগর, পাহাড় এমনকি ভাঁজ পড়তে পারে পৃথিবীপৃষ্ঠে। ভূমিকম্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে ভাঙচুর, ধ্বংস, জলোচ্ছ্বাস ও অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে, সেইসঙ্গে অসংখ্য মানুষের মধ্যে নেমে আসতে পারে আতঙ্ক, দুর্ভোগ ও মৃত্যু। বস্তুত ভূ-তাত্ত্বিকদের মতে, ভূমিকম্প প্রকৃতির এক স্বাভাবিক ঘটনা।

এর প্রভাবে আমাদের সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়, অবিচল ও দৃঢ় স্থায়ী ঠিকানা ভূ-পৃষ্ঠও পরিণত হয় মৃত্যুফাঁদে। তখন মানুষের মাথাগোঁজার সর্বশেষ ঠাঁইটুকুও যেন বিশ্বাসঘাতকতা করে। কিন্তু এরপরও বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্প নিয়ে নিষ্ঠুর রসিকতা করেন। আর তাই তো ভূমিকম্পের পূর্বাভাস প্রদান নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি বিজ্ঞানীরা এর ফলে প্রকৃতির ইতিবাচক ইফেক্ট সম্পর্কেও চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করেছেন ইতোমধ্যে। তাই এ প্রশ্নটি খুব বড় করে আসছে যে ভূমিকম্প কি শুধুই অভিশাপ? ভূমিকম্পের কি কোনো উপযোগিতা নেই!

বছরে বিশ থেকে ত্রিশটি বড় ধরনের ভূমিকম্প পৃথিবীকে আলোড়িত করে। সৌভাগ্যবশত, এগুলো ঘটে জনবিরল পার্বত্য এলাকায় এবং গভীর মহাসমুদ্রে। তবে গত তিন শতাব্দী ধরে গড়ে এক, দুই বা তিন বছরে অন্তত একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হচ্ছে জনবহুল এলাকায়। অন্যদিকে সবচাইতে মৃদু ভূকম্পনগুলো হিসেবে আনলে, এ সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় দশ লক্ষে। ভূমিকম্পের প্রধান কারণরূপে ভূগাঠনিক বা টেকটোনিক প্রক্রিয়া দায়ী বলে ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূমিকম্প-বিজ্ঞানীরা বলেন। যদিও আরও নানা প্রাকৃতিক কারণেও ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। আর কৃত্রিম ভূমিকম্পের বিষয়টি তো আছেই। যাহোক, এখানে আমি কৃত্রিম ভূমিকম্প ও ভূমিকম্পের সঙ্গে ফসিল সম্পদের সম্পর্কের ওপরও খানিকটা আলোচনার চেষ্টা করব।

১৯৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী একটি গভীর কূপে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বর্জন করেছিল। কিছু সময় পরে নিকটবর্তী এলাকায় ভূকম্পন পরিলক্ষিত হয়। এর জের হিসেবে সাত বছর ব্যাপী এক হাজার ছয়শতবার ভূকম্পন ধরা পড়েছে। এ থেকে বিজ্ঞানীরা একমত হন যে, গভীর কূপে তরল পদার্থ ইনজেক্ট করলে ভূকম্পন ঘটতে পারে। তেলকূপে তরল পদার্থ অনুপ্রবেশ করানোর ফলে একইভাবে ভূমিকম্প ঘটতে দেখা গেছে। ভূ-গর্ভে বড় ধরনের পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটালে বড় ধরনের ভূমিকম্প ঘটতে পারে। বস্তুত বিজ্ঞানের কোনো ধরনের গবেষণায় একটা দুঃখজনক দিক হল এর ধ্বংসাত্মক ব্যবহার। এক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটে নি। মানে কোনো কোনো দেশ তাদের সামরিক একাডেমিতে কৃত্রিম ভূমিকম্পের প্রয়োগে ধ্বংসযজ্ঞতায় পারদর্শিতা প্রদর্শনের এক অশুভ কৌশল শেখানোর খেলায় মেতে উঠেছে। কত সূক্ষ্ম ও নিখুঁতভাবে প্রতিপক্ষের সেনাছাউনি ও সেন্ট্রাল কমান্ড মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া যায়, তার ওপর মিলিটারি একাডেমির গবেষকরা কাজ করছেন। গবেষকদের মতে, প্রতিপক্ষের কৌশলগত নিকটবর্তী এলাকার ভূ-গভীরে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটালে সেখানে ভূমিকম্প দেখা দেবে। বিস্ফোরিত পারমাণবিক বোমার শক্তির ওপর নির্ভর করবে সৃষ্ট ভূমিকম্পের তীব্রতা কত বেশি হবে। যুদ্ধকৌশলে কৃত্রিম ভূমিকম্পের নীতিকে সাফল্যজনকভাবে রপ্ত করার ভেতর দিয়ে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করার এক বীভৎস আশংকা দেখা দিয়েছে পৃথিবীতে।

পৃথিবী আজ প্রায় পুরোপুরিভাবে জীবাশ্ম সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে আবার, সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানী বা ফসিল ফুয়েল। যে দেশের ভূ-গর্ভে যতবেশি খনিজ সম্পদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে, সেদেশ ততবেশি গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও জীবাশ্ম জ্বালানীর বিকল্প হিসেবে পারমাণবিক ও সৌর জ্বালানী ব্যবহার অনেক বেশি সুবিধাজনক। এরমধ্যে পারমাণবিক শক্তিকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা যাবে অনন্তকাল। কিন্তু পারমাণবিক শক্তির যুদ্ধ-সংশ্লিষ্টতার ভয়াবহতার ওপর বিশ্বমানবতা কর্তৃত্ব করতে পারছে না বিধায় কোনো দেশ চাইলেও এ মুহূর্তে পারমাণবিক শক্তিকে শান্তিপূর্ণ কোনো কাজে ব্যবহারের গবেষণা করতে পারবে না।

জীবাশ্ম জ্বালানীর ওপর নির্ভরতার কোনো বিকল্প নেই মানবসভ্যতার সামনে। ফলে 'ভূমিকম্প : ধ্বংসে ও বিনির্মাণে' শীর্ষক লেখায় পারমাণবিক শক্তি ও জীবাশ্ম জ্বালানী নিয়ে আলোচনা কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও বস্তুত ভূ-গভীরে খনিজসম্পদ সৃষ্টির সঙ্গে ভূমিকম্পের সম্পর্ক রয়েছে। সেদিক থেকে পারমাণবিক শক্তির সঙ্গে জীবাশ্ম জ্বালানীর তুলনামূলক আলোচনা যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। ভূ-গর্ভে খনিজ সম্পদের বিশাল মজুদ এল কোত্থেকে, তা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হন ভূমিকম্প নিয়ে চুলচেরা গবেষণা করতে গিয়েই।

উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে সিসমোলজিস্ট বা ভূকম্পনবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী, ভূগোলজ্ঞ, খনিজবিজ্ঞানী– এরা সবাই যৌথভাবে কাজ করছেন। বস্তুত ভূমিকম্পের তাৎক্ষণিক তাণ্ডবে উদ্ভিদ ও প্রাণীসহ যে নগর, বন্দর ও বিস্তীর্ণ জনপদ ভূ-তলে হারিয়ে যায়, তা লক্ষ-লক্ষ বছর ভূ-গর্ভে ন্যাচারাল প্রসেসিং-এর ভেতর দিয়ে খনিজসম্পদে পরিণত হয়। প্রকৃতির এই খেলা বেশি জমে সমুদ্রে। কারণ, সমুদ্রেই সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, যা আগেই উল্লেখ করেছি। উল্লেখ্য, পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী ও উদ্ভিদের শতকরা ২০ ভাগ মাত্র স্থলে বাস করে। বাকি ৮০ ভাগ জলে। তাই সমুদ্রের ভূমিকম্পের ফলে বেশিসংখ্যক প্রাণী ও উদ্ভিদ ন্যাচারাল প্রসেসিং-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কালের বিবর্তনে এসব উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ সম্পদের অশেষ উৎসে পরিণত হয়। এজন্য সমুদ্রবিজ্ঞানীরা প্রাথমিক তাত্ত্বিক গবেষণার ভিত্তিতে অনুমান করছেন, পৃথিবীর খনিজ সম্পদের প্রায় পুরোটাই মজুদ আছে সমুদ্রে। উল্লেখ্য, বিশাল সেই সম্পদের মজুদে মানুষ এখনও হাত দিতে পারেনি। এদিকে ভূ-তাত্ত্বিক যে কোনো পরিবর্তনে অনেক জলভাগ স্থলভাগে পরিণত হয়ে যায়। ফলে জলভাগের ভূগর্ভে সঞ্চিত বিশাল খনিজসম্পদও সেই স্থলভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মধ্যপ্রাচ্য এত খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার কারণ এখানেই নিহিত। প্রাচীনকালে এ এলাকা ছিল আরবসাগর। কালের বিবর্তনে তা পরিণত হয় স্থলভাগে। সে স্থলভাগ সমুদ্র ভূ-গর্ভে থাকা অবস্থায় সৃষ্ট খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে যায় প্রাকৃতিকভাবে। আবার মধ্যপ্রাচ্য খনিজসম্পদে তেলের পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণ মধ্যপ্রাচ্যে পরিণত হওয়া এক সময়ের আরবসাগরের সেই তলানীর বয়স অনেক অনেক বেশি বলে। কিন্তু বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তলানীর বয়স অনেক কম বিধায় সেখানে তেল নয়, বরং গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনাই বেশি। কাজেই যে-কোনো দেশে খনিজসম্পদের বিশাল মজুদের কারণ তাই ভূমিকম্পে ধ্বংস ও বিনির্মাণ প্রক্রিয়া। এ কারণটি বস্তুগত। এখানে কোনো অলৌকিক কারসাজি নেই।

রাজধানী ঢাকা ভূমিকম্প বলয়ে অবস্থিত। এদিকে ঢাকার রাস্তাঘাট ও বাড়িঘর ভূমিকম্পের বিবেচনায় মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এতে করে, ভূমিকম্পের তাৎক্ষণিক অভিঘাতের চাইতেও ভূমিকম্প-পরবর্তী উদ্ধার সম্ভব হবে না বলে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা অনেক বেশি হবে। অধিকন্তু, ভূমিকম্পের পূর্বাভাসে ব্যর্থতা হেতু মৃত্যুর সংখ্যা হবে সর্বাধিক। ভূমিকম্পের তীব্রতা যদি রেকর্ড অতিক্রম করে, তবে ঢাকার দেড় কোটি লোকের মাত্র সামান্য সংখ্যককে বাঁচানোও হবে কাকতাল ঘটনা। সেক্ষেত্রে বিশাল সংখ্যক মানুষ ভূ-গর্ভে স্রেফ হারিয়ে যাবে। ফলে, জৈব উপাদান হিসেবে এসব মানুষের ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহ ন্যাচারাল প্রসেসিং-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কালের বিবর্তনে দূর ভবিষ্যতে এখানকার ভূ-গর্ভ হবে বিচিত্র খনিজসম্পদের বিশাল মজুদ। এটি সভ্যতার নির্মম পরিণতি নিয়ে নিষ্ঠুর রসিকতা নয়, বরং ভূমিকম্পের মধ্য দিয়ে ধ্বংস ও বিনির্মাণের ক্রমাগত ও অনিবার্য এক প্রাকৃতিক খেলা।

[রুশো তাহের, বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক। বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত।]

ভূমিকম্প: ঝুঁকি ও মাটির বাড়ি

মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম

বাংলাদেশের মতো নিম্ন আয়ের দেশে গৃহনির্মাণের উপকরণ হিসেবে মাটি অনেক প্রাচীনকাল (২০০ বছরেরও বেশি) হতেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মাটির এই বহুল ব্যবহারের মূল কারণ এর সহজলভ্যতা, কম খরচ, সহজ নির্মাণকৌশল, কম শক্তি খরচ এবং পরিবেশ বান্ধবতা। কিন্তু বৃষ্টিপাত, বন্যা কিংবা ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাটির প্রতিরোধক্ষমতা অত্যন্ত কম হওয়ায় নির্মাণ উপকরণ হিসেবে মাটির ব্যবহার অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। কেননা অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী যেমন ইট, বালু, সিমেন্টের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় সেগুলো মাটির বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ-ধরনের নির্মাণ উপকরণের উচ্চমূল্য এবং উৎপাদন ধাপ থেকে শুরু করে সর্বশেষ ধাপ পর্যন্ত পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ইত্যাদি কারণে মাটির বাড়ির গ্রহণযোগ্যতা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেখা গেছে যে মাটির বাড়ি যদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে

ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাহলে তা ৪০-৫০ বছর পর্যন্ত সহজেই টিকে থাকতে পারে। তাই মাটির ঘরকে ভূমিকম্প-প্রতিরোধী এবং পানিরোধী করার জন্য বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজ হয়েছে ও চলছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০০৩ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায় মোট জনসংখ্যার ৭৩% লোক বাস করে কাঁচা বাড়িতে যার মাঝে অধিকাংশ হল মাটির বাড়ি। তাই আবাসন সমস্যার সমাধানের জন্য মাটির বাড়ির গঠনগত মান উন্নয়ন জরুরি প্রয়োজন।

যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাটির ঘর নির্মাণে মাটির সাথে বিভিন্ন natural ভরনৎব ব্যবহার চলে আসছে। এই ভরনৎব reinforcement মাটির বাড়িকে ভূমিকম্প এবং পানিরোধী করতে ভূমিকা রাখে। তাই এই নিবন্ধে স্থানীয়, সস্তা, সহজলভ্য এবং সহজে নির্মাণ করা যায় এমন উপকরণ ব্যবহার করে মাটির ঘরের ভূমিকম্প এবং পানিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে মাটির বাড়িগুলো মূলত সমতল জায়গায় অবস্থিত। বাড়িগুলো প্রধানত একতলা; কখনো কখনো দুইতলা বাড়িও গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়। বাড়িগুলোর ছাদ খড়, সি.জি.আই.শিট, গোলপাতার তৈরি হয়। বাড়ির মেঝে ভূমি থেকে ১.০–১.৫ ফুট উঁচু হয়। ঘরের দেওয়ালগুলো gravity load বহন করে এবং তা মাটিতে transfer করে। তবে partial load (ভূমিকম্পের ফলে) transfer করার জন্য কোনো structural system ঘরগুলোতে নেই। দেওয়ালগুলো মাটির ভেতরে ১.০-১.৫ ফুট পর্যন্ত ঢুকানো থাকে।

বাংলাদেশে মাটির বাড়ির মূল সমস্যাগুলো হল:

বৃষ্টিপাত এবং বন্যাজনিত সমস্যা

ভেজা দেয়াল যার দরুন মাটির ক্ষয় হয় এবং এর গায়ে ফাংগাসের আক্রমণ হয়।

ফাটল

যে মাটি দিয়ে ঘর তৈরি করা হয় তাতে অধিক পরিমাণে কাদামাটির উপস্থিতির কারণে দেয়ালে ফাটল সৃষ্টি হয় যাতে ঘরের সৌন্দর্যহানি ঘটে।

ভূমিকম্পজনিত সমস্যা

বাংলাদেশ একটি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। ভূমিকম্পে মাটির বাড়ির অনেক ক্ষতি হয়। বিভিন্ন ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি থেকে মাটির বাড়ির ভাঙনের ৩ টি প্রধান কারণ চিহ্নিত করা যায়:

ক. ঘরের কোণে এবং দুইটি দেয়ালের সংযোগে ফাটল। মাটির duity অনেক কম। তাই yielding একবার শুরু হলে যে ফাটল সৃষ্টি হয় তা কেবল বাড়তেই থাকে।

খ. মাটির ব্লকগুলোর মধ্যে যে mortar ব্যবহার করা হয় তা অত্যন্ত নিম্নমানের।

তাই মাঝারি আকারের ভূমিকম্পের ফলেই ব্লকগুলোর জোড়া আংশিক বা পুরোপুরি খুলে যায়। মাঝেমাঝে দেয়ালগুলোর মাঝের জোড়াও খুলে যায় এবং দেয়ালগুলো out-of-plane -এ ভেঙে পড়ে।

গ.ভূমিকম্পে মাটির বাড়ির দুর্বলতার আরেকটি প্রধান কারণ হচ্ছে এর ভর অত্যধিক বেশি। কেননা ভর যত বেশি হয় ভূমিকম্প দ্বারা প্রযুক্ত বলও তত বেশি হয়।

এখানে বর্ণিত সমস্যাগুলোর সমাধানের লক্ষ্যে নানান ধরনের পদ্ধতি আলোচনা করা হল:

বৃষ্টিপাত এবং বন্যাজনিত সমস্যার সমাধান

এক্ষেত্রে বাড়ির গঠনগত উন্নয়ন ও পরিবর্তন, যেমন ভালো foundation দিয়ে উঁচু জায়গায় বাড়ি করা, ঘরের ছাদের প্রান্ত দেয়াল থেকে বেশ খানিকটা দূরে রাখা, দেয়ালে protective coating ব্যবহার করা, এর সাথে সাথে মাটির গঠনগত উন্নয়নও প্রয়োজন। ঘর বানানোর জন্য মাটি তৈরি করা, এর স্থায়িত্ব এবং কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য alker technology ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে কাদামাটির সাথে (৮% ক্লে) জিপসাম মিশিয়ে মাটির ভারগ্রহণ ক্ষমতা বাড়ানো হয় এবং মাটি খুব জলদি শক্ত হতে শুরু করে।

ফাটলজনিত সমস্যার সমাধান

ব্যবহৃত মাটিতে যদি কাদামাটির পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে মাটি শুকানোর সময় কিংবা তাপমাত্রা পরিবর্তনের **সাথে সাথে** ফাটল দেখা দেয়। এক্ষেত্রে মাটির সাথে যদি প্রাকৃতিক আঁশ যেমন ধানের খড় ব্যবহার করা হয় তাহলে মাটির সবজায়গায় তা সমানভাবে শুকাতে সাহায্য করে, shrinkage কমায় এবং মোটের ওপর ফাটল রোধ করে। ধানের খড় মাটির সাথে মেশানোর সময় তা ছোট ছোট টুকরো করে কাটা হয়; খড়ের টুকরো বড় হলে bond stress develop করে, এতে shrinkage আরেকটু কমে।

ভূমিকম্পজনিত সমস্যার সমাধান

মাটির বাড়ির কোণে ভাঙন, দেয়াল বেঁকে যাওয়া, দেয়ালের জোড়া খুলে যাওয়া কিংবা out-of-plane-এ ভেঙে যাওয়া রোধ করার কংক্রিট বীম, স্টিল রড– এ-জাতীয় ব্যয়বহুল সমাধান রয়েছে। কিন্তু এগুলো ব্যবহার করার সামর্থ্য বাংলাদেশের কম আয়ের মানুষের নেই। ধানের খড় কিংবা পাটের আঁশ এক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী সমাধান। মাটির সাথে খড় মেশালে তা মাটির ductility বাড়ায়; যদিও মাটির compressive strength কমে যায়। তা রোধ করার জন্য carbide lime মেশানো যায়।

গবেষণা থেকে বলা যায় ২% খড়ের সাথে ৫% carbide lime মেশালে তা সবধরনের মাটির জন্যই কার্যকরী। মাটিতে মিশ্রিত খড়ের পরিমাণ বেশি হলে তাতে গভীর ফাটল দেখা যায় এবং strengthI কমে যায়। তাই গবেষণায় মাটিকে ভূমিকম্প-রোধী করার জন্য পাটের আঁশের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভঙ্গুর মাটির strength বাড়ানোর জন্য এটি সবচেয়ে ভালো সমাধান। এটি মাটির ductility এবং toughness বাড়ায়। এক্ষেত্রে আঁশের দৈর্ঘ্য ২-৩ সে.মি.-এর মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। আঁশগুলোর উচ্চ ঘর্ষণক্ষমতা এবং এদের মাঝে ফাঁক না থাকাই এদের অধিক কার্যকারিতার কারণ বলে মনে করা হয়। আবার মাটির ব্লক এবং মর্টারের মধ্যে bonding বাড়ানোর জন্যও পাটের আঁশ খুব উপকারী। তাই বর্তমানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং পরিবেশের কথা চিন্তা করে বলা যায় যে স্থানীয় উপকরণ যথা– পাটের আঁশ, ধানের খড় ইত্যাদির তৈরি মাটির বাড়ি হতে পারে ভূমিকম্প ঝুঁকিতে গৃহসংকট সমস্যার অত্যন্ত যুগোপযোগী সমাধান।

[ড. মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম সহযোগী অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)]

ভূমিকম্পের সময়
আমাদের করণীয়

এ ক টি জ ন স চে ত ন তা বৃ দ্ধি ও সে বা মূ ল ক উ দ্যো গ

প্রথম প্রকাশ
১৫ সেপ্টেম্বর ২০১০

পরামর্শক
জামিলুর রেজা চৌধুরী
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট
প্রাক্তন ভিসি, ব্রাক ইউনিভার্সিটি ও
সভাপতি বাংলাদেশ ভূমিকম্প সোসাইটি

সম্পাদক
শওকত হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
শরমিন নিশাত

প্রকাশনায়
হালখাতা
বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা
বাড়ি: ৩/সি, রাস্তা: ১৩/২, ৩য় তলা
পশ্চিম ধানমণ্ডি, জিগাতলা, ঢাকা- ১২০৯
মোবাইল: ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৫৫৩৫৩৫৫০৬
ই- মেইল: halkhata@yahoo.com

সহযোগিতায়
এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড

তথ্যের উৎস
হালখাতা'র 'বাংলাদেশে ভূমিকম্প' সংখ্যায় প্রকাশিত
মো. জাহাঙ্গীর আলম, অধ্যাপক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, চুয়েট ও
তাহমীদ এম. আল-হুসাইনী, অধ্যাপক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট
-এর রচনা থেকে গৃহীত।

দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য একটি সেবামূলক উদ্যোগ
প্রচারে: বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতা' ও এনসিসি ব্যাংক লি.

ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় সবসময় নিচের নির্দেশাবলী মেনে চলুন:

১. আপনি যে বিল্ডিং অথবা বাসায় বসবাসরত আছেন তা ভূমিকম্পের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কিনা জেনে নিন। এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার/স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের সহায়তা নিন।

২. আপনার ছেলে/মেয়েকে যে স্কুলে পাঠাচ্ছেন, ঐ বিল্ডিং-এর ভূমিকম্প-রোধ ক্ষমতা আছে কিনা খোঁজ নিন।

৩. যদি ভূমিকম্পের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়, তাহলে ঐ বিল্ডিং অথবা বাসা ত্যাগ করুন।

৪. ভূমিকম্পের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং অথবা স্থাপনাসমূহে বসবাস অথবা চলাচল থেকে বিরত থাকুন। ঐসব বিল্ডিং-এর মেরামত অথবা কাঠামোগত শক্তিবৃদ্ধি করুন। এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার/স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ নিন।

৫. অতি ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং অথবা স্থাপনাসমূহ ভেঙে ফেলুন।

৬. টর্চলাইট ও রেডিও এমন একস্থানে রাখুন যাতে সহজেই ভূমিকম্প দুর্যোগের সময় পাওয়া যায়।

৭. ঘরের ফার্নিচার নির্দিষ্ট জায়গায় গুছিয়ে রাখুন। চলাচলের জায়গায় ফার্নিচার রাখবেন না।

৮. মূল্যবান জিনিসপত্র যেমন: টেলিভিশন, কম্পিউটার, গ্যাস সিলিন্ডার, ফাইল কেবিনেট, বুককেইস ভালোভাবে শক্ত জিনিসের সাথে বেঁধে রাখুন।

৯. পরিবারের সবাইকে বৈদ্যুতিক মেইন সুইচ ও গ্যাসের সুইচ কিভাবে বন্ধ করতে হয় জানিয়ে রাখুন।

১০. যদি সম্ভব হয়, আগুন নেভানোর যন্ত্র প্রতি ঘরে একটি করে রাখুন।

১১. প্রতি ঘরে প্রয়োজনমতো মাথায় পরার হেলমেট নির্দিষ্ট জায়গায় রাখুন।

১২. ঘরে একটি ৪ ফুট ঢ ৬ ফুট লোহার টেবিল রাখুন। ভূমিকম্পের সময় পরিবারের সবাই উক্ত টেবিলের নিচে আশ্রয় নিন।

ভূমিকম্প চলাকালীন সময়ে কী করবেন:

১. শান্ত থাকুন ও অন্যদের শান্ত রাখুন।

২. দরজার দিকে দৌড় দিবেন না।

৩. লিফট ব্যবহার করবেন না।

৪. শান্তভাবে হাঁটুন।

৫. বিদ্যুৎ চলে যেতে পারে, টর্চ ব্যবহার করুন।

৬. যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হতে পারে, সজাগ থাকুন।

৭. মাথায় হেলমেট দিয়ে দরজার নিচে অথবা লোহার টেবিলের নিচে আশ্রয় নিন।

৮. মাটির বাড়ি থেকে যত সম্ভব দূরে থাকুন।

ভূমিকম্পের সময় রাস্তায় থাকলে কী করবেন:

১. খালি জায়গায় হাঁটুন, শান্ত থাকুন এবং সজাগ থাকুন।

২. দৌড় দেবেন না।

৩. ঝুঁকিপূর্ণ বাড়িঘর থেকে দূরে থাকুন।
৪. মাটির বাড়ির থেকে নিরাপদ জায়জায় চলে আসুন।
৫. পুরাতন বিল্ডিং থেকে দূরে থাকুন।
৬. বৈদ্যুতিক তার থেকে দূরে থাকুন।
৭. ঢালু জায়গা বা দেওয়াল থেকে দূরে থাকুন।

চলন্ত গাড়িতে থাকলে বা গাড়ি চালানো অবস্থায় থাকলে কী করবেন:

১. চলন্ত গাড়ি বন্ধ করে রাখবেন।
২. খোলা জায়গায় গাড়ি বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকুন।
৩. বৈদ্যুতিক তার থেকে দূরে গাড়ি পার্কিং করুন।
৪. দেওয়ালের পাশে বা গাছের নিচে গাড়ি পার্কিং করবেন না।

ভূমিকম্প হয়ে যাওয়ার পরে কী করবেন:

১. শান্ত থাকুন, রেডিও খোলা রাখুন এবং যদি মোবাইল থাকে তাহলে নিকটস্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করুন ও রেডিওর নির্দেশ মেনে চলুন।
২. সাগর অথবা নদীর পারে থাকবেন না। সাগর অথবা নদীর পানিতে বন্যা বা সুনামি হতে পারে।
৩. মনে রাখবেন ভূমিকম্প একবার আসে না। পরপর অনেকবার ভূমিকম্প হতে পারে এবং কয়েকদিন পর্যন্ত হতে পারে।
৪. গ্যাস লাইন ও ইলেকট্রিক লাইন বন্ধ রাখুন।
৫. সিগারেটের আগুন অথবা কোনো ধরনের লাইটার জ্বালাবেন না।
৬. যদি আগুন লেগে যায়, তাহলে তা নিবারণের ব্যবস্থা নিন।
৭. যদি কোনো লোক মারাত্মকভাবে আহত হয়, তাহলে নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা নিন।
৮. জরুরিভিত্তিতে ধ্বংসাত্মক দাহ্য জিনিষপত্র পরিষ্কার করুন।
৯. যদি আপনি জানেন যে, কোনো লোক বিল্ডিং অথবা কোন কিছুর নিচে চাপা পড়েছে তাহলে উদ্ধারকর্মীদের সহায়তা নিন। অহেতুক দৌড়াদৌড়ি করবেন না। তাতে আপনি ও আহত ব্যক্তির অবস্থার আরও অবনতি হতে পারে।
১০. ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তার থেকে দূরে থাকুন।
১১. খোলা বোতল থেকে অথবা ছাঁকুনি ছাড়া পানি পান করবেন না।
১২. আপনার বাড়ি যদি মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঐ বাড়িতে আর ঢুকবে না।
১৩. বিশুদ্ধ পানি, খাদ্য ও সাধারণ ঔষধ সাথে রাখুন।
১৪. কখনও ক্ষতিগ্রস্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং-এ ঢুকবেন না।
১৫. আশপাশে কী হয়েছে দেখার জন্য রাস্তায় হাঁটবেন না।

১৬. উদ্ধারকর্মীদের গাড়ি/ যন্ত্রপাতি চলাচলের জন্য আপনার পাশের রাস্তা পরিষ্কার রাখুন ।

ভূমিকম্প বিষয়ক অন্যান্য আরও পরামর্শঃ

১. বাড়িঘরের ভিত ও কাঠামো শক্ত করে তৈরি করুন এবং তৈরির সাথে মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করুন ।
২. বিল্ডিং কোড মেনে চলুন এবং ভবন তৈরির সময় পুর প্রকৌশলীর পরামর্শ নিন ।
৩. ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য একাধিক পথ রাখুন ।
৪. ভূমিকম্পের সময় ঘরের দরজা খুলে দিন ।
৫. নরম মাটি বা গর্তের ওপর ভবন নির্মাণ করতে হলে পুরপ্রকৌশলীর পরামর্শ মোতাবেক করবেন ।
৬. ভূমিকম্পের সময় দেয়ালনির্ভর ঘরের কোণে আশ্রয় নিন এবং কলামনির্ভর ঘরে কলামের গোড়ায় আশ্রয় নিন ।
৭. ভূমিকম্পের সময় সাহস ও মনোবল অটুট রাখুন ।
৮. মনে রাখবেন, ভূমিকম্প মানুষ মারে না কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ ভবনই মানুষের মৃত্যু ঘটায় ।

নতুন বিল্ডিং বা কাঠামো নির্মাণ করার ক্ষেত্রেঃ

১. যে কোনো বিল্ডিং-এর নকসা তৈরি করার পূর্বেই স্ট্রাকচারাল নকসার দিকগুলোর নিয়ম অনুসরণ করতে হবে । মনে রাখতে হবে সঠিক স্ট্রাকচারাল নকসা না হলে ভূমিকম্পরোধক বিল্ডিং হবে না ।
২. বিল্ডিং ডিজাইনের আগেই অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা মাটির গুনাগুণ বিশ্লেষণ ও মাটির ধারণক্ষমতা নির্ভুলভাবে নির্ণয়পূর্বক রিপোর্ট তৈরি করতে হবে ।
৩. বিল্ডিং নির্মাণের সময় অভিজ্ঞ সিভিল পুর ইঞ্জিনিয়ারদের তদারকি রাখতে হবে যাতে গুণগতমান ঠিক থাকে ।
৪. সঠিক মানের সিমেন্ট, রড, বালি ইত্যাদি ব্যবহার হচ্ছে কিনা দেখতে হবে । যেন কংক্রিটের মিকসার কোনো অবস্থাতেই ৩০০০ পিএসআই-এর নিচে না আসে । তার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে সাইটে নিযুক্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা কিউব অথবা সিলিন্ডার টেস্ট করাতে হবে ।
৫. উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রড পরীক্ষা করে ব্যবহার করতে হবে, যাতে করে রডের ক্ষমতা ৬০,০০০ পিএসআই-এর কাছাকাছি থাকে ।
৬. বর্তমানে যে হাবে **ঐ, খ, ঞ, ণ, ট** সাইজের বিল্ডিং-এর নকসা করে দালান তৈরি হচ্ছে এতে ভূমিকম্পের ফলে দুর্ঘটনায় প্রবল ঝুঁকি থাকবে । আপনার বিল্ডিং যতই সোজা ও সরল হবে যেমন মোটামুটি বর্গাকার, আয়তাকার নকসা, ততই ভূমিকম্পরোধ শক্তি বেশি হবে । যদি আপনার বিল্ডিং-এর জায়গামতো

নকসা সরল বা সোজা না হয়, তাহলে ত্রি-মাত্রিক ডাইনামিক বিশ্লেষণ করে বিল্ডিং ডিজাইন করতে হবে।

৭. বিল্ডিং-এর প্লান ও এলিভেশানে দুইদিকই সমতা থাকতে হবে।

৮. বেশি লম্বা প্লানের বিল্ডিং করবেন না। দরকার হলে এক্সপানশান ফাঁক রাখতে হবে।

৯. বেশি চিকন ও উঁচু বিল্ডিং-এর পাশ হঠাৎ করে কমাবেন না। যদি কমাতে হয় তাহলে ত্রিমাত্রিক ডাইনামিক বিশ্লেষণ করে ডিজাইন করতে হবে।

১০. বিল্ডিং-এর উচ্চতা/পাশের মাপ ৪ গুণের অধিক করলেই ত্রি-মাত্রিক ডাইনামিক বিশ্লেষণ করে ডিজাইন করতে হবে।

১১. 'সেটব্যাক' বা হঠাৎ করে বিল্ডিং-এর পাশের মাপ কমাবেন না। যদি করতেই হয় তাহলে ত্রি-মাত্রিক বিশ্লেষণ করে ডিজাইন করতে হবে।

১২. জঠিল কাঠামোগত প্লানের জন্য অবশ্যই ত্রি-মাত্রিক ভূমিকম্প বিশ্লেষণ করে ডিজাইন করতে হবে।

১৩. 'শেয়ার ওয়াল' বা কংক্রিটের দেয়াল সঠিক স্থানে বসিয়ে ভূমিকম্পরোধ শক্তির পরিমাণ বাড়াতে হবে।

১৪. সাম্প্রতিক সময়ে যে হারে ঋষধঃ চষধঃব ইঁরষফরহম ংুংঃবস (বিম ছাড়া কলাম ও স্লাব) বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে, তা মাঝারি ধরনের ভূমিকম্প হলেই তার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। সুতরাং বিম, কলাম ও ছাদবিশিষ্ট বিল্ডিং তৈরি করতে হবে।

১৫. প্রত্যেক ইঞ্জিনিয়ারকে "বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড-১৯৯৩" অনুসরণ করে বিল্ডিং-এর প্লান /ডিজাইন করে ভূমিকম্পরোধক বিল্ডিং তৈরি করতে হবে।

১৬. নিচের তলায় পার্কিং-এর জন্য খালি রাখতে হলে, ঐ তলার পিলারগুলো বিশেষভাবে ডিজাইন করতে হবে। প্রয়োজনমতো কংক্রিটের দেয়াল দিয়ে পিলারগুলোতে বেষ্টনী করতে হবে।

১৭. বিল্ডিং-এর 'বিমের' থেকে 'পিলারের' শক্তি বেশি করে ডিজাইন করতে হবে। কমপক্ষে ২০% বেশি করতে হবে।

১৮. মাটির গুণাগুণের ওপর ভিত্তি করে যথাযথ ফাউন্ডেশান প্রকৌশলগতভাবে যাচাই/বাছাই করে ডিজাইন করতে হবে। যাতে করে ভূমিকম্পের সময় 'উশের' মতো মাটি 'উতরাই' উঠে, বিল্ডিং ভেঙে না পড়ে। যদি দরকার হয় প্রকৌশলগতভাবে মাটির শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে।

১৯. ৫ ইঞ্চি ইটের দেয়ালগুলো ভূমিকম্পের জন্য আদৌ নিরাপদ নয়। তাই এই দেয়ালগুলো ছিদ্রযুক্ত ইটের ভিতরে চিকন রড দিয়ে আড়াপআড়ি ও লম্বালম্বিভাবে তৈরি করে 'লিন্টেলের' সাথে যুক্ত করে দিতে হবে। সর্বদিকে 'লিন্টেল' দিতে হবে। বিশেষ করে দরজা/জানালার খোলা জায়গায় চিকন রড দিয়ে ৫ ইঞ্চি ইটের দেয়াল যুক্ত করতে হবে।

২০. মনে রাখতে হবে নতুন বিল্ডিং নির্মাণে ভূমিকম্প প্রতিরোধ নিয়মাবলী প্রয়োগ করলে, শুধুমাত্র ২-৩% নির্মাণ খরচ বৃদ্ধি পায় ।

পুরাতন বিল্ডিং / ভূমিকম্পের জন্য ডিজাইন ছাড়া বিল্ডিং-এর ক্ষেত্রেঃ

১. অভিজ্ঞ প্রকৌশলী দ্বারা বিল্ডিংগুলোর ভূমিকম্প-প্রতিরোধ ক্ষমতা পরীক্ষা করতে হবে । কিন্তু এক্ষেত্রে আসল নির্মাণ খরচের অতিরিক্ত ৫০-৬০% খরচ লাগতে পারে ।

২. অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর পরামর্শে প্রয়োজনমতো প্রকৌশলগতভাবে ব্যবহারযোগ্য বিল্ডিং-এর শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে ভূমিকম্পের সময় ভেঙে না পড়ে ।

৩. ব্যবহার-অযোগ্য/ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিংগুলো অনতিবিলম্বে খালি করে ভেঙে ফেলতে হবে ।

৪. অনতিবিলম্বে যেসব স্থানে প্রচুর লোকের সমাগম ও অতিপ্রয়োজনীয় যেমন – হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মীয় স্থান, ড্যাম, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন কেন্দ্র, পেট্রোলিয়ামজাত আধার, গুরুত্বপূর্ণ ব্রীজগুলোর প্রকৌশলগত কাঠামোর শক্তি পরীক্ষা করে ভবিষ্যতে ভূমিকম্পের জন্য শক্তি বৃদ্ধি করার প্রকল্প হাতে নিতে হবে ।

যথাযথ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে নিম্নের প্রস্তাবনাঃ

১. নতুন বিল্ডিং /কাঠামোর নকসা/ডিজাইন অনুমোদনের পূর্বেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভূমিকম্প-প্রতিরোধী স্ট্রাকচারাল কাঠামো নির্ধারণ করা ।

২. অনতিবিলম্বে সংস্কারযোগ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিংগুলো চিহ্নিতকরণ । সংস্কার যোগ্য বিল্ডিং /কাঠামোগুলো ভবিষ্যতে ভূমিকম্পের জন্য যথাযথ প্রকৌশলগত ভাবে শক্তি বৃদ্ধিকরণ ও ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং/কাঠামোগুলো থেকে বসবাসরত মানুষজনের আনাগোনা থেকে বিরত রেখে, তা অনতিবিলম্বে ভেঙে ফেলার নির্দেশ প্রদান করা ।

৩. ভূমিকম্পের সময় ও পরে গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন লাইনের নিরাপদ সঞ্চালন ও স্থাপন নিশ্চিতকরণ ।

৪. প্রতি জেলাতে একটি করে 'ভূমিকম্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র' নির্মাণ ও পরিচালনাকরণ ।

৫. দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাতে কম্পিউটার ডাটা নিয়ন্ত্রিত ভূমিকম্প পরিমাপ নির্ণয়ক যন্ত্র স্থাপন করন ।

৬. দেশের প্রকৌশলী, স্থপতি, নকসাকারক ও নির্মাতাদের প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য "ভূমিকম্প বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" স্থাপন ।

৭. টিভি, রেডিও ও নিউজপেপারে ভূমিকম্প ও তার পরিণতির প্রতি মনোযোগ/গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য বুলেটিন প্রচারকরণ ।

৮ ভূমিকম্পের ব্যাপারে সচেতনতার জন্য স্কুল-কলেজে জাতীয় শিক্ষাসূচির অধীনে ভূমিকম্পের ওপর ছোট পাঠদান অন্তর্ভুক্তকরণ।

এ অঞ্চলে ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্পসমূহ:

১৫৪৮ সর্বপ্রথম রেকর্ড হওয়া ভূমিকম্পটি বেশ জোরালো ছিল। সিলেট এবং চট্টগ্রামে এটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেয়। অনেক স্থানে মাটি ফেটে পানি বের হয়ে আসে।

১৬৪২ সিলেট জেলায় আরো বেশি ক্ষতি হয়। বিভিন্ন বিল্ডিং-এ ফাটল দেখা দেয়, কিন্তু কোনো প্রাণহানি হয়নি।

১৭৬২ ১৭৬২ সালের ২ এপ্রিলে সংঘটিত এ ভূমিকম্পে চট্টগ্রামের নিকটবর্তী ১৫৫.৪০ বর্গকিলোমিটার এলাকা স্থায়ীভাবে পানিতে ডুবে যায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে। ঢাকায় প্রচণ্ড কম্পন হয়। ৫০০ মানুষ মারা যায়। নদীনালা, ঝিলের পানি আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং শান্ত হওয়ার পর নদীর ওপরে অনেক মৃত মাছ দেখা যায়। চট্টগ্রাম ও সীতাকুণ্ডতে ভূমিকম্পের প্রচণ্ড তীব্রতা অনুভূত হয়। ১৭৭৫ ১০ এপ্রিল-এর এ ভূমিকম্পটিও বিপজ্জনক ছিল। তবে কোনো প্রাণহানি হয়নি।

১৮১২ ১১ মে আঘাত হানা বড় ধরনের এ ভূমিকম্প বাংলাদেশের অনেক স্থানে অনুভূত হয়। সিলেটে এর উদ্দামতা ছিল অনেক বেশি।

১৮৬৫ ১৮৬৫ সালের শীতকালে সংঘটিত এ ভূমিকম্পে ভয়ংকর ঝাঁকুনি অনুভূত হয়। তবে তেমন বেশি ক্ষতি সংঘটিত হয়নি।

১৮৬৯ কাছার ভূমিকম্প নামে পরিচিত। সিলেটে সাংঘাতিকভাবে অনুভূত হয়। তবে কোনো প্রাণহানি হয়নি। চার্চের চূড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কোর্ট বিল্ডিং এবং সার্কিট হাউসের দেয়ালে ফাটল দেখা যায়।

১৮৮৫ বেঙ্গল ভূমিকম্প নামে পরিচিত। ১৮ জুলাই সংঘটিত এ ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭.০।

১৮৮৯ ৭.৫ মাত্রার এ ভূমিকম্পনটি হয়েছিল ১০ জানুয়ারি। সিলেট শহর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাতে আঘাত হানে।

১৮৯৭ ১২ জুন বিকাল ৫:১৫ মিনিটে সংঘটিত হওয়া গ্রেট ইন্ডিয়ান ভূমিকম্প নামের এ ভূমিকম্পনটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প। সিলেট শহরের অনেক বিল্ডিং ধ্বসে পড়ে এবং ৫৪৫ জনের মৃত্যু হয়। ময়মনসিংহে অনেক সরকারি ভবন ভেঙে পড়ে। জমিদারদের দোতলা ভবনের প্রায় সবই ভেঙে পড়ে। ঢাকা মানিকগঞ্জ রেলওয়ের অনেক ব্রিজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পক্ষকালের জন্য চলাচল বন্ধ রাখতে হয়। ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে জলপথের যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভূমিকম্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জীবনের ক্ষতি তেমন বেশি না হলেও সম্পদের ক্ষতি হয়েছিল প্রায় ৫ মিলিয়ন রুপির। রাজশাহীতে বিশেষ করে পূর্ব অংশে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি অনুভূত হয় এবং ১৫ জন মারা যায়। ঢাকাতে সম্পদের ক্ষতি হয়েছিল অনেক বেশি। ইটের তৈরি ভবন প্রায় সবগুলোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

১৯১৮ শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্প নামে পরিচিত। ১৮ জুলাই সংঘটিত এ ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭.৬। শ্রীমঙ্গলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তবে ঢাকায় স্বল্প ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছিল।

১৯৩০ ডুবরি ভূমিকম্প হিসেবে পরিচিত। ৩ জুলাই সংঘটিত এ ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭.১। এ ভূমিকম্পে রংপুর জেলার পূর্বাংশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

১৯৩৪ বিহার-নেপাল ভূমিকম্প নামে পরিচিত। ১৫ জানুয়ারি সংঘটিত ৮.৩ মাত্রার ভূমিকম্পে বিহার, নেপাল এবং উত্তর প্রদেশে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে, কিন্তু বাংলাদেশের কোনো অংশে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেনি। একই বছরের ৩ জুলাই ৭.১ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্প হয় যা রংপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য ক্ষতিসাধন করে।

১৯৫০ আসাম ভূমিকম্প নামে পরিচিত। ১৫ আগস্ট সংঘটিত এ ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৮.৪। বাংলাদেশের সর্বত্র এ কম্পন অনুভূত হয়। তবে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

১৯৯৭ ২২ নভেম্বর ৬.০ মাত্রার এ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এর ফলে চট্টগ্রাম শহরে অল্প ক্ষতি সাধিত হয়।

১৯৯৯ ২২ জুলাই মহেশখালী দ্বীপে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এর মাত্রা ছিল ৫.২। মহেশখালী দ্বীপ এবং এর সংলগ্ন সাগরে তীব্রভাবে অনুভূত হয়। অনেক বাড়িঘরে ফাটল দেখা দেয় এবং ভেঙে পড়ে।

২০০৩ রাঙামাটি জেলার বরকল উপজেলার কলাবুনিয়া ইউনিয়নে এ ভূমিকম্পনটি হয়। ২৭ জুলাই ভোর ৫:১৭ মিনিটে সংঘটিত এ ভূকম্পনের মাত্রা ছিল ৫.১।

.....